তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশকল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৩০ শক।

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৫। সম্বৎ ১৯৬৫। কলিগতাব্দ ৫০০৯। ১ চৈত্র, রবিবার।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ১৭৭ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৮ সংখ্যা।

আষাঢ় ১৭৯ সংখ্যা।

শ্রাবণ ১৮০ সংখ্যা।

ভাদ্র ১৮১ সংখ্যা।

আশ্বিন ১৮২ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ১৮৩ সংখ্যা।

অগ্রাহায়ণ ১৮৪ সংখ্যা।

পৌষ ১৮৫ সংখ্যা।

মাঘ ১৮৬ সংখ্যা।

ফাল্গুন ১৮৭ সংখ্যা।

চৈত্র ১৮৮ সংখ্যা।

অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র।

সপ্তদশ কল্প
দ্বিতীয়ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯।

৭৭৭ সংখ্যা ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

যোগতত্ত্ব।

আত্মশক্তি ও দৈবশক্তি, এই দুই শক্তি আমাদের জীবন-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে আত্মশক্তিই সর্ব্বে-সর্ব্বা, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে আমাদের জীবনে দৈবের কি বিচিত্র গতি, কি প্রভূত প্রতাপ! প্রথমতঃ আমরা কতকগুলি পৈতৃক সংস্কার লইয়া, শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিসহ জন্মগ্রহণ করি। অতঃপর আমরা যেরূপ অবস্থায় লালিত পালিত হই, যে পরিবার ও সমাজে থাকিয়া শিক্ষালাভ করি তাহার কতদূর প্রভাব। আবার দেখুন এক একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনা আসিয়া কতসময় আমাদের জীবনস্রোতকে নূতন পথে সঞ্চালিত করে। আমার আত্মজীবনী হইতে একথা সপ্রমাণ হইতেছে। আমি বাল্যকালে একভাবে শিক্ষিত হইতেছিলাম, আমার জীবন প্রবাহ একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হইতেছিল, অকস্মাৎ এক সামান্য ঘটনাসূত্রে তৎসমস্ত বিবর্ত্তিত হইল; দৈব ঘটনায় কোন এক বন্ধুমিলনে সমস্তই উল্টাইয়া গেল। সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশ যাত্রা, এদেশের সিবিল সর্ব্বিসের জন্য ইংলণ্ডে পরীক্ষা দেওয়া, ইত্যাদি কারণে আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমার জীবনের ইতিহাস যে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে রচিত হইল তাহার কারণ এই অপ্রত্যাশিত মিত্রলাভ।

এই দৈবশক্তি যদিও বলবত্তর, তথাপি আমাদের জীবনে আত্মশক্তির প্রসার যথেষ্ট আছে। আমার প্রবৃত্তি সকল যতই প্রবল হউক, আমি যতই বিঘ্ন বিপত্তিতে পরিবৃত হই না কেন, আমি বুঝিতে পারি যে আমার কর্ত্তৃত্বশক্তি অখণ্ডনীয়। নানা প্রতিকূল অবস্থা, প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিয়া সে শক্তি কার্য্য করিতেছে। আমার নিজের ভালমন্দ বিষয়ে আমি নিজেই দায়ী, আমি আপনিই আপনার রক্ষক, আপনি আপনার সহায়। আমি ভাগ্যের অধীন নহি, ভাগ্য আমার কর্ত্তৃত্বাধীন।

গীতার একটি বচন আছে যাহা চিন্তাশীল মনুষ্য মাত্রেরই প্রণিধান যোগ্য। বচনটি এই:—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

আপনাকে আপনি উদ্ধার করিবে আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মশত্রু।

দৈবের দাসত্ব করা কাপুরুষের লক্ষণ। দৈবের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া আত্মশক্তি-দ্বারা জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করাতেই পুরুষত্ব। তাই কথিত হইয়াছে

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা

দৈবকে হনন করিয়া আত্মশক্তি দ্বারা পুরুষকার অর্জন করিবেক।

বুদ্ধদেবেরও ঐ উপদেশ। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের কিছুপূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দ বিমর্ষভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন এখন আমাদের সঙ্ঘের কি দশা হইবে? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ, আপনারাই আপনার নির্ভর স্থান। পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।"

এই সঙ্কটপূর্ণ ভবার্ণবে আত্মশক্তিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। কি শরীর রক্ষা, কি মানসিক কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, মনুষ্যের আত্মশক্তির প্রভাব পদে পদে অনুভূত হয়।

এই আত্মশক্তির বীজমন্ত্র হচ্ছে সংযম, সংযমেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি সংযমের নিয়ম রক্ষা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিই শুদ্ধাচারী, যিনি সংযমের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক যথেচ্ছ বিচরণ করেন তিনি স্বেচ্ছাচারী।

মনুষ্য কতকগুলি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। বিধাতা মঙ্গল উদ্দেশেই সেই সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়া আমাদের মনোরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই সকল প্রবৃত্তিকে সৎপথে নিয়োগ করাতেই আমাদের মঙ্গল—বিপরীত পথে চলিতে দিলেই অনিষ্ট। ক্রোধ অনেক সময় কার্য্যকরী হয়, অন্যায় অত্যাচারের প্রতি ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক, তাহা বলিয়া যদি আমরা ক্রোধাবেশে আত্মহারা হইয়া অকারণে পরের উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহা নিন্দনীয়। আমাদের প্রতিজনের জীবনে কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা আত্মাভিমান—এইরূপ কোন না কোন প্রবৃত্তি একাধিপত্য করিতে চায় তাহাকে স্বেচ্ছামত চলিতে দিলে আমাদের সমূহ বিপদ—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি

মন যদি ছুটি চলে
ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান
বায়ু যথা তরণী ডুবায়।

এই সকল প্রবৃত্তিকে দমন করাতেই মনুষ্যত্ব—ইহাদের বশীকরণ মন্ত্রের নাম সংযম।

ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং।

এই সকল নানা বিষয়ে ধাবমান্ ইন্দ্রিয়গণের সংযমে যত্ন করিবেক, যেমন সুনিপুণ সারথী দুষ্ট অশ্ব সকলকে বশীভূত করে।

প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে আনা যে অত্যাবশ্যক তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে প্রবৃত্তি সকল অন্ধ, বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারা উত্তেজিত হয়। তাহারা আপনাকে আপনারা নিয়মিত করিতে পারে না। তাহাদের উপরে একজন নিয়ামক চাই। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে যাহা স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর তাহাতেই সকলসময় আমাদের রুচি হয় না, লোভে পড়িয়া অভোজ্য ভোজনে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে। যাহার অর্জনস্পৃহা

বলবতী, তাহার ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তেতেই মনস্তুষ্টি হয় না, যেন তেন প্রকারেণ অর্থ-লাভ হইলেই হইল। যে অর্থপিশাচ সে ধর্ম্মের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনে পশ্চাৎপদ হয় না। আমরা দেখিতে পাই অনেক সময় বাসনার দৌড় সেই দিকে যায়, যাহাতে স্বাস্থ্যনাশ মনস্তাপ জনসমাজের অকল্যাণ প্রসূত হয়।

আর একটি কথা। চরিতার্থতায় প্রবৃত্তি শান্ত হয় না, প্রত্যুত বিবৃদ্ধ হয়। যত পাই আরো চাই, প্রবৃত্তির মতি এই। যে লক্ষপতি সে ক্রোড়পতি না হইলে সন্তুষ্ট হয় না। ইহা হইতেই দেখা যায় 'অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ' পিপাসার অন্ত নাই, এ অতি যথার্থ কথা। আমরা মনে করি এবার এ সাধটা মেটানো যাক্, পরের বারে নিবৃত্তি-মার্গ অনুসরণ করা যাইবে। আমরা ভাবি না—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে।

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতভুক্ত অগ্নির ন্যায় আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

সসাগরা ধরণী ধনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, তবুও তাহার ধনলালসার নিবৃত্তি হয় না। রাজ্যেশ্বর যতই প্রভুত্ব বিস্তার করুক, কিছুতেই তার আশ মিটে না। যে যত লোকের প্রভু, সে চায় আরো সহস্র সহস্র লোক তাহার পদানত হয়। ইহা হইতেই প্রতীতি হইবে যে প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে আনিয়া সংযত করাই আমাদের স্বাস্থ্য শান্তি ও মঙ্গলের প্রকৃষ্ট পন্থা।

যখন প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা একই পথে যায় তখন সকলি সরল, সকলি সুগম, সকলি সুশৃঙ্খল। কিন্তু এ পৃথিবীতে তাহা সকল সময়ে হইয়া উঠে না।

কতবার এরূপ ঘটে যে প্রবৃত্তি এক-দিকে টানিতেছে, কর্ত্তব্য বুদ্ধি অন্যদিকে; বাসনা ও ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যে বিরোধ, স্বার্থ পরার্থে বিরোধ আসিয়া পড়ে। এই উভয় সঙ্কটে সংযমীই বিবেকের বাণীতে পরিচালিত হন। যিনি স্বেচ্ছাচার ছাড়িয়া কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হয়েন, যিনি পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন; যিনি অশেষ বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচলিত থাকেন, তিনিই সংযতাত্মা সাধু পুরুষ। এই সকল সাধু পুরুষদিগের আচরণই আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল।

আত্মসংযমের অভাবে আমাদের পদে পদে বিপত্তি, পদে পদে দুর্গতি ঘটে। এই হেতু বাল্যকাল হইতে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সংযমশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়, সংযমশিক্ষার প্রতি সেইরূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, কেন না চরিত্র-গঠনের প্রধান উপকরণ—সংযম। আমাদের শাস্ত্রে ব্রত উপবাসাদি অনুশাসনের উদ্দেশ্য ঐ। পানাহারের অত্যাচারে আমাদের যে স্বাস্থ্যনাশ, শরীরক্ষয় হয়, তাহার গোড়ার কথা সংযমের অভাব। বিদ্যার্থী যে বিদ্যাভ্যাসের সময় ক্রীড়ামোদে মত্ত থাকিয়া বিদ্যার বদলে অনাচারে পাণ্ডিত্য লাভ করে, তাহার কারণ সংযমের অভাব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখুন সে দিন সুরাট নগরে কি শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইল! আমাদের পূজ্যতম নেতাগণের অবমাননা, বিবাদ-কলহ মারামারির স্রোতে আমাদের রাষ্ট্রীয় মহাসভার মূলোচ্ছেদ, এ কি সামান্য লজ্জার বিষয়? ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? এই যে আমরা সাধারণ হিতের জন্য আপনাকে ভুলিতে শিখি নাই। আমরা যে স্বদেশী

স্বদেশী করি, তাহা মৌখিক ভাণমাত্র, আমাদের আত্মত্যাগ নাই, আত্মসম্বরণ নাই, এক কথায় আত্মসংযমের অভাব। আমরা স্বরাজ্য স্থাপনের জন্য ব্যাকুল, অথচ আপনাদের এই ক্ষুদ্র নৌকাখানি চালাইতেও অক্ষম।

এই প্রসঙ্গে আমি যোগ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিয়া শেষ করিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষে যোগ বলিয়া একটি জিনিস আছে যাহা অন্য দেশে দেখা যায় না। কিন্তু হায়! এইক্ষণে এই যোগরহস্য এ দেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কেবল কতকগুলি সন্ন্যাসীর মধ্যেই বদ্ধ এইরূপ শুনা যায়! এই যোগ কি? সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে সংযমের উচ্চাঙ্গ সাধনের নাম যোগ। সংযম নিম্নস্তরে, যোগ তাহার উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠিত। যিনি অসংযতাত্মা তাঁহার পক্ষে যোগসাধন অসম্ভব। যোগপ্রণালী আত্মজীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এরূপ লোক বিরল। তবে যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করাই আমার অভিপ্রায়।

যোগ পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়। পাতঞ্জল মতে, যোগের অর্থ চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

এই যোগ অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

যম = অহিংসা, সত্য ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি।

নিয়ম = শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান।

আসন = পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন বন্ধন।

প্রাণায়াম = প্রাণবায়ুর সংযমন।

প্রত্যাহার = বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রতিনিবৃত্তি।

ধারণা = বিষয় বিশেষে চিত্তের অভিনিবেশ।

ধ্যান = চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহ।

সমাধি = ধ্যানের উন্নতাবস্থা, যে অবস্থায় ধ্যান ও ধ্যেয় বিষয় একীভূত হয়। সমাধির উচ্চতর অবস্থাকে নির্বীজ সমাধি বলে। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হইলে নির্বীজ সমাধি লাভ হয়।

এই যোগের ফল কি?

পাতঞ্জল মতে যোগ সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। সেই পুরুষকে তখন শুদ্ধ বুদ্ধ বলে। ইহারই নাম কৈবল্য সিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

ভগবদ্গীতাও যোগশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগতত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিয়া অর্জ্জুনকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। গীতায় যোগকাণ্ড আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে পাতঞ্জলদর্শনের সহিত যেমন তাহার কতক বিষয়ে মতের ঐক্য আছে তেমনি অনেক বিষয়ে অনৈক্যও আছে। গীতা পাতঞ্জল প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গযোগ সাধারণতঃ অনুমোদন করিতেছেন, কিন্তু উহার মত তিনি সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর-প্রণিধান পাতঞ্জল যোগের অন্যান্য সাধনের মধ্যে একটি সাধন মাত্র। কিন্তু গীতার নিজস্ব যোগ পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ। জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হওয়াই গীতোপদিষ্ট অধ্যাত্মযোগ। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোন বাধা হয় না, কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্ত সংযোগই প্রকৃত যোগ—ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারে অসম্ভব। সাধন দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধে কৃতকার্য্য

হইলাম, কিন্তু ভজন দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমামৃতরস পান করিতে পারিলাম না, তবে সে সাধনের ফল কি? চিত্তবৃত্তি বশীভূত করাই বা কি জন্য? চিত্তবৃত্তি নিরোধ গীতার চরম লক্ষ্য নহে, উপায় মাত্র। গীতার লক্ষ্য ব্রহ্মনির্ব্বাণ—ব্রহ্মের সহিত সম্মিলন। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন। ভগবান্ বলিতেছেন—যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভীক, ব্রহ্মচারী, সংযতমনা হইয়া আমাতেই চিত্তার্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবেক।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

ঈশ্বরে চিত্ত নিহিত করাই যোগীর প্রতি গীতার মুখ্য উপদেশ।

যোগের চরম ফল সম্বন্ধেও পাতঞ্জল ও গীতার ভিন্ন মত। পাতঞ্জল মতে যোগীর চরম অবস্থা সুখ, দুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। এ অবস্থা অভাবাত্মক, দুঃখের অভাব মাত্র। গীতায় যোগের ফল যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ভাবাত্মক—সুখের পূর্ণমাত্রা—অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।
যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে,
যারগুণে গুরু দুঃখ তুচ্ছ হয় মনে।

এই সুখ ক্রমে ঘণীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। গীতোক্ত যোগ-সাধনের ফলে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়েন।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনঃ সুখমুত্তমম্
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।
বিরজ, বিগত পাপ, প্রশান্ত হৃদয়,
নিত্য শান্তি লভে যোগী হয়ে ব্রহ্মময়,
এ হেন সাধনাগুণে হয়ে পাপহীন
ব্রহ্মপরশন-সুখ ভুঞ্জে অহুদিন।

আমাদের মধ্যে এক সাধারণ সংস্কার এই যে উপবাসাদি উপায়ে শরীরকে যত পীড়ন করা যায়, যোগের পথ ততই সুগম হয়। কিন্তু গীতার মত তাহা নহে। যাহারা ঈদৃশ কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া শরীরের প্রতি অত্যাচার করে, গীতার চক্ষে তাহারা আসুরিক প্রকৃতির লোক। সপ্তদশ অধ্যায়ে এইরূপ তপস্যা তামসিক বলিয়া বর্ণিত,—যথা,

দম্ভ অহঙ্কারে স্ফীত, কামরাগ উদ্দীপিত,
অশাস্ত্র বিহিত ঘোর তপঃ পরায়ণ,
অনশন ব্রতাচারে, শরীর শোষণ করে,
অন্তরস্থ আমাকেও করে নির্য্যাতন;
এই ঘোর তপস্যায়, যাদের জীবন যায়,
ইহাতেই নিরত যাহারা, ধনঞ্জয়,
সহে ক্লেশ অকারণ, মূঢ়মতি অচেতন,
জেন তারা ক্রূরকর্ম্মা অসুর নিশ্চয়।

গীতোক্ত যোগপ্রণালী অন্যতর। অতিভোজনে বা ঐকান্তিক উপোষণে যোগ হয় না, অতিনিদ্রা বা ঐকান্তিক জাগরণে যোগসিদ্ধি হয় না। যুক্তাহার বিহার, যুক্ত নিদ্রা জাগরণ, যুক্ত কর্ম্মচেষ্টা, এই সমস্ত উপায়ে দুঃখনাশন যোগ সিদ্ধি হয়।

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তনিদ্রাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

গীতা এই যে যোগাভ্যাসের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহা কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। একদিকে অপর্য্যাপ্ত পানভোজন বিষয়ামোদে মত্ততা, অন্যদিকে ব্রত উপবাসাদি কঠোর নিয়মে শরীর-শোষণ, গীতা এই উভয় প্রান্তের মধ্যপথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিতেছেন, যে পথ বুদ্ধদেব তাঁহার চতুর্মহাসত্যের সর্ব্বপ্রথম উপদেশে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কর্ম্মযোগ ছাড়িয়া যে সন্ন্যাস অর্থাৎ

সংসারত্যাগরূপ যে সন্ন্যাস তাহা গীতার অনুমোদিত নহে। গীতা বলেন এরূপ সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যিনি ফলকামনা-শূন্য হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; যিনি নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ যিনি অগ্নিসাধ্য ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী ও নন, যোগী ও নহেন। গীতার যিনি আদর্শ যোগী, তিনি কর্ম্ম করিয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় কর্ম্মেতে নির্লিপ্ত, সংসারে থাকিয়াও সংসারিক সুখদুঃখে অবিচলিত, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সর্ব্বভূতহিতে রত, জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ক্রিয়াবান্। —গীতা বলিতেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ
ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য বাপ্রিয়ম্
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ
বাহ্য স্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্
সব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি
লভন্তেব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ
ছিন্নদ্বৈধাযতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ
কাম ক্রোধ বিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।

ব্রাহ্মণ বিনয়ী যতী, চণ্ডাল ঘৃণিত অতি,
গাভীকরী কুকুরে সমান,
সমদর্শী সর্ব্বঠাঁই, ভেদাভেদ কিছু নাই,
দেখিছেন সব এক প্রাণ।
হেন সাম্যময় চিতে, জেন, পার্থ, সর্ব্বরীতে,
এখানেই হয় স্বর্গজিত;
নিষ্পাপ পুণ্যনিধান, ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র সমান,
ব্রহ্মভাবে হন অবস্থিত।
প্রিয়লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্লিষ্ট,
দুঃখে নাহি হন উদ্বেজিত,
নির্ম্মোহ নিশ্চলা মতি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেতে রতি,
ব্রহ্মে তিনি হন অবস্থিত।
ইন্দ্রিয় বিষয় রাগে, বিরাগ সতত জাগে,
আপনায় সদানন্দময়,
ব্রহ্মযোগে হয়ে যুক্ত, সংসার বন্ধনমুক্ত,
ভুঞ্জে চির আনন্দ অক্ষয়।
আত্মায় যাঁহার মতি, আত্মায় যাঁহার রতি,
অন্তর্জ্যোতি সদা দীপ্যমান,
সর্ব্বভূতহিতে রত, দ্বিধাহীন শুচিব্রত,
আত্মতত্ত্ববিৎ পুণ্যবান,
কামক্রোধ বিরহিত, সন্ন্যাসী সংযতচিত,
বিষয়বাসনা অবসান,
জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মে হন অবস্থিত,
লাভ হয় ব্রহ্ম নিরবান!
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরের ভাব।

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে ঋষিদিগের নবীন নেত্র প্রকৃতির নবীন সৌন্দর্য্য, বজ্র বিদ্যুতের অদম্য প্রতাপ, অগ্নি সূর্য্যের জ্বলন্ত তেজ, মেঘ মৃত্যুর অজেয় শক্তি সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত, উহাদের বন্দনা গাথায়—উহাদের তৃপ্তি সাধনে বৈদিক ঋষিরা নিজ নিজ চেষ্টা ও সামর্থ্য বিনিয়োগ করিতেন, এ কথা সত্য হইলেও এ ভাব—এ মোহ তাঁহাদিগকে ব্যাপককাল ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি তাঁহাদিগকে প্রথমে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের সতেজ বুদ্ধি ও চিন্তাকে এককালে আচ্ছন্ন বা অসাড় করিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাঁহারা অগ্নিতে হব্যকব্য দিতেন, সূর্য্যের স্তুতি বন্দনা করিতেন, মৃত্যুকে বজ্রকে ইন্দ্রকে বরুণকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য লালায়িত হইতেন, কখন বা বহু ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, কিন্তু এই সকল ভাবের ভিতর হইতে এক ঈশ্বরের

সত্ত্বাতে বিশ্বাস ও নির্ভর ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। প্রকৃতির মোহিনী শক্তি তাঁহাদের হৃদয়ের স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত সে উন্নত ভাবকে আর চাপা দিয়া রাখিতে পারিল না। তখন তাঁহারা সরল ও সহজ বাণীতে বলিয়া উঠিলেন

ভয়াৎ অস্য অগ্নি স্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ।

তাঁহারা একের সন্ধানে পাইলেন, তাঁহার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন, তাই তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দিলেন "অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু ইহাদের আর দেবতা বলিব না—ঈশ্বর বলিব না, ইহারা একেরই শাসনে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত—আমরা এক্ষণে তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি। ঋষিদিগের চিন্তা—ঋষিদিগের সাধনা এক ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়া স্থির থাকিতে পারিল না; তাঁহার সঙ্গে নিজেদের যে কি মধুময় যোগ, তাহা তাঁহারা ধারণায় আনিয়া ফেলিলেন এবং ইহাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন যে

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। (ব্রাহ্মধর্ম্ম ৮ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)।

তাঁহাকে হৃদয়ে আত্মার ভিতরে সন্দর্শন করিতে হইবে। সংসারে যদি প্রকৃত শান্তি থাকে তবে তাঁহাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করিয়া। আত্মার ভিতরে পরমাত্মাকে সন্দর্শন—আধ্যাত্মযোগের এই যে সন্ধান, আর্য্যঋষিগণ শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা সাধনা প্রভাবে বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধির এই যে প্রাখর্য্য, সাধনার এই যে তীব্রতা, তাহা সমস্ত জগৎকে এখনও স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে! বলিতে গেলে সমগ্র জগতের সমস্ত সভ্যজাতির ধর্ম্মপিপাসুগণ ঐ লক্ষ্য ধরিয়া ঐ রূপ সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। অধ্যাত্মযোগের এই যে অভ্রান্ত বাণী, উহা যেরূপ সুনিপুণ ভাষায় পরিস্ফুট ভাবে উপনিষদের প্রতি পত্রে অঙ্কিত, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্ম আজও তাহা সে ভাবে চিত্রিত করিতে পারে নাই, সে উচ্চতা সে গাম্ভীর্য্য দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। আমরা ঋষিদিগের যে অমূল্য সম্পত্তিতে-আধ্যাত্মিক ধনে গৌরবান্বিত, বর্ত্তমানে তাহার জন্য শূন্য গর্ব্ব শূন্য অভিমান করিলে চলিবে না; আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিবার চেষ্টা আমাদিগের প্রত্যেককেই পাইতে হইবে। এই সাধনাতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত দেবত্ব লাভ হইবে।

বৈদিক সময়ে প্রকৃতির শক্তি নিচয় ও এক ঈশ্বর লইয়া গবেষণা। পরিশেষে এক ঈশ্বরের সিংহাসন সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু পৌরাণিক যুগে আর এক বিচিত্র ভাব। অবতারবাদ পৌরাণিক সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এদেশে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এই জ্ঞানোন্নত সময়েও অনেকে অবতারবাদের অনুকূলে বিশেষ যোগ্যতার সহিত লেখনী পরিচালন করিতেছেন। অবতারবাদ এমনই আমাদের অস্থি-মজ্জার সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে তাহা স্বাধীন চিন্তাকে বিকশিত হইতে দেয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবতারবাদ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের কণামাত্র লইয়া মহানুভব কর্ম্মীগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া কখন বা ধর্ম্মে সংস্কার কখন বা সাধনে ঐকান্তিকতা সতেজে অন্তর্নির্ব্বিষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হয়েন, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে জীবনে দেশকে মাতাইয়া তোলেন, সমগ্র জনসমাজকে উন্নতির দিকে এক পদ অগ্রসর করিয়া দেন,

চিন্তাকে নূতন পথে—প্রকৃত কল্যাণের অভিমুখীন করিয়া দিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের অতুল্য প্রভাব অতুল্য শক্তি তোমার আমার অপেক্ষা অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের স্থান অর্পণ করিতে বা ভগবান বলিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিরতিশয় কৃতজ্ঞতার সামগ্রী, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নররূপী ঈশ্বর নহেন। আমাদের যিনি ঈশ্বর, তিনি তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিতে পারেন না, তিনি তাঁহার অনন্ত পরিধিকে সার্দ্ধ ত্রি হস্তের ভিতরে আনিতে পারেন না; তাঁহার স্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান এ কথা প্রতি অক্ষরে সত্য; কিন্তু ইহাও তেমনি সত্য, যে তিনি অনন্ত, তিনি কোন অবস্থায় সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত নহেন। অসংখ্য তারকাখচিতনীলাকাশসমন্বিত সমুদয় বিশ্বে যিনি সমানভাবে ওতপ্রোতরূপে বিরাজমান, তিনি আপনার অসীম বিশালসত্তা গুটাইয়া, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ হইতে আপনার সত্তা প্রত্যাহার করিয়া, আপনার পূর্ণ মহিমাতে সসীম নররূপে, সমগ্র বিশ্বের তুলনায় ধুলি পরিমাণ আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ভিতরে তোমার আমার মত পাপীর সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে! ভগবৎ দর্শন কিএতই সহজ। এই কি পরব্রহ্মের লক্ষণ। ইতিহাস কি ঈশ্বরের এইরূপ পূর্ণঅবতারত্ব গ্রহণের সাক্ষী দেয়। পূর্ণ অবতারের অবতরণ কি কেবল অনৈতিহাসিক যুগেই ঘটিয়াছিল। ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে ভাগবতের কথাই প্রকৃত সত্য যে "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" অবতারের সংখ্যা নাই। সরোবর পূর্ণ হইয়া গেলে যেমন তাহার উচ্ছ্বসিত বারিরাশি বিভিন্ন সংকীর্ণ ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী ধরিয়া বাহির হয়, তেমনি অনন্তমঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে তাঁহার কল্যাণ ও মঙ্গলের বার্ত্তা বহন করিয়া জগতে শান্তি বিস্তারের জন্য অসামান্য ক্ষমতাপন্ন মানবের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন বলিতে চাও, বলিতে পার; কিন্তু পূর্ণ অবতার বা পরব্রহ্ম বলিও না। ভগবতের কথায় তাঁহারা ঈশ্বরের অংশ বা কলা মাত্র। ঈশ্বরের কণামাত্র মঙ্গলভাব তোমার আমার মধ্যেত আছেই। কিন্তু স্ফূর্ত্তি না পাইয়া তাহা মলিন ও নিষ্প্রভ। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের বাণী শুনাইবার জন্য জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সে ভাব হীরকদ্যুতিতে স্ফূর্ত্তি পায়, জগৎ তাহা দেখিয়া স্তব্ধ-পুলকে বিমোহিত হইয়া পড়ে।

আমাদের এ কি মোহ, যে ক্ষুদ্র আমরা ঈশ্বরের মহান ভাবকে খর্ব্ব করিতে চাই। ইহা দেখিয়া জনৈক অনুতাপীর মর্ম্ম কথা এই,

> রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ বর্ণিতং
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা খিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
> ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো চতীর্থযাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ তৎ বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।

হে ঈশ্বর! রূপ বিবর্জ্জিত তুমি, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা তোমার রূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; তুমি নিজে অনির্ব্বচনীয়, আমি কিন্তু স্তব করিতে গিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছি; সর্ব্বব্যাপক তুমি, অথচ তীর্থযাত্রাদ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্ব যে বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি; হে ভগবন! আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

প্রথম পরিচ্ছেদের

অনুবৃত্তি।

ক্ষুদ্র বিষয়ে লোক-মতের ভয়ই উপহাসের ভয়। লোকের মধ্যে একটা সাধারণ রুচি আছে, শোভন অশোভন, সঙ্গত অসঙ্গতের একটা সাধারণ আদর্শ আছে, যাহা লোকের বিচার বুদ্ধিকে সাধারণতঃ পরিচালিত করে—এমন কি, যে পরিহাস, বিচার-বুদ্ধিরই প্রকারান্তর মাত্র সেই পরিহাসের ভাবকেও উদ্দীপিত করে; এবং এই অনুমানের উপরেই, উপহাসের বলবত্তা অধিষ্ঠিত। এই অনুমানটি যদি উঠাইয়া লও, তাহা হইলে, উপহাসের দাঁড়াইবার আর স্থান থাকে না—উপহাসের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিৎ, উচিত অনুচিতের ন্যায় ইহাও অবিনশ্বর।

কোন স্বার্থ ও সুখসাধনের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলে আমরা একটা কষ্ট অনুভব করি, ইহাকেই পরিতাপ বলে। কিন্তু কোন কুনীতির কার্য্য করিয়া আমাদের মনে যে কষ্ট হয় তাহার সহিত উহার ঐক্য নাই। ইহাও একটা কষ্ট বটে, কিন্তু অন্য প্রকারের কষ্ট। ইহা অনুতাপ, ইহা আত্মগ্লানি। তাহার দৃষ্টান্ত, যখন আমরা কোন বাজির খেলায় হারি তখন তাহা আমাদের নিকট অপ্রীতিকর হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন বাজিতে জিতিয়া মনে মনে জানি যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি প্রতারণা করিয়াছি তখন আমাদের মনে যে কষ্টের ভাব হয় তাহা অন্যরূপ।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট; তাহা হইতেই বৈধরূপে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি যে, যদি ভাল ও মন্দের মধ্যে, পাপ পুণ্যের মধ্যে, স্বার্থমূলক অধর্ম্ম ও নিঃস্বার্থমূলক ধর্ম্মের মধ্যে, একটা স্বরূপগত পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে, মানব ভাষা ও মানব-ভাষার দ্বারা হৃদয়ের যে ভাবগুলি আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি তৎসমস্তই অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এই পার্থক্যের ভিত্তিকে নড়াইয়া দিলে মানবজীবনকে—সমস্ত জনসমাজের ভিত্তিকে নড়াইয়া দেওয়া হয়। এইখানে আর একটা চরম দৃষ্টান্ত—একটা ভীষণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাউক। মনে কর, কোন ব্যক্তি বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। কেন তুমি তাহার প্রাণ হরণ করিবে? ভাল মন্দের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই ইহাই যাহাদের মত তাহাদের স্থানে তুমি আপনাকে একবার স্থাপন কর, এবং এই মানব-বিচার-নির্দ্ধারিত দণ্ডের মধ্যে যে মূঢ় নৃশংসতা বিদ্যমান তাহাও ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। অপরাধী কি করিয়াছিল? সে যে কাজ করিয়াছিল তাহাতে আসলে ভাল মন্দ কিছুই নাই। কারণ, যদি ভাল মন্দের মধ্যে, সুখ দুঃখের পার্থক্য ছাড়া আর কোন স্বাভাবিক পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে মানুষের কোন কর্ম্মকেই কি আমরা অপরাধের কোটায় ফেলিতে পারি?—যদি ফেলি, তাহা হইলে কি তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না? কিন্তু আসলে যাহা ভালও নহে, মন্দও নহে,—ব্যবস্থাপ্রণেতা কতকগুলি মনুষ্য তাহাকেই অপরাধ বলিয়া

ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের এই ঘোষণা নিতান্তই একটা খামখেয়ালী ব্যাপার—সুতরাং সেই দণ্ডার্হ ব্যক্তির হৃদয়ে কোন প্রতিধ্বনি হইল না। সে ইহার ন্যায্যতা অনুভব করিতে পারিল না। কারণ সে যে কাজ করিয়াছে আসলে তাহার মধ্যে ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই। তাই, যে কাজ যদৃচ্ছাক্রমে অপরাধ বলিয়া পরিঘোষিত হইয়াছে, সেই কাজ করিয়া তাহার অনুতাপও হইল না। জল্লাদ হদ্দ এইটুকু তাহার নিকট সপ্রমান করিবে যে,সে তাহার কার্য্যে সফল হয় নাই, কিন্তু সে যে অন্যায় কাজ করিয়াছে একথা জল্লাদ কখনই সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। কেননা তাহার কাজের মধ্যে ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই। জল্লাদ তাহাকে বধ করিল, কি জন্য তাহাকে বধ করিল, বধ্য ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিল না। মৃত্যু দণ্ডই হউক, আর যে কোন দণ্ডই হোক, যদি শুধু আঘাতের দ্বারা আঘাতকে দমন করাই তাহার উদ্দেশ্য না হয়—যদি তাহার উদ্দেশ্য তাহা ছাড়া আর কিছু হয়, তাহা হইলে তাহার মূলে নিম্নলিখিত কয়েকটি তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়,যথাঃ—১ম—ভাল ও মন্দের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, একটা স্বরূপ-গত পার্থক্য বিদ্যমান, এবং এই পার্থক্য থাকাতেই, বুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব মাত্রই মঙ্গলের পথে ও ন্যায়ের পথে চলিতে বাধ্য। ২য়—এই মনুষ্য বুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব,মনুষ্য এই পার্থক্য ও এই দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে,—এবং কৃত্রিম আইন কানুনের অপেক্ষা না করিয়াই আপন ইচ্ছায় স্বাভাবিকভাবে উহাতে অনুরক্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ; তাছাড়া, যে সকল প্রলোভনের প্ররোচনায় মনুষ্য, মন্দের পথে, অন্যায়ের পথে নীত হয়, সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিবার শক্তি—এবং পবিত্র ও স্বাভাবিক ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিবার শক্তিও মনুষ্যের আছে। ৩য়—যে কোন আচরণ ন্যায়ের বিরোধী তাহা বলের দ্বারা দমন-যোগ্য, এবং প্রতিবিধানকল্পে তাহা দণ্ডনীয়, তজ্জন্য কৃত্রিম কোন আইন কানুনের অপেক্ষা রাখে না। ৪র্থ—মনুষ্য, ন্যায় অন্যায়ের মত পাপ পুণ্যেরও পার্থক্য বুঝে, এবং ইহাও বুঝে যে, কোন অন্যায় কর্ম্মের জন্য দণ্ডবিধান করাও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুগত কার্য্য।

বিচার করিবার শক্তি, দণ্ড বিধানের শক্তি—ইহাই সমাজের ভিত্তি-মূল; ইহাই প্রকৃত সমাজ। স্বকীয় ব্যবহারের জন্য সমাজ, এই সকল নিয়ম, এই সকল মূলসূত্র রচনা করে নাই। এই সকল নিয়ম সমাজগঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী; মন ও আত্মার প্রথম সূত্রপাত হইতেই উহারা রহিয়াছে,সমাজের সমস্ত নিয়ম ও ব্যবস্থা উহাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সনাতন মূলসূত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই সামাজিক নিয়মের বৈধতা সম্পাদিত হইয়াছে। শিক্ষা এই সকল নীতিসূত্রকে পরিপুষ্ট করে,—সৃষ্টি করে না।

ব্যবস্থাকর্ত্তা যিনি আইন প্রস্তুত করেন, বিচারকর্ত্তা যিনি এই আইনের প্রয়োগ করেন,—ইঁহারা এই সকল নৈতিক মূলসূত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়েন। যে অপরাধী বিচারের জন্য বিচারালয়ে আনীত হয়, তাহার সম্মুখেও এই সকল মূলসূত্র বিদ্যমান, বিচারকর্ত্তাও এই মূলসূত্র অনুসারেই দণ্ড বিধান করেন। এই মূল সূত্রগুলি উঠাইয়া লও—সমস্ত ন্যায় বিচার বিধ্বস্ত হইবে, এই বিচারকার্য্য কতকগুলা কৃত্রিম নিয়মে পরিণত হইবে; সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অনু-

স্থাপ হইবে না; কেবল দণ্ডের ভয়েই লোকে এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বিরত হইবে। এই সকল নিয়ম-অনুসারে যে বিচার হইবে, তাহা বিচার নহে,—তাহা অত্যাচার। কর্ত্তব্য ও ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সমাজ বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্র হইয়া পড়িবে; ছলে বলে কৌশলে যে যত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা হইবে—এবং সমস্তের উপর আইনের একটা কপট আবরণ মাত্র থাকিবে। অবশ্য সমাজ ও মানুষের বিচারকার্য্যে এখনও অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, কালক্রমে তাহা প্রকাশ পাইয়া সংশোধিত হইবে। কিন্তু এ কথা, সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, সমাজ ও মনুষ্যের বিচার-কার্য্য সত্যের উপর ও স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রমাণ, সর্ব্বত্রই সমাজ গঠিত হইয়াছে ও সমাজের ক্রমোন্নতি হইতেছে। তাছাড়া, প্যাস্‌কাল কিংবা রুসো সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যতই বিষাদময় বর্ণে অঙ্কিত করুন না, এ অবস্থা চিরস্থায়ী নহে। প্রত্যক্ষই সব নহে; প্রত্যক্ষ ব্যাপার ছাড়া আরও কিছু আছে,—একটা ন্যায় ধর্ম্মের আদর্শ আছে। ন্যায়ধর্ম্মের যদি একটা বাস্তবিক আদর্শ থাকে, তাহা হইলে সেই আদর্শই দূষিত সমাজ-প্রণালীকে উল্টাইয়া দিবে—মানবের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। এই ন্যায়-ধর্ম্মের আদর্শ কি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক? প্রত্যেক দেশের ভাষাকে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধিকে, সমস্ত মানবজাতিকে আমি সাক্ষী মানিতেছি, প্রত্যক্ষ ব্যাপার ও ন্যায়ের আদর্শ—এই উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বলিয়া সকলেই কি স্বীকার করে না? কখন কখন বর্ত্তমান অবস্থা, ন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এবং ন্যায়ের আদর্শও বর্ত্তমান অবস্থাকে শাসন করে,—বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে প্রতিবাদ করে। মনুষ্যসমাজে কোন্ কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শুনা যায়? ন্যায়ের কথাই কি বেশী শুনা যায় না? এমন কোন্ ভাষা আছে যাহাতে ন্যায়শব্দটি নাই? এমন কি, কেহ কেহ ন্যায়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—এক আইন-ঘটিত কৃত্রিম ন্যায়, আর একটি স্বাভাবিক ন্যায়। ন্যায় কখনই বলের পদানত হইতে পারে না, বলই ন্যায়ের সেবায় নিযুক্ত হইবে, ইহাই সর্ব্বত্র পরিঘোষিত হইয়া থাকে। যখনই অতীতের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, কিংবা কোন দেশে প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ন্যায়ের উপর বলের জয় হইয়াছে, তখনই নিঃস্বার্থ পাঠক কিংবা দর্শকের মনে তীব্র ধিক্কার উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, যে পতাকার গায়ে ন্যায় এই শব্দটি অঙ্কিত থাকে, আমাদের অনুরাগ স্বভাবতই সেই পতাকার দিকেই ধাবিত হয়; সেই অজ্ঞাত পক্ষের ন্যায্য অধিকার সমর্থন করিবার জন্যই আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হই, ন্যায়ের পক্ষকেই আমরা সমস্ত মানবমণ্ডলীর পক্ষ বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা মনে করি, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়। অতএব যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই সব নহে,—ন্যায়ের ভাব, ন্যায়ের বিশ্বজনীন আদর্শ,—প্রত্যক্ষ জগতে না হউক,—চিন্তা কল্পনার জগতে জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এই ন্যায়ের আদর্শই প্রত্যক্ষ জগৎকে সংশোধিত করে—পরিশাসিত করে।

এই ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধিকে যখন আমরা সমস্ত মানবজাতির উপর আরোপ করি,—সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া কল্পনা করি, তখনই উহা সহজ জ্ঞান কিংবা সাধারণ বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই সাধারণ সহজ বুদ্ধিই সমস্ত দেশের ভাষাকে, স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসগুলিকে, সমাজকে ও সমাজের মুখ্য ব্যবস্থাগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছে, ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ক্রমশ পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিতেছে। ভাষাসমূহকে বৈয়াকরণেরা, সমাজকে ব্যবস্থাকর্ত্তারা, কিংবা সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে দার্শনিকেরা গড়িয়া তুলে নাই। উহাদিগকে কেহই গড়িয়া তুলে নাই—অথচ সকলেই গড়িয়া তুলিয়াছে; সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর স্বাভাবিক প্রতিভাই উহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধির নিদর্শন, মানুষের তাবৎ কার্য্যেই প্রকাশ পায়। ভাল ও মন্দ, ন্যায় অন্যায়, স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্য ও স্বার্থ, শ্রেয় ও প্রেয়—এই সমস্ত পার্থক্য সমস্ত মানব-ভাষার মধ্যে, সমস্ত মানব ব্যবস্থার মধ্যেই বদ্ধমূল। ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ, অপরাধের দণ্ড দুঃখভোগ—ইহাও সকল ভাষাতে, মানুষের সকল ব্যবস্থাতেই মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত ধারণা, মানুষের ভাষায় ও মানুষের কাজে একটু বিশৃঙ্খল ভাবে ও একটু স্থূল ভাবে প্রকাশ পায়।

এইখানেই দর্শনশাস্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়। দর্শনশাস্ত্রের সম্মুখে দুইটি পথ প্রসারিত। দর্শনশাস্ত্রকে এই দুই পথের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করিতে হইবে। হয়—সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধির ধারণাগুলিকে গ্রহণ করা, এবং মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাসগুলিকে যথাযথরূপে বিবৃত করিয়া উহাদিগকে পরিস্ফুট ও সুদৃঢ় করা; নয়,—কোন একটা মূলতত্ত্ব গোড়ায় মানিয়া লইয়া, তাহারই অনুরূপ একটা মতবাদ গঠন করা;—যে সকল সাধারণ বিশ্বাস সেই মূলতত্ত্বের অনুযায়ী হইবে তাহাদিগকে স্বীকার করা এবং তাহার বিপরীতগুলিকে অস্বীকার করা—এইরূপে একটা দর্শনতন্ত্র কিংবা দর্শনের পদ্ধতিবিশেষ গড়িয়া তোলা।

কিন্তু আসলে, কোন দার্শনিক পদ্ধতিই দর্শন নহে; যেমন রাজ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ, ন্যায়ের আদর্শকে প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, যেমন শিল্পকলা সমূহ, অসীম সৌন্দর্য্যের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, যেমন বিজ্ঞানসমূহ, বিশ্বজনীন বিজ্ঞানের অনুসরণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক দার্শনিক পদ্ধতি কোন আদর্শবিশেষকে প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার জন্য প্রয়াস পায়। সুতরাং দার্শনিক পদ্ধতিগুলার অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী; এই অসম্পূর্ণতা না থাকিলে, জগতে একটি বই দুইটি দর্শনশাস্ত্র থাকিত না। তাহারাই ভাগ্যবান যাহারা দর্শনের কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, কতকগুলি নিরীহ-ধরণের ভ্রমে পতিত হইয়াও, প্রত্যেক মানবের অন্তরে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের পবিত্র রসাস্বাদনের একটা রুচি জন্মাইয়া দেয়! কিন্তু দার্শনিক পদ্ধতিগুলা প্রায়ই নিজ নিজ কালেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে,—কালকে নূতন পথে লইয়া যায় না। যে দর্শনতন্ত্র যে শতাব্দিতে উৎপন্ন হয়, সেই দর্শনতন্ত্র সেই শতাব্দিরই ভাব গ্রহণ করে। এই কালধর্ম্মের প্রভাবেই আমাদের দেশে স্বার্থমূলক নীতিতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সেই নীতিতন্ত্রের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইব।

ঈশ্বর।

মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সুগঠিত হইলেও, তাহাদের শক্তি এত সঙ্কীর্ণ যে, কেবলমাত্র

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞানের কোন কাজ করা চলে না। অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত নক্ষত্রগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এককালে তিন হাজারের অধিক তারকা দেখিতে পাই না। কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিলে সংখ্যা বাড়িয়া যায়। দূরবীন্ দ্বারা আকাশের ফটোগ্রাফ গ্রহণ কর,—দেখিবে যে স্থান দূরবীনেও তারকাশূন্য দেখাইয়াছিল সেখানে শত শত নক্ষত্রের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আকাশের যে স্থানকে চক্ষু নক্ষত্রহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করে, দূরবীন্ সেখানে সহস্র সহস্র নক্ষত্র দেখায়, এবং দূরবীন্‌ও যেখানে নক্ষত্র দেখাইতে পারে না, ফোটোগ্রাফের যন্ত্র সেখানে শত শত নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে।

মানুষের দৃষ্টিশক্তি যে কত দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ এই ক্ষুদ্র উদাহরণে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কেবল দৃষ্টিশক্তির নয়, স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শ উপলব্ধিরও অসম্পূর্ণতা আছে এবং সকল শক্তির এক একটা সীমা ধরা পড়িয়াছে। এই সীমার বাহিরে গেলে, মানুষ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ও সচেতন জীব হইয়াও জড়বৎ কার্য্য করে। তখন স্বাদগন্ধস্পর্শ ইন্দ্রিয়দ্বারে শত আঘাত দিয়াও সাড়া পায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেবল এই সকল অসম্পূর্ণ ও দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনা করা চলে না। কাজেই জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইলেও কতকগুলি অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিয়া লইয়া, তাহাদিগকে কখন কখন বিজ্ঞানে স্থান দিতে হয়।

পদার্থমাত্রই অণুদ্বারা গঠিত, এবং প্রত্যেক অণু আবার দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমষ্টি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদ্যাপি এই সকল অণুপরমাণুর খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহাদের যে অস্তিত্ব আছে রসায়নশাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান, এবং এই অস্তিত্ব মানিয়াই রসায়নশাস্ত্রের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারেরই সুব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অণুপরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইতেছে।

ঈথার জিনিসটা ঐ অণুপরমাণুর ন্যায়ই একপ্রকার অতীন্দ্রিয় পদার্থ। তাপ আলোক বিদ্যুৎ ও চুম্বক প্রভৃতির নানা শক্তির পরীক্ষা করিয়া, এই পদার্থের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে, এবং ইহাকেই মানিয়া লইয়া জড়তত্ত্বের নানা কঠোর সমস্যার সুমীমাংসা হইতেছে। সুতরাং ঈথারের-অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোন কারণই নাই।

এখন ঈথারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈথার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস নয়। সুতরাং ইহার বর্ণ ও গন্ধাদি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমরা ইহার কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের সহিতই পরিচিত। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, অনন্ত মহাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ উপগ্রহ মৃৎপিণ্ড ও বালুকণা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ পদার্থমাত্রেরই অধিকৃত স্থান ঈথারে পূর্ণ। ধাতুপিণ্ডের অণুসকল খুব নিবিড়ভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ, কিন্তু তথাপি ইহার অণুগুলির মধ্যে যে অতিসূক্ষ্ম অবকাশ আছে, তাহা ঈথারে পূর্ণ। ধূলিকণা যখন বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন যেমন প্রত্যেক কণারই চারিদিকে বায়ু ঘেরিয়া থাকে, তরল কঠিন ও বায়বীয় সকল পদার্থেরই প্রত্যেক অণুর চারিদিকে সেইপ্রকার ঈথার ঘেরিয়া রহিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল

উপরে বায়ুর অস্তিত্ব প্রায় লোপ হইয়া যায়, কিন্তু জগদীশ্বর অনন্ত দূরবর্ত্তী কোটি কোটি নক্ষত্রেরও চারিদিকে ঈথারকে চিরব্যাপ্ত করিয়াছেন।

কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। কাচের আবরণের ভিতর একটি ঘড়ি রাখ। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই যদি আবরণের ভিতরকার বায়ু নিষ্কাশিত করা যায়, তখন ঘড়ির শব্দ আর মোটেই কর্ণে আসিবে না। এই সামান্য পরীক্ষাদ্বারা বায়ুই যে শব্দবহনের কারণ তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এখন বায়ুশূন্য পাত্রের পশ্চাতে একটি দীপ-শিখা রাখিয়া সম্মুখ হইতে শিখার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দীপের আলোক কাচের বাধা অতিক্রম করিয়া এবং বায়ুহীন পাত্রের ভিতর দিয়া অবাধে আসিয়া চোখে পড়িবে। বায়ুর অভাবে শব্দের চলাচল যেমন বন্ধ হইয়াছিল, আলোকের গতায়াত তাহাতে মোটেই অবরুদ্ধ হইল না।

এই দুইটি পরীক্ষার কথা ভাবিলে শব্দ-বহ বায়ুর ন্যায় আলোকবহ কোন এক-প্রকার জিনিসের কথা স্বতঃই আমাদের মনে পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ঈথার-কেই সেই আলোকবহ পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদার্থ যতই ঘন হউক না কেন, তাহার ঘন-বিন্যস্ত অণুগুলির মধ্যে এক একটু ব্যবধান সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। কোনপদার্থেরই অণু পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া থাকে না। এখন যদি এইপ্রকার বিচ্ছিন্ন অণুময় কোন পদার্থের একপ্রান্তে তাপ বা বিদ্যুৎ প্রয়োগ করা যায়, তবে তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিত হইয়া শীঘ্রই অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে বায়ুর তাপ বা বিদ্যুৎকে কে পরিবাহন করে? ইহা কোনক্রমে বায়ুর কার্য্য হইতে পারে না। কারণ বায়ুহীন স্থানে বিদ্যুৎ ও তাপের পরিবাহন পূর্ণমাত্রাতেই চলিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এক-ঈথারকেই তাপ ও বিদ্যুৎ উভয়েরই পরিবাহক বলিয়া স্থির করিয়া-ছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে ঈথার যে কেবল সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা নয়, বায়ু যেমন শব্দের পরিবাহক ঈথার জিনিসটা সেই প্রকার তাপ আলোক বিদ্যুৎ এই তিনেরই পরিবাহক।

এখন পরিবাহনকার্য্য কিপ্রকারে চলে দেখা যাউক। স্থির জলের কোন অংশ আলোড়িত করিলে, আলোড়ন একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। আহত অণুগুলি উঠিয়া নামিয়া পার্শ্বস্থ অণুগুলিতে সেই আলোড়ন সঞ্চারিত করে, এবং এই ধারায় তাহা তরঙ্গাকার প্রাপ্ত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইপ্রকার তরঙ্গ উৎপাদন করিতে অণুগুলি স্থানচ্যুত হয় না। কেবল কিয়ৎকালের জন্য উপরনীচে আন্দোলিত হইয়া এবং এই আন্দোলন-বেগ পার্শ্বস্থ অণুতে সঞ্চারিত করিয়া সেগুলি ক্রমে স্থির হইয়া পড়ে। তরঙ্গে ভাসমান কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, জলের অণুগুলির এই কার্য্য বুঝা যায়। ভাসমান জিনিস তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যায় না, একই স্থানে থাকিয়া আন্দোলিত অণুগুলির সহিত উপরনীচে উঠিতে নামিতে থাকে মাত্র। পরিবাহন কার্য্যটা ঈথার জলের ন্যায়ই করে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার কোন এক অংশ তাপ আলোক বা বিদ্যু-তের দ্বারা স্পন্দিত হইলে, সেই স্পন্দন তাহার অণুপরম্পরায় পরিবাহিত হইয়া অতি দ্রুতবেগে বহুদূরে পরিচালিত হয়। তরঙ্গ পরিচালনে জলের অণু যেমন স্থানভ্রষ্ট হয় না, এখানে ঈথারের অণুও সেইরূপ স্থান-

চ্যুতি ঘটে না। একটু এদিক্-ওদিক্ কাঁপিয়া এবং সেই কম্পন পার্শ্বস্থ অণুতে সঞ্চারিত করিয়া ঈথারের প্রত্যেক অণুই স্থির হইয়া যায়।

আলোড়নের মাত্রার তারতম্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে জলতরঙ্গের উচ্চতারও তারতম্য আসিয়া পড়ে। ঈথারসাগরে যে সকল তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহাদেরও ঐ প্রকার বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে। এই বিচিত্র তরঙ্গ-মালাই আমাদের নানা ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়া, তাপালোক ও বিদ্যুতের নানা কার্য্য দেখায় বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ঈথরের তরঙ্গ একটা নিছক্ কল্পনার জিনিস বলিয়া কেহ মনে না করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সুকৌশলে নানা প্রকার ঈথর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত পরিমাপ করিয়াছেন। হিসাবে দেখা গিয়াছে, এক ইঞ্চিকে চল্লিশ হাজার সমান অংশে ভাগ করিয়া, তাহার এক অংশ লইলে যে একটু অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, সেই দৈর্ঘ্যের ঈথর-তরঙ্গ আমাদের চক্ষে আসিয়া আঘাত দিলে আমরা লোহিতালোক দেখিতে পাই, এবং দৈর্ঘ্য ক্রমে কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ক্রমে হলুদ, সবুজ ও বেগুণিয়া প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি হয়। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ঈথরতরঙ্গগুলি দ্বারা যে কি কার্য্য হয়, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় তাহা বুঝিতে পারে না। তরঙ্গের কম্পন ধীরতর হইতে হইতে যখন প্রতি সেকেণ্ডে একশতবার হইয়া দাঁড়ায়, তখন উহা আবার আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এই অবস্থায় ঈথরতরঙ্গ আলোকজ্ঞান উৎপন্ন করায় না, ইন্দ্রিয় দ্বারে আঘাত দিয়া তাপাকার পরিগ্রহ করে।

হারমোনিয়মের এক একটা পর্দাকে বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের এক একটা ঈথরতরঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। সঙ্গীতবিৎ হারমোনিয়মের কয়েকটি মাত্র সপ্তকের পরদা নাড়া চাড়া করিয়া থাকেন। এই সীমার উপর নীচে গেলে পরদার সুর এত মিহি ও এত মোটা হইয়া পড়ে যে তখন সেই সকল সুরে আর সঙ্গীতের কাজ চলে না। সরুমোটার পরিমাণ আরো বাড়িয়া গেলে সেগুলি কর্ণে পৌঁছিয়া শব্দ-জ্ঞান পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারে না। ঈথর-তরঙ্গের পরদাগুলিরও অবস্থা কতকটা সেই প্রকার। ইহার কেবল এক সপ্তকের পরদার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। ইহাই সেই লোহিত পীতাদি সাত সুরের পরদা। এগুলি অপেক্ষা যে তরঙ্গগুলি দীর্ঘতর বা ক্ষুদ্রতর তাহাদের কার্য্য কি তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের জানা ছিল না। ক্রমে এগুলির বিশেষ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। X-Rays নামক অদৃশ্য কিরণের কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইহা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঈথর তরঙ্গেরই ফল বলিয়া জানা গিয়াছে, এবং যেগুলির দৈর্ঘ্য তাপোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষাও বৃহত্তর তদ্দ্বারা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপত্তি দেখা গিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (Clerk Maxwell) অনুমান করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ আলোক ও বিদ্যুৎ উভয়ই ঈথার তরঙ্গদ্বারা উৎপন্ন। দৈর্ঘ্যের তারতম্যেই সেগুলি কখন আলোক এবং কখন তাপ বা বিদ্যুৎ আকারে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। ম্যাক্সওয়েল জীবনকালে এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করিবার সুযোগ পান নাই। তাপালোক ও বিদ্যুৎ সকলই যে ঈথার তরঙ্গেরই কার্য্য,

পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আলোক ও বিদ্যুৎ উভয়েই প্রতিসেকেণ্ডে একশত পঁচাশি হাজার মাইল বেগে পরিচালিত হয়। আলোকরেখা যে নিয়মে দিক্ পরিবর্ত্তন করে ও প্রতিফলিত হয়, ঈথার তরঙ্গের প্রতিফলনাদিতেও জর্ম্মানপণ্ডিত হার্জসাহেব, এবং আমাদের স্বদেশবাসী মহা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অবিকল সেই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তাপালোক ও বিদ্যুৎ সকলই এক ঈথারেরই নানাপ্রকার তরঙ্গদ্বারা উৎপন্ন হইলে, তাহাদের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলির মধ্যে এত অনৈক্য কোথা হইতে আসে? ধাতুর সূক্ষ্ম পাত আলোকপথে ধরিলে, আলোক বাধা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না, কিন্তু তাপ ও বিদ্যুৎ উভয়েই বাধা অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। যে জিনিস তাপের পথ রোধ করে তাহাই আবার অনেক সময়ে আলোককে অবাধে চলিতে দেয়। আলোক সর্ব্বদাই একসরল রেখাক্রমে চলে, কিন্তু বিদ্যুৎকে অনেক সময় আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে দেখা যায়। এই সকল অনৈক্যের কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন কোন পদার্থ দ্বারা আলোক একবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ঈথরের অভাবকে কখনই ইহার কারণ বলা যায় না। ঈথর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। সুতরাং কোন স্থানেই ঈথরের অভাব নাই। ঈথরের তরঙ্গ বিশেষকে বাধা দেওয়া বা অবাধে চলিতে দেওয়া পদার্থের অণুগুলিরই বিশেষ ধর্ম্ম। কাচের অণুগুলির প্রভাবে তাহাদের চারিপার্শ্বের ঈথরের অবস্থা এপ্রকার হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাতে কেবল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই কাচের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি অবাধে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সকল বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ দ্বারা বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, তাহা ঐ আবদ্ধ ঈথরে উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ কাচের ভিতর দিয়া অবাধে চলে না। ধাতুর অণুগুলির ব্যবধানস্থিত ঈথার ক্ষুদ্র তরঙ্গাকারে কাঁপিতে পারে না। এজন্য ধাতু মাত্রেই অস্বচ্ছ। কিন্তু তাপ ও বিদ্যুতের বড় বড় তরঙ্গগুলি সেই ঈথরকেই কাঁপাইয়া অনায়াসে বাহিরে আসিতে পারে।

পদার্থের অণু কি প্রকারে আবদ্ধস্থানের ঈথরে পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার গুণ উৎপন্ন করে তাহা আজও জানা যায় নাই, এবং অণুর প্রভাবব্যতীত অপর কোনও কারণে ঈথর ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইতে পারে কি না তাহারও স্থিরতা নাই। বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির নানা প্রহেলিকার মধ্যে এটা যে আজও রহস্যযবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বিদ্যুতের সহিত চুম্বকধর্ম্মের একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। ঈথরের স্পন্দন বিশেষই পদার্থকে চুম্বকধর্ম্মী করে, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লর্ড কেল্ভিন্ ও জর্ম্মান্ পণ্ডিত হেলম্হোজ্ ঈথরের আরো অনেক নব নব ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। প্রাথমিক জড়ের উৎপত্তি কিপ্রকারে হইয়াছিল, এবং কি প্রকারে জড়পদার্থমাত্রই আকর্ষণ বিকর্ষণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, প্রাচীন ও আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিকই তাহার আভাসপর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। মূল জড়কণা ঈথরেরই আবর্ত্ত বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া লর্ড কেল্ভিনের বিশ্বাস হইয়াছিল, এবং ইহার আকর্ষণ বিকর্ষণও ঈথরের কাজ বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন। এই সকল অনুমানের সমূলকতা প্রতিপাদনের জন্য লর্ড কেল্ভিন্ ও হেলম্হোজ্ উভয়েই কিছুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাপি এই অনুমানগুলিকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।

ধ্রুবতারা।

ভ্রান্তনর! বৃথা কেন কর অহঙ্কার,
সংসার তিমির মাঝে না পাবে নিস্তার;
লক্ষ্য ভ্রষ্ট তুমি নর—ধ্রুবতারা ওহে,
হেথা নহে—হোথা নহে বহুদূরে রহে।

অন্ধকার নাহি সেথা শুধু জ্ঞানালোক,
সন্তাপ, সংশয় নাহি জরা, মৃত্যু, শোক,
অনাদি জোৎস্না এক সদা পরকাশ,
নাহি বহে কালনদী, নাহি নীলাকাশ;
অগণ্য অমর জ্যোতি একেতে পশিয়া,
শোভিতেছে নিরবধি অনন্তে ফুটিয়া;
তথায় তোমার গতি, মরণের পরে,
মর্ত্ত্য ছাড়ি যেতে হবে মহান ঈশ্বরে;
ত্যজ দম্ভ, ত্যজ দ্বেষ, তাঁহাতে নির্ভর,
জনম মরণ স্থিতি যাঁতে নিরন্তর।
সংসার বন্ধন তব মোহের বন্ধন,
বিপাকে ফেলিছে নিত্য, ঘোর নিবন্ধন,
তাহাতেই আছ লিপ্ত তুমি মূঢ় নর,
ক্ষণেকেও নাহি ভাব ব্রহ্ম পরাৎপর,
দাও ঢালি তব প্রাণ তাঁহার চরণে,
পাইবে পরম সুখ জীবনে মরণে।

শ্রীপৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী।

নানা কথা।

অহিফেন নির্ব্বাসন।—Friend of China অর্থাৎ চীনবন্ধু নামক সংবাদপত্রে চীন-অহিফেনসেবির ধূমপানের যন্ত্রাদি দাহনের একটি সুন্দর চিত্র বাহির হইয়াছে। বিগত সেপ্টেম্বর মাহার শেষে চীনের Hangchow হ্যাংচ নামক স্থানের সিটি-হলে প্রায় বিংশ সহস্র চীনদেশস্থ ধূমপায়ী তাহাদের ধূমপানের নল ও অন্যান্য উপকরণ রাশীকৃত করে। ঐ রাশির তলদেশ ছয় ফিট ও উচ্চতা সাত ফিট হইয়াছিল। তৈলমিশ্রিত তৃণযোগে নির্দ্ধারিত সময়ে সকলের সমক্ষে উহাতে অগ্নিদান করা হয়। তাহাদের উল্লাস ও কলরবের মধ্যে অচিরে ঐ স্তূপ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। আমরা উক্ত পত্রিকা সম্পাদকের ভাষায় বলিতেছি "যে সকল চীন-অহিফেনসেবী অহিফেনের সহিত এরূপ তীব্র সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং যে সকল রাজকর্ম্মচারী অহিফেন-বন্ধন হইতে প্রজাগণকে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য ঈশ্বরের অমোঘ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর।" চীন জাগিতেছে। ভারতেরও ঘোর মহানিদ্রার মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। এ শুভক্ষণে মতভেদজনিত অন্তর্ব্বিবাদ অঙ্কুরের মুখেই বিনষ্ট হউক; সমবেত চেষ্টা সকলের কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হউক; ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।—২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখের Indian messenger পত্র সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে "বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত ঋষি-ভাবের আদর্শ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ; তাঁহার জীবনের আদর্শই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। তাঁহার সমুন্নত জীবনের ভাবকে আমাদের মধ্যে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।"

একেশ্বরবাদ।—২৫এ জানুয়ারি তারিখের Christian life নামক বিলাতীয় সংবাদ পত্রে আছে, ১৮৩০।২৩এ জানুয়ারি তারিখে মনিষী রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে British and Foreigu Unitarian association একেশ্বরবাদ-সভা ইংলণ্ডে সমুদ্ভূত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দুই সভার মধ্যে মতে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। ইতিহাসের দিক দিয়া বলিতে গেলে বিগত শতাব্দিতে ভারতীয় একেশ্বরবাদের প্রভাব বিলাতে পরিলক্ষিত হয়। রেভাঃ W. Adam আডাম সাহেব ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন এবং সকলের নিকট Second Fallen Adam দ্বিতীয় পতিত আদম বলিয়া পরিচিত হয়েন। রামমোহন রায়ের শক্তি আডাম সাহেবের ভিতরে কার্য্য করিয়াছিল এবং তিনিই এডাম সাহেবের মতপরিবর্ত্তনের কারণ ছিলেন। এডামের মত পরিবর্ত্তন ১৮২১ খৃঃ অব্দে ঘটে, এবং ১৮২৩ সালে Unitarian association একেশ্বরবাদ-সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিজন সাহেব এবং তিনজন ভারতবাসী প্রথমে উহার সভ্য হন। ঐ সভা বহুদিন স্থায়ী না হইলেও ব্রাহ্মসমাজ উহারই স্থান অধিকার করিয়া লয়। সে আজ ৭৮ বৎসরের কথা।

ব্রাহ্মসম্মিলন।—বিগত ১১ই ফাল্গুন ৭নং বজবজ রোডস্থিত মহারাজা ময়ূরভঞ্জের উদ্যানে তিন সমাজের ব্রাহ্মগণের দিবসব্যাপী সম্মিলন হইয়াছিল। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম তথায় উপস্থিত ছিলেন। এরূপ সম্মিলনের যে বিশেষ উপকারিতা আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সপ্তম-শতাব্দির ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের অধ্যক্ষ Rev. J. Estlin Carpenter, Leeds লিড্স নগরে "সপ্তমশতাব্দির ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার মূলে আভাস দেন যে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপরে যতদিন না ইংলণ্ড প্রকৃত মর্য্যাদা দান করিতে শিক্ষা করিবেন, ততদিন ইংলণ্ড হইতে বর্ত্তমান ভারতের ন্যায়বিচারের আশা নাই। চীনদেশীয় পরিব্রাজক Yuan Chwang হিয়ান সাং ভারত ভ্রমণে আসিয়া পাটনার দক্ষিণ পশ্চিমস্থ নলান্দা নামক স্থানে গমন করেন। নলান্দা সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল। ঐ স্থানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। আট মহল বাটী, বহুসংখ্যক সুন্দর মন্দির ও অনেকগুলি অট্টালিকা জুড়িয়া এক শিক্ষালয় সুবৃহৎ উদ্যান অধিকার করিয়াছিল। সমগ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য, সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত জনৈক তত্ত্বাবধারকের নিয়ন্তৃত্বে পরিচালিত হইত। বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বৌদ্ধগণের ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বির বিবিধ বিষয়ক শিক্ষা তথায় প্রদত্ত হইত। এমন কি গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা দানের পদ্ধতিও অতি সুন্দর ছিল। বিভিন্নধর্ম্মী হইলেও অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিবার কাহারও কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। উদারভাবেই অধ্যাপনা কার্য্য চলিত। সে আজ কত কালের কথা। উহার ইতিহাস বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু তাহা হইলেও অতীত-ভারতের এই যে প্রাচীন শিক্ষা-দান ব্যবস্থা তাহা বক্তার কথায় বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালের পক্ষে আদর্শের অবিষয় হইতে পারে না। Indian world. January 1908.

প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার।

"কি কারণে বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি"—এই বিষয়ে যাহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই প্রবন্ধ-লেখককে ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং তাঁহার প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ও আবশ্যক হইলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হইবে। লিখিত প্রবন্ধ, আগামী ১২ই আশ্বিনের মধ্যে ১৯নং ষ্টোর রোড—বালীগঞ্জ কলিকাতা—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিতব্য। বিচারক :—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, মাঘ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৬৭॥৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮১১।৶০
সমষ্টি	...	৩২৭৯৵৩
ব্যয়	...	৪১৬৶৩
স্থিত	...	২৮৬২৸৶০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ২৬২৸৵০

২৮৬২৸৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ২৪৮৸৶০

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান ২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী ২৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মল্লিক ১৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু নরনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫৲

শ্রীযুক্ত রাজা কালিপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র ৫৲

দানাধারে প্রাপ্ত ৸০

একটা কেরোসিনের টিন বিক্রয় ৶০

২৪৮৸৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৭/০
পুস্তকালয়	...	২৩৵০
যন্ত্রালয়	...	১৭৮॥/৩
সমষ্টি	...	৪৬৭॥৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬৪॥৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২১/৩
পুস্তকালয়	...	॥৵৬
যন্ত্রালয়	...	১১৮৸/০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১১ ৫৩
সমষ্টি	...	৪১৬৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প
দ্বিতীয়ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসংবৎ ৭৯।
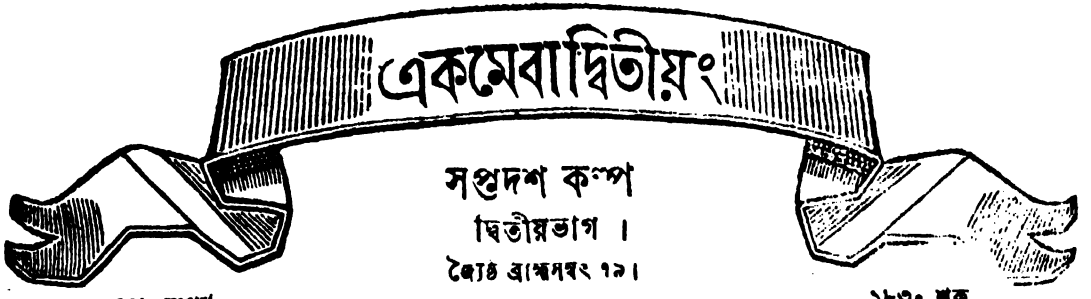
৭৭৮ সংখ্যা | ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দুঃখ-রহস্য।

মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে দুঃখ অমঙ্গল কেন? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি কি এই অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারিতেন না? হয় তিনি চাহেন না, তাঁহার ইচ্ছা নাই; না হয় তিনি পারেন না, তাঁহার শক্তি নাই। এই দুঃখ সমস্যা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ইহার মীমাংসা করিবার উদ্দেশে কোন কোন ধর্ম্মে মঙ্গল অমঙ্গল দুই পৃথক্ দেবতা কল্পিত হইয়াছে; তার সাক্ষী খৃষ্টধর্ম্মের সয়তান, পারসী ধর্ম্মের অহ্রিমান। কিন্তু তাহাতে এই গুহ্যের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। সয়তান কিম্বা অহ্রিমান কখন স্বয়ম্ভূ আদ্যশক্তি হইতে পারে না—তবে তাহাদের সৃষ্টি হইল কেন? অতএব আগেও যাহা এই দ্বিত্ব-কল্পনাতেও সেই আপত্তি। দেবতা এক; গতবারে বলিয়াছি, জগতে মঙ্গল অমঙ্গল একেরই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে—সুখ দুঃখ তাঁহারই ভৃত্য—যিনি জীবনদাতা তিনিই মৃত্যুর অধীশ্বর। এই বিষয়টি আর একটুকু তলাইয়া দেখা যাক্।

প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই আমাদের অপূর্ণতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ সেদিন এখানে দুঃখ বিষয়ক যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে ঐ কথা সুন্দররূপে কবির ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব একসঙ্গে বাঁধা, কারণ অপূর্ণতাই ত দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সৃষ্টির অপূর্ণতা অনিবার্য্য। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্য্য কারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়াই পূর্ণের প্রকাশ, জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখ চেষ্টার মধ্যেই সফলতা।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতার বিকাশের এক অঙ্গ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে, কিন্তু

তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি এই অপূর্ণতার একটি নিত্য সহচর দুঃখ ও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ।

ভ্রাতৃগণ! একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে অপূর্ণ বলিয়াই আমাদের দুঃখ, অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ, দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরম পূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে। সাধনা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি তাহার অর্থ এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ, সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম, আনন্দ—মুক্তি—ঈশ্বর।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ; সেই জন্য আর এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ স্বরূপ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড় দুঃখ বহন করিবে কে? কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়, তাহার আনন্দও তত খানি; সম্রাটের সাম্রাজ্য রচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গাড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের সাধনাও তাই।"

কেহ আপত্তি করিতে পারেন এই যাহা বলা হইল ইহাতে সকল প্রকার দুঃখোৎপত্তির মীমাংসা হয় না। মানিলাম যে সাধনার দুঃখ, তপস্যার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাহার পরিণাম সুখকর কল্যাণকর, এই দুঃখ আনন্দ-নিদান, অতএব ইহা দুঃখ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এমন কি দুঃখ কষ্ট নাই যাহা আমাদের ক্রিয়া-প্রসূত নহে, যাহাতে আমাদের নিজের কোন হস্ত নাই এবং যাহার ফলও সুখজনক হিতজনক নহে। এমন কত শত আকস্মিক বিপদ আসে মহামারী, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, নৌকাডুবী—তাহাতে কত কত গ্রাম নগর বিনষ্ট হইয়া যায়—কত শত নিরপরাধী মনুষ্য অকারণে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহার কারণ কি? হে মূঢ় মানব! যে মহা প্রাকৃতিক নিয়মে এই সকল উৎপাত ঘটিতেছে তুমি কি চাও তোমার সুবিধার নিমিত্ত বিশ্বপাতা তাহা বদলাইয়া দিবেন? মাধ্যাকর্ষণ, অগ্নির দাহিকা শক্তি, আলোকের পরাবর্ত্তন, বায়ুর গতি এই যে সকল নিয়মে সমগ্র বিশ্বের হিতসাধন হইতেছে তোমার জন্য তাহাদের রূপান্তর ঘটিবে? তিনি বলিতেছেন "আমার এই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম অখণ্ডনীয়, কিন্তু বৎস! তোমাকে এরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিতেছি যাহার গুণে তুমি ক্রমে এই অন্ধ প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সেই ধীশক্তিকে মার্জ্জিত ও উন্নত কর, তাহার ফলে প্রকৃতি প্রভু না হইয়া দাসের ন্যায় তোমার পরিচর্য্যা করিবে, রোগের বিবিধ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবে, জল বায়ু অগ্নি ভৃত্যের ন্যায় তোমার সেবা করিবে, আকাশের বিদ্যুৎ তোমায়

চামর ব্যজন করিবে এবং তোমার দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তোমার বাষ্পপোত উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া অনায়াসে গতি-বিধি করিবে, ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাস জানিয়া এবং সুকৌশলসম্পন্ন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে সুরক্ষিত থাকিবে” এই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম যাহা আমরা আপাতত অমঙ্গল মনে করি তাহা সমগ্র বিশ্ব-জগতের কল্যাণপ্রসূ এবং মনুষ্যেরও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহায়ভূত।

তবে মৃত্যু কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি মৃত্যু কি বাস্তবিকই অমঙ্গল? জন্ম হইলেই মৃত্যু—এ নিয়ম সার্ব্বজনীন, অপরিহার্য্য, ইহাতে দোষ ধরিবার কি আছে? আমরা যে মৃত্যুকে এত ভয় করি, তাহা তাহার নিজের জন্য তত নয়, রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা বিচ্ছেদ বিয়োগ তাহার এই সমস্ত আনুসঙ্গিক বিপদই ভয়ের কারণ। ভাবিয়া দেখ এই অধিকাংশ বিপদের জন্য আমরা কি আপনারাই দায়ী নহি? আমরা অনবধানতাবশত অনেক সময় মৃত্যুকে ডাকিয়া আনি, অত্যাচার দোষে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ বিধ্বংস করিয়া অকালমৃত্যুরূপ ফলভোগ করি, তখন আমরা আপনার দোষ না দেখিয়া বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমরা সকলেই চিরায়ু প্রার্থনা করি, কিন্তু সত্যসত্যই যদি চিরজীবন বর পাইতাম তাহা হইলে কি বাস্তবিকই সুখী হইতাম? সে বর কি বিষম শাপ হইয়া দাঁড়াইত না? আর এক কথা, আমাদের আয়ু স্বল্প কিন্তু কাল অনন্ত। মৃত্যু আমাদের মাঝখানে আসিয়া এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যায় মাত্র। আমরা এই পৃথিবীতে শিক্ষা ও পুণ্য অর্জ্জনের জন্য আসিয়াছি, আমাদের যোগ্যতা ও উন্নতি অনুসারে স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং—স্বর্গ হইতে স্বর্গ—আনন্দ হইতে আনন্দ—এই আমাদের গতি। যে ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আমাদের জন্ম, তাহা মধ্যপথের পান্থশালা মাত্র। আমরা অমৃতনিকেতনের যাত্রী, অনন্ত উন্নতির অধিকারী, অতএব মৃত্যু আমাদের ভয়ের জিনিস নহে, মৃত্যু আমাদের পরম হিতকরী বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এই দুঃখ তত্ত্বের আর একদিক দেখিবার আছে। আমাদের শারীরিক মানসিক নানাপ্রকার দুঃখ বিপদ আছে, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক বিপদ যে পাপ তাহার উৎপত্তি কিসে হইল, কেন হইল? মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর কি এই পাপস্রোত প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না? তিনি আমাদের মধ্যে এই পাপের প্রবেশ কেন অনুমোদন করিলেন? খৃষ্টধর্ম্মের মতে এই পাপ হইতে মানব কুলের উদ্ধারের জন্য খৃষ্টের বলিদান আবশ্যক হইল। সে যাহা হউক, এই প্রশ্নের সহজ উত্তর যাহা আমার মনে হয় তাহা এই।

পাপ কি? না, ভাল মন্দ এই দুয়ের মধ্যে জানিয়া শুনিয়া মন্দ গ্রহণ করাই পাপ। অন্য কথায়, ভালমন্দ নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা হইতেই পাপের উৎপত্তি। যেমন উপনিষদে আছে

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
> স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয় ও প্রেয় আমাদের সম্মুখে, আমরা তাহাদের মধ্যে একটি ছাড়িয়া আর একটি বাছিয়া লইতে পারি।

> তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি
> হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে।

তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেয় গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

আমি শ্রেয় ও প্রেয়,—ন্যায় অন্যায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম—ইহাদের মধ্য হইতে একটি বাছিয়া লইতে পারি, আমার এইটুকু স্বাধীনতা। ইহা হইতেই পাপ-পুণ্য। অবশ্য ঈশ্বর আমার আত্মাকে যন্ত্রের ন্যায় এমন করিয়া গঠিত করিতে পারিতেন যে, যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে এইরূপ বাধ্যতা থাকিত অথবা পশুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আর আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিত না। ভ্রাতৃগণ! সেই অবস্থা কি প্রার্থনীয়? কখনই না। আত্মবলে পাপের উপর জয়লাভ করাতেই আমাদের পুরুষত্ব।

মনুষ্যের চরিত্র গঠন, আত্মার উন্নতি সাধন, ন্যায় সত্য ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তবে পাপের দ্বার মুক্ত রাখা ভিন্ন সে ইচ্ছা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

যদিও পাপাচরণে মনুষ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তথাপি পাপের পথে শত প্রকার বিভীষিকা রাখিয়া, বহুবিধ কণ্টক স্থাপন করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে পাপ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মনুষ্যজীবন এরূপে গঠিত, মনুষ্যসমাজ এরূপে নিয়মিত যে পাপের স্থায়িত্ব নাই—তাহার পরাভব হইবেই হইবে। আপাতত সে জয়লাভ করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্যে সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। ধর্ম্মেরই জয় হয়, অধর্ম্মের জয় হয় না। জীবনের নিয়মই এই যে পাপ আত্মঘাতী, মঙ্গল কল্যাণপ্রসূ। এই উভয়ের মধ্যে অনেককাল ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে পারে কিন্তু পরিণামে মঙ্গলেরই জয়।

জগতের ইতিহাস দেখ। ফরাসিস বিপ্লবে প্রলয়ের রাক্ষসেরা এক সময় কি ঘোর পাশব নৃত্যে মাতিয়া উঠিল—দিগ্বিদিক রক্তস্রোতে ভাসিয়া গেল, কিন্তু সে কতকালের জন্য? শীঘ্রই সেই শোণিতে ইউরোপীয় সমাজ শোধিত হইল—সমীচীন সভ্যতা ও উন্নতির যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

ব্যক্তিগত জীবনেও ঐ দেখা যায়। আমরা যদি দশজনে মিলিয়া স্বার্থের প্ররোচনায় কোন কার্য্য আরম্ভ করি—প্রতিজনে আপনার আপনার দেখিয়া কার্য্য করি তাহা হইলে কি হয়? পরস্পরের স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হইয়া সে কার্য্য কি ভণ্ডুল হইয়া যায় না? আর যে কার্য্যের মূল ন্যায়, যে কার্য্যের মূলে মৈত্রী, লোকহিত যে কার্য্যের মূল-প্রবর্ত্তক, সে কার্য্যের উপর ঈশ্বরের প্রসাদ বর্ষিত হইয়া তাহা সফল ও সুসিদ্ধ হইবেই হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়মই এই যে যাহা মঙ্গল তাহার বিকাশ, যাহা অমঙ্গল তাহার বিনাশ। যে মঙ্গল অনুষ্ঠান করে, তার ক্রমশই বলবৃদ্ধি হয়—পাপকারীর ক্রমেই বলক্ষয় হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যাহা, মানবসমাজ ও জাতির পক্ষেও সেই নিয়ম।

অবশ্য আপাতত অধর্ম্মের জয় দেখিয়া মনে হইতে পারে এই বুঝি অধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু বন্ধুগণ ইহা নিশ্চয় জানিও তাহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্ম দ্বারা আজ ইনি সম্পদবান্, পরে ইঁহার সকল দিক্ প্রসন্ন—শত্রুদল পদদলিত—সমূলস্তু বিনশ্যতি—পরিশেষে সমূলে বিনাশ।

আমি এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার

প্রয়োজন দেখি না। দুঃখ-রহস্য প্রকাণ্ড ও অতীব দুরূহ ব্যাপার। কূটতর্কের সমুদয় আপত্তি তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদের চিন্তার জন্য মোটামুটি কতকগুলি যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলাম। কুতর্কের অন্ত নাই। ভগবান যদি কোন পণ্ডিতাভিমানী তার্কিককে অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন, অশেষ সুখে সুখী করেন তাহা হইলেও সে বলিবে, এ অপেক্ষাও আমাকে অধিক সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী কেন করিলেন না? সংশয়াত্মার মনে কিছুতেই শান্তি হয় না। আমরা এই অনর্থক তর্কজালে আবদ্ধ হইব না। মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের শান্তি নাই, গতি নাই। শিশু যেমন আপন মাতার আন্তরিক ভাব অনেক সময় বুঝিতে পারে না, তাঁহার স্নেহের তাড়না পাইয়া ক্রন্দন করে অথচ জননার ভালবাসার প্রতি সন্দেহ করে না, তাঁহার ক্রোড় আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ, আমরাই বা কি? আমরা অন্ধকারে ভীত হইয়া শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করি কিন্তু হাজার ভয় পাই, দুখ পাই, কখনই সেই অখিলমাতার স্নেহের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস হারাইব না। আমরা সেই সকল মহাপুরুষের আদর্শে জীবন গড়িয়া তুলিব, যাঁহারা আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা, ধর্ম্মগুরু, ধর্ম্মপিতা, যাঁহারা সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়া, অশেষ দুঃখ ক্লেশ মাথায় বহিয়াও সেই মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস হারান নাই; তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং তাঁহারই হস্তে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে আমরা বলিব—

হে ভগবন্! আমাকে বধ কর তথাপি তোমাকে অবিশ্বাস করিব না, তোমার চরণ ধরিয়া থাকিব। হে মঙ্গলময়, আমরা তোমার গূঢ় অভিপ্রায় কি বুঝিব? কিন্তু বুঝি বা না বুঝি—আমরা নিশ্চয় জানি তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্যই সকল করিতেছ।

জানি তুমি মঙ্গলময়
প্রতি পলকে পাই পরিচয়।
সুখে রাখ দুখে রাখ যে বিধান হয়
কিছুতেই নাহি ভয়।
জানি তুমি মঙ্গলময়।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বার্থের নীতি।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, এমন-একটা নীতিতন্ত্রে অগত্যা উপনীত হইয়াছে যে নীতির মূলসূত্র স্বার্থ।

মানুষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে; মানুষ সুখের অন্বেষণ করে ও দুঃখ হইতে পলায়ন করে। ইহাই তাহার গোড়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সুখের বিষয় পরিবর্ত্তন হইতে পারে, নানাপ্রকারে সুখের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে পারে; কি শারীরিক, কি মানসিক, কি নৈতিক,—সুখ যে আকারই ধারণ করুক না কেন—মানুষ সতত সেই সুখেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

বিশেষ বিশেষ সুখজনক অনুভূতিসমূহ যখন সামান্যে পরিণত হয়, তখন উহা "উপযোগী" এই নাম ধারণ করে; যে

সুখ শুধু অমুক অমুক ক্ষণে বদ্ধ নহে, পরন্তু কালের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া থাকে,—সে যে প্রকার সুখই হউক না কেন—তাহারই বিপুল সমষ্টিকে আনন্দ বলে।

সুখ ও আনন্দ যে ব্যক্তি অনুভব করে, সেই অনুভবকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সুখ ও আনন্দ আপেক্ষিক; ইহা আসলে ব্যক্তিগত। সুখ ও আনন্দকে ভালবাসিয়া আমরা নিজেকেই ভালবাসি।

সকল জিনিসের মধ্যেই এই সুখ ও আনন্দ অন্বেষণ করিবার উদ্দেশে আমরা যাহার দ্বারা পরিচালিত হই তাহাই স্বার্থ।

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যেরূপ আনন্দ, আমাদের সমস্ত কাজের একমাত্র প্রবর্ত্তক সেইরূপ স্বার্থ।

নিজের স্বার্থ ছাড়া মানুষ আর কিছুই অনুভব করে না, কিন্তু প্রকৃত স্বার্থ মানুষ কখন ঠিক্ বুঝে, কখন ঠিক্ বুঝে না। সুখী হইবার একটা বিশেষ কলাকৌশল আছে। সুখের মধ্যে কোন দুঃখ প্রচ্ছন্ন আছে কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া, জীবন পথে কোন সুখ আসিলেই যেন আমরা তাহাকে আলিঙ্গন না করি। বর্ত্তমান সুখই সব নহে। ভবিষ্যৎ চিন্তাও আবশ্যক; যে ভোগসুখ পরিতাপ আনয়ন করিতে পারে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; আনন্দের জন্য—অর্থাৎ যে সুখ অধিকতর স্থায়ী ও ততটা উন্মাদক নহে সেই উচ্চতর সুখের জন্য—এই নীচ সুখকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। শারীরিক সুখই একমাত্র সুখ নহে; ইহা ছাড়া অন্য সুখও আছে—যথা, মনের সুখ, মতের সুখ। জ্ঞানী ব্যক্তি, একজাতীয় সুখের দ্বারা অন্য জাতীয় সুখের তীব্রতা নষ্ট করেন।

উচ্চতর সুখের নীতিই স্বার্থের নীতি, তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই নীতি —সুখের স্থানে আনন্দকে, মনোজ্ঞের স্থানে উপযোগীকে, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগের স্থানে, পরিণামদর্শিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নীতি— ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি শব্দ অস্বীকার করে না, পরন্তু নিজের ধরণে উহাদিগের ব্যাখ্যা করে। বিবেকদৃষ্টিতে যাহা আমাদের প্রকৃত স্বার্থ তাহাই মঙ্গল, তাহার বিপরীতই অমঙ্গল। যে জ্ঞানীর জ্ঞান, প্রবৃত্তির আবেগকে প্রতিরোধ করিতে পারে, বাস্তবিক যাহা উপযোগী তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, এবং আনন্দের ধ্রুবপথ অনুসরণ করিতে পারে, সেই উচ্চতর জ্ঞানই ধর্ম্ম। ভ্রান্তচিত্ত ও চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া যখন বিপদসঙ্কুল ক্ষণস্থায়ী সুখের নিকট আমরা আনন্দকে বলিদান দিই তখনই তাহা অধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ধর্ম্ম অধর্ম্মের পরিণামই পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার। বিবেকের পথ দিয়া যদি আমরা সুখকে অন্বেষণ না করি, তাহা হইলে তাহার দণ্ডস্বরূপ আমরা সুখ হইতে বঞ্চিত হই। সাধারণের মতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বার্থনীতি সেই সকল কর্ত্তব্যের একটিকেও ধ্বংস করিতে চাহে না; প্রত্যুত স্বার্থনীতি বলে যে, ঐ সমস্ত আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থেরই অনুকূল, এবং সেই জন্যই উহা আমাদের কর্ত্তব্য। লোকের উপকার করা, নিজেরই হিতসাধন করিবার ধ্রুব উপায়; এইরূপেই আমরা লোকের সমাদর, লোকের দয়া, লোকের সাহানুভূতি অর্জ্জন করি। ইহা যেমন মনোরম, তেমনি উপযোগী। নিঃস্বার্থভাবেরও একটা গূঢ় অর্থ আছে।

সাধারণত লোকে এই শব্দটির যেরূপ অর্থ করে অর্থাৎ প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন—অবশ্য সে অর্থে নিঃস্বার্থপরতা নিতান্তই একটা অসঙ্গত অমূলক কথা; তবে কি না, ভবিষ্যৎ

স্বার্থের জন্য বর্ত্তমান স্বার্থকে—উচ্চতর সূক্ষ্মতর সুখের জন্য, স্থূলতর হীনতর সুখকে বিসর্জ্জন করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে আমরা বুঝিতেই পারি না যে আমরা সুখের অন্বেষণ করিতেছি এবং এইরূপ বুঝিবার দোষেই আমরা নিঃস্বার্থপরতারূপ এমন একটা আকাশকুসুমকে আমাদের মনোমধ্যে সৃষ্টি করি যাহা মানব প্রকৃতির অতীত ও একেবারেই দুর্ব্বোধ্য !

আমরা উপরে যে স্বার্থনীতির ব্যাখ্যা করিলাম, ভরসা করি তাহা অতিরঞ্জিত হয় নাই। আমরা বরং আর একটু বেশী দূর অগ্রসর হইব। আমরা স্বীকার করি যে, এই নীতি অন্য নীতিতন্ত্রের আতিশয্য-প্রসূত একটা প্রতিক্রিয়া। একবার সেই অত্যন্ত কঠোর ষ্টোয়িক নীতির কথা কিংবা সেই তাপস-নীতির কথা ভাবিয়া দেখ—যে নীতি চৈতন্যকে নিয়মিত না করিয়া চৈতন্যকে একেবারেই ধ্বংস করিতে বলে এবং রিপুর আবেগ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য, সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই বিসর্জ্জন করিতে বলে—একপ্রকার আত্মহত্যা করিতে বলে। এই দুই নীতির প্রতিবাদস্বরূপ এই স্বার্থনীতির বৈধতা কতকটা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এপিক্টেটাসের উচ্চতর দাসত্বের জন্য —দুঃখ দুর্দ্দশা অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিবার জন্য —মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। অথবা মঠ-নিবাসী দেবপ্রকৃতি প্যাস্কাল ও তাঁহার ভগিনী যেরূপ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুকে আহ্বান করিতেন এবং কঠোর তপশ্চারণ ও মূক আরাধনার দ্বারা মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনিতেন, তাহাও যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের প্রবৃত্তি-সকল অকারণে হয় নাই, তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। বায়ুর অভাবে, তরী চলিতে পারে না এবং শীঘ্রই রসাতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এমন কোন ব্যক্তিকে কল্পনা কর যাহার আত্মপ্রীতি নাই, যাহার আত্মসংরক্ষণের স্বাভাবিক সংস্কার নাই, যাহার কষ্টের ভয় নাই, বিশেষতঃ যাহার মৃত্যুভয় নাই, সুখ কিংবা আনন্দ-রসাস্বাদনের যাহার রুচি নাই, এক কথায়, ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থ হইতে যে বঞ্চিত,—এরূপ ব্যক্তি, তাহার চারিদিকে যে সকল অসংখ্য ধ্বংসের কারণ রহিয়াছে—তাহার সহিত দীর্ঘকাল যুঝাযুঝি করিতে পারে না।—তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে না ; সে ব্যক্তি একদিনও পৃথিবীতে টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায়, কোন একটি পরিবার, কিংবা কোন একটি ক্ষুদ্র সমাজ সংগঠিত কিংবা সংরক্ষিত হইতে পারে না। যিনি মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই মানুষকে শুধু ধর্ম্মের হাতে, দয়ার হাতে, মহত্ত্বের হাতে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি মানবজাতির বিকাশ ও স্থায়িত্বকে অপেক্ষাকৃত একটা সামান্য অথচ ধ্রুব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মনুষ্যকে আত্মপ্রীতি দিয়াছেন, আত্মরক্ষণের প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সুখ ও আনন্দ-রসাস্বাদনের রুচি দিয়াছেন, জ্বলন্ত প্রবৃত্তিসমূহ দিয়াছেন, আশা ও ভয় দিয়াছেন, প্রেম দিয়াছেন, উচ্চাভিলাষ দিয়াছেন, অবশেষে সেই ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি দিয়াছেন যাহা সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক, যাহা স্থায়ী, যাহা বিশ্বজনীন, যাহা, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জন্য নিয়তই আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

অতএব, স্বার্থনীতির মধ্যে যে মূলতত্ত্বটুকু আছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা

প্রতিবাদ করি না; এই মূলতত্ত্বটি খুবই সত্য, উহার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। আমরা শুধু এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি:— স্বীকার করি, স্বার্থনীতির অন্তর্নিহিত মূল-তত্ত্বটি আসলে সত্য, কিন্তু উহা ছাড়া আর কি কোন মূলতত্ত্ব নাই যাহা উহারই মত সত্য, উহারই মত বৈধ? সত্যবটে মানুষ প্রেমের অন্বেষণ করে, সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু মানুষের অন্তরে কি আর কোন অভাববোধ নাই—আর কোন হৃদয়ভাব নাই যাহা উহাদেরই মত প্রবল, উহাদেরই মত জ্বলন্ত?

আমাদের দেহ ও আত্মা যেমন একত্রই অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ এই মানব-জাতির মধ্যে, বিশ্ববিধাতার এই গভীর রহস্যময় সৃষ্টিকল্পনার মধ্যে, এমন কতকগুলি বিভিন্ন মূলতত্ত্ব একত্র অবস্থিত—যাহারা পরস্পরকে কখনই বহিষ্কৃত করে না।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র অবিরত প্রত্যক্ষ অনুভবেরই দোহাই দিয়া থাকে। প্রত্যক্ষকে আমরাও সাক্ষী মানিয়া থাকি; আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে যে সকল তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা হইতেই গৃহীত—সেইগুলি সহজ জ্ঞানের গোড়ার ধারণা। যে সকল তথ্যের উপর স্বার্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল তথ্য আমরা স্বীকার করি, কিন্তু স্বার্থনীতির পদ্ধতিটা আমরা স্বীকার করি না। যথাপরিমাণে দেখিলে তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ঐ নীতিপদ্ধতি, ঐ তথ্যগুলির প্রভাব-পরিসর অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাই উহা মিথ্যা; উহাদেরই মত অবিসম্বাদিত আরও যে অন্যান্য তথ্য আছে তাহা ঐ নীতিতন্ত্র অস্বীকার করে বলিয়াই উহাকে আমরা মিথ্যা বলি।

প্রকৃত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা এবং তাহাদের মধ্যে যদি কোন বাস্তবিক পার্থক্য থাকে তাহা স্বীকার করা—ইহাই প্রকৃতিস্থ দর্শনশাস্ত্রের গোড়ার নিয়ম। এই দর্শন-শাস্ত্র, সর্ব্বাগ্রে সত্যের অনুসরণ করে—ঐক্যের অনুসরণ করে না। সত্যকে অনুসরণ করা দূরে থাক্, স্বার্থনীতি সত্যকে অঙ্গহীন করিয়া ফেলে; উহা তথ্যসমূহের মধ্য হইতে সেই সকল তথ্যকেই নির্ব্বাচন করে যাহা স্বার্থনীতির উপযোগী, এবং যে সকল তথ্য আসলে ধর্ম্মনীতির মূল-উপাদান, ঠিক সেই সব তথ্যকেই উহা অগ্রাহ্য করে। এই একদেশদর্শী পর-মত-অসহিষ্ণু নীতি,—যাহা-কিছুর হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারে না, ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাহারই অস্তিত্ব অস্বীকার করে। কলারচনার হিসাবে দেখিলে এই নীতিতন্ত্রের মধ্যে বেশ একটি বাঁধুনি আছে, কিন্তু মানবপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির বিচিত্র শক্তির সহিত যখন ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখনই ইহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

আমরা দেখাইব, ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র-প্রসূত এই স্বার্থনীতি, মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রথমত আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি,—প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার শক্তিকে, কর্তৃত্ব-শক্তিকে সমস্ত মানবজাতিই স্বীকার করে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই সকলে চাহে, এই স্বাধীনতা লোকসমাজেও সম্মানিত ও সংরক্ষিত হয়। স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে একটা জিনিস আছে ইহা প্রত্যেকেরই অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দেয়। নৈতিক অনুমোদন অননুমোদনের মধ্যে, সম্মাদর অবজ্ঞার মধ্যে, প্রশংসা ধিক্কারের মধ্যে, পাপ পুণ্যের মধ্যে, দণ্ড পুরস্কারের

মধ্যে—সর্ব্বপ্রকার নৈতিক ব্যাপরের মধ্যে এই স্বাধীনতার ভাব জড়িত রহিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এই যে বিশ্বজনীন তথ্য যাহা মানবজাতির সমস্ত বিশ্বাসের মূলে অবস্থিত—যাহা, কি গার্হস্থ্য কি সমাজিক—মানবের সমস্ত জীবনকে পরিশাসিত করে, এই তথ্যটিসম্বন্ধে ঐন্দ্রিয়িক দর্শন শাস্ত্র ও স্বার্থনীতি কি বলেন?

(ক্রমশঃ)

কেরোসিন্ তৈল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের পরিবারে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়, তখনকার একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। আমাদের একটি অতি বৃদ্ধা ধাত্রী ছিল। প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারসম্বন্ধে খট্‌কা উপস্থিত হইলেই আমরা সেই বৃদ্ধার শরণাপন্ন হইতাম। ব্যাখ্যানপ্রদানে সে সিদ্ধবিদ্যা লাভ করিয়াছিল। মেঘের চলাচল, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎস্ফুরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত-প্রেত-ব্রহ্মদৈত্যের আবির্ভাব প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের ব্যাখ্যান তাহার জিহ্বাগ্রে থাকিত। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাহার শরণাগত হইয়া, আমরা কখনই নিরাশ হই নাই। বৃদ্ধা কেরোসিন তৈল কোনক্রমে স্পর্শ করিত না, এবং আমাদিগকেও স্পর্শ করিতে দিত না। একদিন এই বিতৃষ্ণার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। ধাত্রীর ব্যাখ্যানে জানিয়াছিলাম, দেশের সমস্ত মৃত জন্তুর গলিত দেহ কলের ঘানিতে ফেলিয়া সাহেবেরা যে তৈল বাহির করে, তাহাই কেরোসিনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

কেরোসিন তৈলের প্রস্তুত প্রণালীর পূর্ব্বোক্ত বিবরণটি বহুদিন ধরিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এখন আর সে বিশ্বাস নাই। সুদূর পল্লীবাসীও এখন ঐ প্রকার একটা অদ্ভুত প্রস্তুত প্রণালীতে বিশ্বাসস্থাপন করিবে না; কিন্তু কেরোসিনের উৎপত্তিতত্ত্ব জানিবার জন্য বিজ্ঞানগ্রন্থ খুলিলে আমাদের সেই বৃদ্ধা ধাত্রীর কথার সহিত বৈজ্ঞানিকের উক্তির মূলে মিল দেখা যায়। কলের ঘানিতে মৃতদেহ পেষণ করিয়া সাহেবেরা তৈল বাহির করেন না, প্রকৃতিই ভূপ্রোথিত জীবদেহের উপর চাপ দিয়া কোন প্রকারে তৈল উৎপন্ন করিয়া থাকেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের উক্তির ইহাই সারমর্ম্ম।

কেরোসিন তৈল যে একটা জৈব পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সকলেই ইহাতে একমত হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর যে সকল অংশে অতি প্রাচীন কয়লার খনি আছে, কেরোসিন তৈলও সেই সকল স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়; সুতরাং কয়লা যে প্রকার ভূপ্রোথিত উদ্ভিদের দেহ হইতে উৎপন্ন হয়, কেরোসিনও সেইপ্রকার যুগ-যুগান্তরের মাটিচাপা বৃক্ষাদি হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। উদ্ভিদ্ শরীরে কেরোসিনের ন্যায় পদার্থের অভাব নাই। টার্পিন তৈল ও ধুনা প্রভৃতি দাহ্য বস্তু উদ্ভিদ্ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই বৃক্ষাদির যে সকল অংশ হইতে টার্পিন্ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, তাহাই বহুকাল প্রোথিত থাকিয়া ভূগর্ভের চাপ ও তাপে যে শেষে কেরোসিন হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বৈজ্ঞানিকের নিকট হীরক ও কয়লা একই জিনিস। বিশ্লেষণে এক অঙ্গার ব্যতীত অপর কোন জিনিসই হীরকে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কয়লাই বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপে ও উপরের মৃত্তিকার চাপে তাহার মলিনতা ঘুচিয়া যায়। ধরা-কুক্ষির বৃহৎ কর্ম্মশালায় কি প্রকারে কেবল চাপ ও তাপের সাহায্যে তুচ্ছ কৃষ্ণ অঙ্গার অত্যুজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরকে পরিণত হয়, তাহা জানা ছিল না। অল্পদিন হইল একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক কয়লাকে ভূগর্ভের অবস্থায় ফেলিয়া, তাহাকে

হারকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বৃক্ষ নির্য্যাসকে ঐ প্রক্রিয়ায় কেরোসিনে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কেবল কয়লার খনির নিকটেই যে কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়, এখন আর একথা বলা চলে না। অনেক অঙ্গার-বর্জ্জিত স্থানেও আজকাল কেরোসিনের খনি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এইসকল স্থানের কেরোসিন উদ্ভিদ-দেহজ নয়। প্রাণীর দেহ বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, দেহের তৈলময় উপাদানগুলি নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া শেষে কেরোসিন হইয়া দাঁড়ায়। এইসকল কেরোসিন্ খনির চারিদিকের ভূমি খনন করিলে, সত্যই অনেক জীবকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রাণীর বসা ইত্যাদি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কেরোসিনের আকার প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতেও অবিশ্বাস করা যায় না।

আজ চল্লিশ বৎসর হইল,কেরোসিনের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিলে মনে হইতে পারে, ভূগর্ভে যে এপ্রকার একটা তৈল সঞ্চিত আছে প্রাচীনেরা বুঝি তাহার কোন সন্ধান রাখিতেন না; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। প্রাচীনেরা ইহার খুবই সন্ধান রাখিতেন, এবং আবশ্যক মত ব্যবহারও করিতেন। নিনেভা ও বাবিলনের নগর-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষগুলি পরীক্ষা করিলে, তাহার চূণ সুরকির সহিত একপ্রকার অপরিচ্ছন্ন কেরোসিন মিশ্রিত দেখা যায়। এই জিনিসটাকে গৃহনির্ম্মাণের অপর উপাদানগুলির সহিত ব্যবহার করিলে যে গাঁথুনি দৃঢ় হয়, এবং জলে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না, চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোকেরাও তাহা জানিতেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কেরোসিন তৈলের আকরের অল্পাধিক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ও কানাডা-প্রদেশে ইহার খুব বড় বড় আকর আছে। তা'ছাড়া রুসিয়া ও আমাদের ব্রহ্মদেশেও কেরোসিন পাওয়া যাইতেছে। মাটি খুঁড়িলে কয়লা প্রভৃতি আকরিক জিনিসকে যে প্রকার স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখা যায়, কেরোসিনকে সেপ্রকার বিশেষ স্তরে পাওয়া যায় না। যদি মাটিতে কেরোসিন্ থাকে, তবে ভূগর্ভের স্থানে স্থানে যে সকল ফাটাল দেখা যায়, পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা হইতে তাহাতেই তৈল আপনা হইতে সঞ্চিত হয়। উপর হইতে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া সেই সকল ফাটাল বাহির করিলেই জল ও বাষ্পমিশ্রিত তৈল ফোয়ারার মত ছুটিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে খনির ভিতরকার আবদ্ধ বায়ু-বায়ু ও জলীয় অংশ বাহির হইয়া গেলে, খাঁটি তৈল গহ্বরে পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীগণ পম্প লাগাইয়া তৈল সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

আকর হইতে যে সকল তৈল সদ্য উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত আমাদের পরিচিত কেরোসিন তৈলের কোনই সাদৃশ্য থাকে না। তৈল প্রস্তুতকারীগণ নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই অবিশুদ্ধ তৈলকে নির্ম্মল করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া থাকেন। একশত ভাগ আকরিক তৈল লইয়া কেরোসিন্ প্রস্তুত করিতে গেলে, কেবল পঞ্চান্ন ভাগ মাত্র খাঁটি নির্ম্মল তৈল পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ভাগ হইতে গ্যাসোলিন্, ন্যাপ্থা প্যারাফিন্ ও কলে দিবার তৈল প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস প্রস্তুত হয়। স্থূল কথায়, আকরিক তৈলের অতি অল্প অংশ অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অবিশুদ্ধ আকরিক তৈলের শোধন-পদ্ধতি অতি সহজ। গুড়ের ন্যায় ঘন তৈলকে কতকগুলি আবদ্ধমুখ কটাহে রাখিয়া ফুটানো হয়। কটাহের আবরণের সহিত লোহের বড় বড় নল সংযুক্ত থাকে। তৈল ফুটিতে আরম্ভ করিলে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা ঐসকল নল দ্বারা আর এক শীতল পাত্রে পৌঁছিয়া তথায় জমিতে আরম্ভ করে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম কালে যে জিনিসটা শীতল পাত্রে জমা হয়, তাহা দ্বারা বিশেষ কোন কাজ পাওয়া যায় না।

তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রথায় চোয়াইলে গ্যাসোলিন্, বেন্‌জিন্ এবং ন্যাপ্‌থা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি পাওয়া যায়। কটাহের তৈল ফুটিতে আরম্ভ করিয়া মাঝামাঝি সময়ে যে সকল বাষ্প ছাড়িতে আরম্ভ করে, তাহাই আমাদের পরিচিত কেরোসিনের বাষ্প। ইহা সেই সুদীর্ঘ নল বহিয়া শীতল পাত্রে আসিয়া তরল হইলেই কেরোসিন প্রস্তুত হয়।

এই প্রকারে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদের পরিচিত কেরোসিনের খুব সাদৃশ্য থাকিলেও জিনিসটাকে ঠিক্ বাজারের ভাল কেরোসিনের মত নির্ম্মল দেখায় না। ইহার সহিত শতকরা দুই ভাগ সল্‌ফিউরিক এসিড মিশাইলে ময়লা কাটিয়া নীচে থিতাইতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈল বেশ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধহীন হইয়া দাঁড়ায়। অতি উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহার পর তৈলে এমোনিয়া বা কষ্টিক্ সোডা মিশানো হইয়া থাকে। ইহাতে তৈলে অণুমাত্র মলিনতা থাকে না, এবং দুর্গন্ধও প্রায় লোপ পাইয়া যায়।

অপরিচ্ছন্ন আকরিক তৈল কটাহে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, সর্ব্বপ্রথমে যে ন্যাপ্‌থা প্রভৃতির বাষ্প বহির্গত হইয়া জমা হয়, তাহা তৈলরূপে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী; কিন্তু জিনিসটার প্রস্তুত ব্যয় অতি অল্প বলিয়া, অনেক ব্যবসায়ী অন্যায় লাভের আশায় ভাল কেরোসিনের সহিত এই জিনিসটাকে প্রায় মিশাইয়া থাকে। ল্যাম্প ফাটিয়া গিয়া যে সকল দুর্ঘটনা ঘটায়, তাহার মূল কারণ ঐ ন্যাপ্‌থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সকল তৈল একশত তেত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপে প্রজ্বলিত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই উৎকৃষ্ট তৈল বলা হইয়া থাকে; কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, তাহারই সহিত শতকরা একভাগ ন্যাপ্‌থা মিশাইলে, মিশ্র তৈল একশত তিন ডিগ্রি উত্তাপেই জ্বলিয়া উঠে। সৎ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কেরোসিন্ না কিনিলে, কখন কখন তৈলে শতকরা পাঁচভাগ পর্য্যন্ত ন্যাপ্‌থা পাওয়া গিয়া থাকে। এই তৈল ৮৩ ডিগ্রি উত্তাপ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে; সুতরাং এ প্রকার নিকৃষ্ট জিনিস ব্যবহারে বিপদের সংঘটন মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কেবল দুর্ঘটনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই যে উৎকৃষ্ট তৈলের ব্যবহার আবশ্যক, তাহা নয়। অল্প খরচে অধিক আলোক পাইতে হইলেও উৎকৃষ্ট তৈল ব্যবহার করা আবশ্যক। অনেক সময়ে বাজারের তৈল ভাল ল্যাম্পে ব্যবহার করিতে গিয়া দেখা যায়, শিখা ধূমময় হইয়া পড়িতেছে। ইহাও তৈলমিশ্রিত ন্যাপ্‌থারই একটা লক্ষণ। এ প্রকার তৈল অল্প মূল্যে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু জিনিসটা এত অপরিচ্ছন্ন আলোক দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায় যে, ইহার ব্যবহারে গৃহস্থমাত্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তা' ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় রহিয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভাল তৈল পুড়াইয়া যে পরিমাণ আলোক পাওয়া যায়, মধ্যম শ্রেণীর তৈলে তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ মাত্র আলোক পাওয়া গিয়া থাকে।

কেরোসিন্ তৈল আজকাল আমেরিকায় একটা প্রধান পণ্যদ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর নানা স্থানের কেরোসিনের বড় বড় আকরগুলি ১৮৬০ সাল পর্য্যন্তও অনাদৃত ব্যবস্থায় পড়িয়াছিল। দেশের অতি প্রাচীন জঙ্গলের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলিই ইন্ধন জোগাইত। এখন আর সে জঙ্গল নাই। প্রায় সকল অরণ্যভূমিই কৃষিক্ষেত্র বা গ্রাম-নগরে পরিণত হইয়াছে। কাজেই বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার খাদ্য জোগাইবার জন্য আমাদিগকে রত্নগর্ভা ধরা-দেবীরই শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। মনে হয়, ভবিষ্যৎ সন্তানদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যেন বসুন্ধরা যুগযুগান্তর ধরিয়া এই সকল অমূল্য দ্রব্য বহন করিয়া আসিতেছেন।

অতি প্রাচীনকালে যে অবস্থায় পড়িয়া বৃক্ষাদি ভূপ্রোথিত হইয়াছিল, পৃথিবীর এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন বৃক্ষাদি

আর ভূপ্রোথিত হইতে পারিতেছে না; সুতরাং নূতন করিয়া কয়লা বা কেরোসিন্ তৈলেরও উৎপত্তি হইতেছে না, অথচ পূর্ব্বসঞ্চিত কয়লা ইত্যাদির ব্যয় ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি বা আর একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কয়লা ও কেরোসিনের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যায়; কিন্তু আমরা ইহাতে কোন আশঙ্কারই কারণ দেখি না। মানবজাতি বিধাতার নানা আশীর্ব্বাদে ভূষিত হইয়া প্রাণীরাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সৃষ্টিরক্ষার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এখনই তাহার অধিকারভুক্ত বলা যায় না। বৃহৎ অরণ্যগুলির ধ্বংসের পর মানব যখন ইন্ধনের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিধাতারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে ভূগর্ভে নূতন ইন্ধনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই ভাণ্ডার শূন্য হইলে, সেই বিধাতারই অকথিত বাণী ইন্ধন-সংগ্রহের নব নব সহজ উপায় বলিয়া দিবে।

ধর্ম্ম ও একতা।

আজ আমরা যে একত্র সমবেত হইয়াছি ইহা কাহার জন্য, কাহার উদ্দেশে?—তোমাকে সকলে মিলিয়া একত্রে আহ্বান করিতে পারিব বলিয়া, তোমার আলোকে আমাদের চক্ষুর অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিব বলিয়া। তোমার আলোকের সাহায্যে আমাদের মনের সকল জঞ্জাল দূর হইয়া যাইবে। আমরা যে অন্ধ—আমরা কি করিয়া তোমার সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিব ও তোমার মর্য্যাদা বুঝিব, কি করিয়া তোমার মহিমা প্রচার করিব?—তুমি পথপ্রদর্শক না হইলে আমরা কোথায় যাইতে পারি? তুমি অন্ধের যষ্টি, তোমার উপর নির্ভর না করিয়া এক পদও আমরা অগ্রসর হইতে পারি না। তুমি আমাদের চক্ষুর মণি হইয়া আলোক বিতরণ কর, তবে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। যেমন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে শিশুর মন ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তাহার দিকে ছুটিয়া যায়, সেইরূপ তোমার আলোক হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য আমাদের মন তোমার প্রতি ধাবিত হয়। তোমার দেখা পাইলে আমাদের সকল বিষয়ে অভয় আসিবে, অন্ধকারের ভয় চলিয়া যাইবে, তখন আর নির্জীব ভাবে জীবন কাটাইতে হইবে না। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই প্রদীপ জ্বালাইয়া দাও, আমাদের মনকে ধৈর্য্য বিনয় সহিষ্ণুতা দয়া ও ক্ষমায় বিভূষিত করিয়া দাও, প্রত্যেকের হৃদয়কে সেই আলোকে জাগ্রত করিয়া নব উদ্যমে—নব উৎসাহে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত কর।

আমাদের এই দুর্দ্দিন দুরবস্থা হইয়াছে কেন? কেবল একমাত্র একতার অভাবে। সকল কার্য্যে একতা চাই। আমরা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে আসিয়াছি, আমাদের সেই কারণে এক উদ্দেশ্যে—এক লক্ষ্যে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত, তাহা হইলে যেন হিংসা স্বার্থপরতা সকল ঘুচিয়া গিয়া আমাদের কষ্ট নিবারণ হইবে। এই একত্র মিলন, একতান না বাঁধিলে, কখনও কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। সহস্র তারের সংঘর্ষে ও ঝঙ্কারে একটি সুর বাহির হইয়া একতানে সুরটি মিশিবে এবং সুরসমষ্টির ঝঙ্কারে এক বীণা বাজিবে, তবেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ং এর সঙ্গীত পৃথিবীতে ধ্বনিত হইবে।

> 'একমেবাদ্বিতীয়ং ঋষিবাক্য পুরাতন
> পুনঃ কর কীর্ত্তন এই আর্য্য দেশে'

আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সহস্র লোকে একপ্রাণে এক গান গাহিয়া উঠিব। সহস্র তারের যোগে যে ঝঙ্কার উঠিবে তাহা যেন একযোগে বাজিয়া উঠে। একতা বাঁধিতে গেলে সকলের মনের লক্ষ্য একদিকে হওয়া চাই। একমনে একপ্রাণে, একবাক্যে, এক উদ্যমে, এক উৎসাহে কার্য্য করিলে তবে প্রতি গৃহে, প্রতি পরিবারে, প্রতি দেশে, প্রতি রাজ্যে—পৃথিবীর সকল স্থানে মঙ্গল স্থাপিত হইবে। এইরূপে পারিবারিক জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সুখ শান্তি লাভ হইবে। ইহা তো সকলেই জানেন যে একটি সমগ্র লাঠির উপর যেমন ভর দিয়া দাঁড়ান যায়, কিন্তু তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলে তাহার উপর আর ভার চলে না, সেইরূপ আমরা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া থাকিলে, আমাদের মনের বিচ্ছিন্নতা দূর না হইলে, একদিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিলে, কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। এই মঙ্গলোদ্দেশে কাজ করিবার একটি উপায় অবলম্বন করা চাই। ধর্ম্মভিত্তি ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, সকল কার্য্য ধর্ম্মভাবে পরিপূরিত করিয়া, ধর্ম্মপাশ কোমরে বাঁধিয়া জগতে অগ্রসর হইতে হইবে। হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ রোপিত হইলে তাহা হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তাহা ধর্ম্মতেজে অসংখ্য সুফল প্রসব করিবে। আমরা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং এর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আলোক সকলে মিলিয়া লাভ করিব। এই আলোকময় ধর্ম্মসংযুক্ত একতা-বন্ধনে আমাদের হৃদয়ে প্রাণ আসিবে। ধর্ম্মই সকলের মূল। ধর্ম্মই চিরস্থায়ী, ধর্ম্ম ব্যতীত কিছুই স্থায়ী হয় না। ধর্ম্মই সকলের সম্বল। ধর্ম্মভিত্তির উপর যাহা করিবে তাহাই চিরস্থায়ী হইবে, তাহার মূল সুদৃঢ় হইয়া পরমেশ্বরের নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া চিরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। এই মূল মন্ত্র যিনি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া চলিয়াছেন, তিনি সকল কাজে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারেন এবং নির্ভীকচিত্তে থাকিতে

সক্ষম হয়েন ও সকল কর্ম্মে জয়লাভ করেন। কোন কার্য্য ধর্ম্মভিত্তির উপর গঠিত না হইলে তাহা সুরক্ষিত হয় না। যে গৃহে আমরা বাস করি, তৈয়ারি হইবার পূর্ব্বে তাহার ভালরূপ ভিত্তি করিয়া লইতে হইয়াছে। ভালরূপ গৃহের ভিত্তি না হইলে যেরূপ পদে পদে আশঙ্কিত হইতে হয়, সেইরূপ মনুষ্যের মনে ধর্ম্মভাব না থাকিলে, ধর্ম্মের দ্বারা গোড়া বন্ধন না হইলে, সমূলে সে বিনাশপ্রাপ্ত। ধর্ম্মই মানুষের সাথী, ধর্ম্মই পুণ্য-পথের সোপান। ধর্ম্মই পুণ্যের আকর। যে গৃহে ধর্ম্ম নাই তাহা শ্মশান সমান হইয়া পড়ে গার্হস্থ্য-জীবনে সুখ দুঃখ সবই আছে; তাহাতেই আমাদের পরীক্ষা; ধর্ম্ম জীবনে সংযুক্ত না হইলে সকলই অশান্তি। এই জন্য গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নরনারীর সমভাবে বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা চাই। নরনারীর উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মসোপানে না উঠিয়া প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। যিনি যত বিদ্বান হউন না কেন, ধর্ম্মসংযুক্ত না হইলে বিদ্যা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে না বা মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মভাবে আমাদের হৃদয় জাগ্রত হয়, আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, আলস্য ও ঔদাস্যভাব বিদূরিত হইয়া আমাদিগকে সতেজ করিয়া তোলে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চলেন, ভগবানকে ভক্তিভরে নিত্য পূজা করেন, পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য তাঁহার নিকট সহজে প্রতিভাত হয়। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের অসীম দয়া অসীম স্নেহ অনুভব করিয়া, তাঁহার হস্তে বিশ্বসংসারের এই প্রজাপুঞ্জ যে কি প্রকারে লালিত পালিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করেন, তিনিই তাঁহার মঙ্গলময় ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়েন। সেই বিশ্বপিতা—সেই আখিলমাতা ক্রোড়ে রাখিয়া স্নেহময় আলিঙ্গনে শিশুর মত এই বিশ্বসংসারকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার এই সকল মঙ্গলময় ভাব দেখিয়া আমাদের মোহ কি দূর হইবে না? আমাদের সুখের জন্য তিনি কি না প্রেরণ করিতেছেন? আমার অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রেরিত সকল বস্তু মনের তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়া যাই। ইহা সৎপুত্রের লক্ষণই নহে। পরমেশ্বর আমাদের পিতামাতার হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গলময় ভাব সকল প্রেরণ করিতেছেন, স্নেহ দয়া দিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে এতই আর্দ্র করিয়াছেন, যে কত শত পুত্র কত শত কঠিন দোষে লিপ্ত হইলেও তাঁহাদের ক্ষমার গুণে রক্ষা পাইতেছেন। পিতামাতার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া তাঁহাদের মনে কঠিন আঘাত দিলেও স্নেহশীল জনক জননী সন্তানদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করিতেছেন। প্রতিনিয়ত দেখিতেছেন যে কিসে সন্তানের মঙ্গল হয়, কি প্রকারে তাহারা সুশিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক পিতামাতাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া জানিবে। তাঁহারা যেমন সন্তানগণের ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদাই চিন্তা করেন ও সেই মত কার্য্য করেন, সেইরূপ সন্তানগণেরও কর্ত্তব্য যে পিতামাতার মনে কোনরূপ আঘাত না দিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখেন; তাঁহারা কোন কারণে ভর্ৎসনা করিলেও তাঁহাদের প্রতি রুক্ষভাবে বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের মনে কোনরূপ কষ্ট না দেন। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি কত কষ্ট সহ্য করিতে আরম্ভ করেন, কত যত্ন-পরিশ্রমে ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনে সন্তানদিগকে লালন পালন করেন। সেই সন্তান ভাল হইলে তাঁহারা কত না প্রসন্ন ও আনন্দিত হয়েন, নিজের শোক দুঃখ সকলি ভুলিয়া যান। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সন্তান পিতামাতার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে সক্ষম হয় না। ভগবানকে স্মরণ ও চিন্তা করিলে তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া পিতামাতার আদেশ উপদেশ পালন করা, যাহাতে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি হয়, সেইরূপ সাধন করা, পুত্রদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রত্যেক সন্তান সকল কর্ম্ম ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া চলিলে তাহারা পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া পৃথিবীতে সুখে দিনযাপন ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে।

ধর্ম্মভাব থাকিলে এই মনুষ্য সমাজে পরস্পরের উপর পরস্পরের ঘৃণা-দ্বেষ হিংসা-স্বার্থপরতা সকলই চলিয়া যায়। সকল মনুষ্য সত্যের অনুসরণে একের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। সকলেই সেই এক পথে একই লক্ষ্যে চলিতে থাকে। ধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষার ফলে মনুষ্যসমাজে পার্থক্যভাব দূর হইয়া যায়, কেহ কাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না। ধর্ম্মের মূলই ভগবানের উপর প্রগাঢ় ভক্তি। ভক্তি ও প্রেমের বলে আমারা সকল বাধা অতিক্রম করিতে পারি, সকল পরিশ্রম তুচ্ছ মনে করিতে সমর্থ হই। এই যে আমরা সকলে এখানে মিলিত হইয়াছি, ইহা ভগবানকে প্রসন্ন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিবার জন্য। আমাদের এত উৎসাহ এত যত্ন, সে কেবল তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবার জন্য। ধর্ম্মের সেই দিব্যালোকে আমরা পবিত্র ও সতেজ হইয়া উঠিব। তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান না করিলে আমাআমাদের শূন্য-হৃদয় কখনো পূর্ণ হইবে না। এই কোলাহল,—অশান্তির ভিতর কেবল তাঁহাকে পাইয়াই শান্তি লাভ করা যায়।

কোটি কোটি লোকের যিনি একমাত্র অধিপতি তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাই চল। মনের আবেগ প্রকাশ করিয়া বলি, তিনি সান্ত্বনা দিবেন। সকলই লোপ হবে, সকলই ধ্বংস হবে, কিন্তু ধর্ম্মের লোপ নাই—উহা চিরস্থায়ী। ধর্ম্মের সংস্পর্শে ব্যক্তিগত জীবন উন্নত হয়, ধর্ম্মমন্ত্রে জাতীয় জীবন গঠিত হয়। ধর্ম্মের কথা স্মরণ না করিলে আমরা আরও হীনতেজ হইব। যিনি অগণন প্রজা-পুঞ্জের সুখ-বিধানের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া আমরা কি করিতেছি? আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকের হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশও করে না। নিজের স্বার্থপরতা বশতঃ এমন হীন হইয়া পড়িয়াছি, পরনিন্দা পরচর্চ্চায় এমন ব্যাপৃত থাকি এবং বিলাসি-

তার মোহে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি, যে পরোপকারে কি করিয়া ব্রতী হইব। পরের দুঃখে কাতর হইয়া পরোপকারে ব্রতী না হইলে, আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? হে ভগবন্! আমাদের এমন শক্তি কি এমন বুদ্ধি নাই, যে তোমার মহিমা বুঝিয়া তাহা প্রচার করিব। তোমার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে আমরা হতবুদ্ধি হই। আমরা দুএকটি বাক্য প্রয়োগে তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া যে তোমাকে ধন্যবাদ দিব তাহাও যে হয় না—ভাষায় কুলায় না। আমার মত অজ্ঞ নারীর এই সজ্জন সমাগমে আসিবার সাহস কি প্রকারে হইল? এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যে নরনারীকে সমভাবে কার্য্য করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করা চাই। এই পরস্পরের সাহায্যের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ইহার জন্য নরনারীর সমভাবে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন। এই দুর্দ্দিনে আমোদের লহরী একবার ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যেকের দুঃখ ভাবিয়া কাজ কর আইস। তাহাতে আমাদের পরিশ্রম কত সহজ হইবে। আমরা ভগবানের কাছে কত সহায়তা পাইব। এমন চির সখা কোথায় আছে? আমরা যখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিব তখন আমাদের জীবন সার্থক হইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া ধন্য হইব। এস আমরা সেই বিদ্যালয় খুলি, যেখানে সেই একের বীণা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া বাজাইতে পারিব, একের সঙ্গীত সকলে মিলিয়া গাহিতে পারিব, সেই একের স্তুতি-পাঠ করিয়া—শত সহস্র নাম লইয়া সমস্বরে তাঁহার বন্দনা করিব।

দেখিতে দেখিতে সুখে দুঃখে হাঁসিয়া কাঁদিয়া নানাবিধ জঞ্জালের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আজ এই শুভ দিনে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছি, তাই আজ আমাদের মহোৎসব। আমাদের পূজা লও, পিতা! তুমি ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তুমিই আমাদের সৌহার্দ্যভাব জাগাইয়া তুলিয়াছ। আমরা একবার প্রাণ ভরিয়া ভক্তিভরে সকলে সমস্বরে তোমাকে ডাকিব! আমরা তোমার নামে সকলে যে এখানে সমবেত হইয়াছি, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের আজ কত আনন্দ। তোমাকে স্মরণ করিয়া আমরা মোহমুগ্ধময় জগতের কোলাহল যেন ভুলিয়া যাইতেছি, যেন কোন স্বর্গলোকে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর গত হইতেছে, আমাদের কি এমন করিয়াই মিথ্যা-জীবন অতিবাহিত হইবে? গত বৎসরের কি হিসাব দিলাম। তাঁহার নামে এই ধর্ম্মসভা সুশিক্ষা ও ধর্ম্মের প্রভাবে এমন উজ্জ্বলভাব ধারণ করুক, যে কাহাকেও ভগ্নোৎসাহে—ভগ্নহৃদয়ে যেন কখনো ফিরিয়া যাইতে না হয়। তাঁর জ্যোতি যেন সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়, তাঁর মহিমা যেন সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, তিনি জগৎ গুরু।

হে জগদীশ্বর! তুমি একবার আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হও, একবার আসিয়া আমাদের দেখা দাও; মনের ক্ষোভ দূর কর, একবার দেখা দিয়া অন্ধের আশা মিটাও। তুমি এই সভার প্রাণ। তুমি ইহাতে অবতীর্ণ হইয়া সকলের হৃদয় আকর্ষণ কর। তোমার আলোক বিতরণ করিয়া সকলকে সতেজ কর। তুমি আমাদের বিচ্ছিন্ন প্রাণকে এক কর।

বর্ষ-প্রবেশ।

বর্ষ এলো, বর্ষ গেল, নিয়তি তোমার,
সুমঙ্গল পাঞ্চজন্য বাজিল আবার
প্রকৃতির ঘরে ঘরে, নব অনুরাগে
ভরিয়া উঠিল বিশ্ব নবীন সোহাগে,
পত্র পুষ্প মহীরুহ মুখরিত সব
সৌন্দর্য্য পরশে লভি প্রাণ অভিনব,
জীবন শোভায় সুখ মন্দাকিনী ঝরে—
বরষের শোক তাপ নব আশা ধরে,
কি আশা হৃদয়ে লয়ে দাঁড়াইব আমি
কহি দেও বর্ষসনে ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী?
কোথা আশা, কোথা শান্তি, কোথায় আপনা
ভুলিবার শক্তি, পাব শোকের সান্ত্বনা?
এ শূন্য হিয়ার মাঝে বিশ্বাস আলোকে
আনিয়া দেখায়ে দেও সেই পুণ্যালোকে,
যেখানে দেহান্ত পরে পাইব তাহায়
তোমার কল্যাণময় রহস্য বিধায়।
সেই আশা সেই শান্তি সেই সে প্রত্যয়
দৃঢ় করি দেও মন, জীবনে সঞ্চয়
করিবারে পারি, যেন বিশ্বাস মহান
তোমাতে নির্ভর করি পাই নব প্রাণ,
কর্ম্মযোগে বাঁধি হিয়া বিশ্বের দুয়ারে—
দাঁড়াইয়া, তব কার্য্য সাধি অকাতরে,
নাহি ক্লান্তি নাহি শোক নাহি দুঃখ লেশ
আনন্দে আনন্দময়, জীবনের শেষ
এই ভরসায় নববর্ষের উৎসবে
আসিয়াছি আপনাকে বিলাইতে ভবে।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

নানা কথা।

নবদ্বীপ।—বিগত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের Calcutta University magazine নামক পত্রে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নবদ্বীপের সুবিখ্যাত চতুষ্পাঠীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণি কর্ত্তৃক উক্ত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়। খৃষ্টীয় ১১০৩ সালে নবদ্বীপে মহারাজা লক্ষণ সেন আসিয়া বাস করেন। ভাগীরথীর সহিত জলঙ্গীর সঙ্গমস্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে উক্ত রাজভবনের সামান্য ভগ্নাবশেষ এখনও পরিলক্ষিত হয়। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলিজির নিয়োজিত কাজির হস্তে নবদ্বীপের শাসন ভার অর্পিত হয়। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান প্রভুত্ব নবদ্বীপে অক্ষুন্ন ছিল। এই মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়েই নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য সুবিখ্যাত হইয়া উঠে। নবদ্বীপের প্রতিপত্তি জন্মিবার পূর্ব্বে বিক্রম-শিলায় বৌদ্ধগণের এবং

মিথিলার হিন্দু-ব্রাহ্মণগণের এই দুইটি সুবৃহৎ চতুষ্পাঠী ছিল। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলিজি বিক্রমশিলার চতুষ্পাঠীর ধ্বংস-সাধন করেন। মিথিলার চতুষ্পাঠীর গৌরব বজায় রাখিবার জন্য তথায় কেবল শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা ছিল। দর্শনশাস্ত্রের কোন পুঁথি বা অধ্যাপক প্রদত্ত শিক্ষার মর্ম্মার্থ ছাত্রমণ্ডলীর কেহই চতুষ্পাঠীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারিতেন না, বিদেশীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা যে এক বিষম বিড়ম্বনা তাহা বলা বাহুল্য। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা চতুষ্পাঠীতে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্বচিন্তামণি এবং কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন এবং তথায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া দেন। তাঁহার প্রতিভা শ্রবণে দেশদেশান্তর হইতে ছাত্রগণ সমবেত হইতে থাকে। কিন্তু তখনও নবদ্বীপের বিশেষ গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মিথিলাকে পরাভব করিতে পারে, এমন একজন অসাধারণ পাণ্ডিতের তখনও অভাব ছিল। বাসুদেবের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি ছাত্র-রূপে মিথিলায় গমন করেন। তথাকার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক গঙ্গাধর একদিন রঘুনাথের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া, রঘুনাথকে সর্ব্বসমক্ষে অবমাননা করেন। রঘুনাথ তাহাতে এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে রাত্রিকালে মিথিলার ঐ অধ্যাপকের প্রাণবিনাশ করিবার জন্য অসিহস্তে বহির্গত হন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মিথিলার ঐ অধ্যাপক পত্নীর সহিত গৃহছাদে শয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ তথায় গিয়া উপস্থিত। দম্পতির আলাপ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। রঘুনাথ লুক্কায়িত ভাবে অদূরে দাঁড়াইলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন চন্দ্রের সমান শোভনতম বস্তু জগতে কি আর কিছু আছে? স্বামী বলিলেন, চন্দ্রের মত বা তাহা অপেক্ষাও সুন্দর সামগ্রী আজ সন্দর্শন করিয়াছি। বঙ্গদেশ হইতে একজন যুবা দার্শনিক আসিয়াছেন। তিনি আজ আমাকে তর্কে পরাজয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা চন্দ্র অপেক্ষাও বিমলতর। রঘুনাথ যখন ইহা শুনিতে পাইলেন, তরবারি আপনা হইতে তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। তিনি আনন্দে ছুটিয়া গিয়া বিস্মিত ও ভয়বিহ্বল গঙ্গাধরের পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাধর অভয় দিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন, এবং পরদিন প্রভাতে সর্ব্বসমক্ষে রঘুনাথের নিকট তর্কযুদ্ধে নিজ পরাজয় স্বীকার করিলেন। সে আজ ১৫০৩ সালের কথা। ঐ সময় হইতেই নবদ্বীপের বিখ্যাত চতুষ্পাঠীর জন্মদিন পরিগণিত হইয়া থাকে। রঘুনাথ ১৫০৭ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দুই তিন বৎসর হইল আমরা নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী দেখিয়া আসিয়াছি। মান্দ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, পশ্চিমাঞ্চল, উড়িষ্যা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেকগুলি ছাত্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। অধ্যাপকের মধ্যে দেখিলাম একজন পঞ্জাবী। তিনি এক্ষণে বার্দ্ধক্য সীমায় প্রায় সমুপস্থিত। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন বাল্যে ছাত্র হইয়া এইখানে আসিয়াছিলাম; অধীতবিদ্য হইলাম; কিন্তু এখানকার মায়া ছাড়াইতে পারিলাম না। এইখানেই অধ্যাপনা করিতেছি। তিনি বলিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক চতুষ্পাঠী আছে। কিন্তু নবদ্বীপে আসিয়া দর্শনের শেষ শিক্ষা লাভ না করিলে পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভের অভাব রহিয়া যায়। তাই দর্শনশিক্ষার্থী সমগ্র ভারতের লক্ষ্য নবদ্বীপের দিকে। হিন্দী জানা থাকায় নবাগত বিদেশীয় ছাত্রগণের তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের বিশেষ সুবিধা আছে। পঞ্জাবী অধ্যাপকের বঙ্গপ্রীতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঋষি-কুমার তুল্য সমাগত ছাত্রবর্গের অমায়িক পরিচ্ছদে এবং অনেকের গৈরিক বসনে এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের সারল্য-পূর্ণমুখশ্রীতে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যের ভাব পূর্ণমাত্রায় বিকশিত দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই লজ্জা ও ক্ষোভের উদ্রেক হইল। বুঝিলাম, জনসাধারণ নবদ্বীপের এই উজ্জ্বলতম কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য সেরূপ মুক্তহস্ত নহেন। গবর্ণমেণ্টের সামান্য সাহায্যে চতুষ্পাঠীর ক্ষীণ প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

১৮২৯শকের আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

নাম	স্থান	মূল্য
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩৲
" " গোবিন্দলাল দাস	"	৬৲
" সৈয়দ নবাবআলি চৌধুরী	ধানবাড়ী	১৬॥০
" কুমার হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মল্লিক	"	৩৲
" " শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য	"	৩৲
" " বৃন্দাবন দাস	মেদিনীপুর	২৲
" " মুকুন্দানন্দ আচার্য্য	ডেরাডুন	১৬৮/
" " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	কুচবেহার	৫৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী	পুটিয়া	৩।৶০
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বড়াল	দিনাজপুর	৩৶০
" " নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	
" " বনমালী চন্দ্র	কলিকাতা	৩৲
" " রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	বেহালা	২৲
" " রাধাকান্ত আইচ	?	৫৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সজ্জনকান্দা	১০৲
শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	বালীগঞ্জ	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
" " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	"	৩৲
" সেখ মনহুরাল হক্	বনখালা	৩॥০
" বাবু জগচ্চন্দ্র নাগ	কৃষ্ণনগর	১০৲
" " গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	গড়ডা	৩৶০
" " নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	সিলেট্	৩৲
" " এস, কে, লাহিড়ী	কলিকাতা	৩৲
" " দিগম্বর দত্ত	ক্ষীরপাই	৪৲
" গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল	দিক্‌বাজার	৩৲
" " কালীদয়াল ঘোষ	ঢাকা	৩৲
" " গণেশপ্রসাদ লালা	দারভাঙ্গা	৩৶০
" " শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	আন্দুল	৩৲
" " ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী	ভবানীপুর	১॥০

শ্রীযুক্ত বাবু সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী	কুমিল্লা	২॥৶০
" " ক্ষীরনারায়ণ দাস সরকার	আলতাগ্রাম	৩।৶০
" " দ্বারকানাথ রায়	কলিকাতা	৩৲
" " দেবেন্দ্রনাথ রায়	"	২৲
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	হালিসহর	৬৸০
" " প্যারীমোহন রায়	কলিকাতা	৪৲
" " গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	"	৩৲
রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভুঞ্জ দেও বহাদুর	ময়ুরভঞ্জ	২০৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
" " ললিতমোহন রায়	"	৸০
" " হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য	কাউরেড	৫।৶০
" " মাধবচন্দ্র চন্দ্র	খিদিরপুর	৩৲
" " নীলমণি মান্না	বেহালা	
" " তুলসীদাস দত্ত	কালীঘাট	৩।৶০
" মৌলভি বিলাইৎ হোসেন	কলিকাতা	৩৲
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	রামপুরহাট	১৸৶০
" বাবু নরনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ	"	৩৲
" " কানাইলাল শেঠ	"	৩৲
" " মহেন্দ্রনাথ সেন	ধুবড়ী	৫৲
" রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
" " পঞ্চানন মিশ্র	দ্বারিকাপুর	২৲
" " কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া	শিলং	১০৲
		২২৬৸০

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্তিস্বীকার।

গত ১৬শে চৈত্র ১৮২৯ শক উপাসনান্তে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপস্থিত নিয়মিত উপাসকবর্গের নিকট হইতে পাওয়া যায়— ১০৸৶০

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৲
" " আশুতোষ চৌধুরী	১০৲
" " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
" " হরিহর মুখোপাধ্যায়	৫৲
" " হরিশ্চন্দ্র মিত্র	৪৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৫৲
" স্বর্ণকুমারী দেবী	২৲
" হিরন্ময়ী দেবী	২৲
" ইন্দিরা দেবী (আসানসোল)	১৲

শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
শ্রীমতী নলিনী দেবী	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ বিহারী ধর	২৲
" " নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৲
" " ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	১৲
" " চারুচন্দ্র মিত্র	১৲
" " ভগবতীচরণ মিত্র	১৲
" " প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী	১৲
" " জগবন্ধু রায়	১৲
" " মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" " রাখাল রঞ্জন রায়	১৲
" " ক্ষীরোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়	১৲
" " ঠাকুরদাস মল্লিক	১৲
" " গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	॥০
" " বিপিনবিহারী দে	॥০
" " যদুগোপাল ঘোষাল	।০
" " নরেন্দ্রকুমার মল্লিক	।০
" " বিহারীলাল রায়	৶৬
	৯১৸৶৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে বার বার পত্র লেখা সত্ত্বেও যাঁহারা বহুদিনের পত্রিকার বক্রী মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া এই জ্যৈষ্ঠ মাহার মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। অথবা কি প্রকার বন্দোবস্ত করিলে তাঁহাদের দেয় টাকা দিবার সুবিধা হয় তাহাও এই মাসের মধ্যে একখানি পোষ্টকার্ডে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠঃপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিবেন ইতি।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মার্কস্ অরিলিয়সের আত্ম-চিন্তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১। আমাদের স্মরণ করা উচিত, জীবন ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই উহার অল্প অংশ অবশিষ্ট থাকিতেছে; এবং সেই সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যদি মানুষের পরমায়ু এখনকার অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন সমান চালে চলিতে পারিত কি না, কাজ করিবার বুদ্ধি থাকিত কি না, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় চিন্তা করিবার শক্তি থাকিত কি না, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। কেন না, একথা সত্য, মানুষ জরাগ্রস্ত হইলেও তাহার প্রাণী-শরীরের ক্রিয়াগুলি চলিতে থাকে; সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, তাহার দেহ পুষ্ট হইতে পারে, তাহার কল্পনা থাকিতে পারে, তাহার প্রবৃত্তি বাসনাদি থাকিতে পারে; কিন্তু জীবনের সদ্ব্যবহার করা, পূর্ণমাত্রায় কর্ত্তব্যসাধন করা, বুদ্ধিবিবেচনার সহিত কাজ করা, বস্তু ও অবস্তু বিচার করিয়া দেখা,—এসমস্ত বিষয়ের পক্ষে সে মৃত বলিলেও হয়। অতএব আমাদিগকে খুব দ্রুত পদে চলিতে হইবে, সমস্ত কাজ যত শীঘ্র পারি গুছাইয়া লইতে হইবে; কেন না, মৃত্যু ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে; তাছাড়া, কখন কখন, আমাদের পূর্ব্বেই আমাদের বুদ্ধির মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়।

২। নৈসর্গিক বস্তুর যাহা কিছু নৈসর্গিকভাবে ঘটে তাহাই মনোহর ও আনন্দপ্রদ। ডুমুর যখন খুব পাকিয়া উঠে, তখন আপনা হইতেই তাহার মুখ খুলিয়া যায়; জলপাইগুলা যখন পাকিয়া ভূতলে পতিত হয় তখন তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখায়। ধান্য-শীষের বাঁকিয়া-পড়া, সিংহের ভ্রুকুটি, ভল্লুকের ফেন-ফুৎকার—এ সমস্ত যদি এক-এক করিয়া পৃথক্‌ভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে উহাদিগকে সুন্দরের বিপরীত বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহাদিগকে যদি বিশ্বপ্রকৃতির কার্য্য বলিয়া দেখা যায় তবে উহাই সুশোভন ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। এইরূপ মার্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিলে, ফুটন্ত যৌবনের ন্যায়, বার্দ্ধক্যের পরিপক্বতার মধ্যেও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা

যায়। অবশ্য, এ সৌন্দর্য্য সকলেই দেখিতে পায় না, যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সুর মিলাইয়া তন্ময় হইয়াছে তাহারাই এই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।

৩। যে হিপক্রিটিস্ কত রোগ সারাইয়াছেন, শেষে তিনি নিজেই পীড়িত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। যে চ্যাল্‌ডীয় জাতি অন্যের মৃত্যু গণনা করিত, অবশেষে তাহাদের নিজেরই সেই দশা উপস্থিত হইল। অ্যালেক্‌জাণ্ডার, পম্পে, জুলিয়াস সীজার, কত নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন, শেষে তাঁহারাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালানলে ভস্মীভূত হইবে বলিয়া যে হিরাক্লিটস কত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার জলজনিত উদরী রোগে মৃত্যু হইল। ডেমক্রিটস্‌কে পোকায় খাইল; আর একপ্রকার কীট সক্রেটিস্‌কে বিনাশ করিল। এই সকল দৃষ্টান্ত কিসের জন্য? দেখ; তোমরা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়াছ, বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছ; ইতস্ততঃ না করিয়া এইবার তবে জাহাজ হইতে নামিয়া পড়। যদি আর এক জগতের ডাঙ্গায় আসিয়া নামিয়া থাক,—তাহাতে ভয় নাই, সেখানে অনেক দেবতা আছেন, তাঁহারা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; আর যদি তুমি শূন্য নাস্তিত্বের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া থাক তাহাতেই বা কি? তাহা হইলে তুমি ত সুখ দুঃখের হাত হইতে একেবারেই নিষ্কৃতি পাইলে। তাহা হইলে দেহরূপ বহিরাচ্ছাদনের জন্য আর তোমাকে গাধার খাটুনি খাটিতে হইবে না। যে যে-পরিমাণে যোগ্য, তাহার বহিরাচ্ছাদনটি সেই পরিমাণে অযোগ্য; কেন না,একটি আত্মময়, জ্ঞানময়, দেবপ্রকৃতি;—আর একটি, ধূলা আবর্জ্জনা বই আর কিছুই নহে।

৪। অন্যের সহিত যেখানে তোমার স্বার্থ সমান সেই স্থল ছাড়া আর কোন স্থলেই অন্যের বিষয় লইয়া তোমার মনকে ব্যাপৃত রাখিবে না। পরচর্চ্চায় মন দিলে—অর্থাৎ অপরে কি কথা বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, কি ফন্দি করিতেছে, কি মৎলবে কি কাজ করিতেছে—এই সমস্ত বিষয় ভাবিতে গেলে, আপনাকে ভুলিয়া যাইতে হয়,—আপনার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব নিরর্থক কোন বিষয়ে আপনার মনকে ব্যাপৃত রাখিবে না, কিংবা তোমার চিন্তার প্রবাহের মধ্যে আর কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা আনিয়া ফেলিবে না। বিশেষতঃ এইরূপ অনুসন্ধানে অযথা কৌতূহল ও দ্বেষহিংসা বর্জ্জন করিবে। অতএব যাহার বিষয়ে তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মন খুলিয়া প্রকাশ করিতে পার না এমন সকল চিন্তা হইতে বিরত হইতে অভ্যাস করিবে। তুমি যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাতে অকাপট্য,সদ্ভাব, সাধারণের শুভচিন্তা ভিন্ন আর কিছুই যেন স্থান না পায়; তাহার মধ্যে যেন কোন প্রকার খেয়াল-কল্পনা, দ্বেষ, অসূয়া কিংবা অন্যায় সন্দেহের ভাব না থাকে। অর্থাৎ এমন কোন কথা বলিবে না যাহা বলিতে লজ্জা হয়। যিনি সাধনার দ্বারা এইরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তিনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের নিয়োজিত একপ্রকার আচার্য্য ও পুরোহিত; তাঁহার অন্তরে যে দেবতা অধিষ্ঠিত তিনি সেই দেবতার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সেই দেবতার সাহায্যেই তিনি সংরক্ষিত; সুখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে ভেদ করিতে পারে না, তিনি সুখের স্পর্শে অনাকৃষ্ট, দুঃখের বাণে দুর্ভেদ্য, তাঁহার

কেহই অনিষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুষ্ট লোকের দ্বেষ হিংসার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এইরূপে অন্তরের রিপুগণকে দমন করিবার জন্য তিনি নিয়তই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; এবং ন্যায়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার ভাগ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে তিনি তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণের প্রয়োজন ও হিতের জন্য আবশ্যক না হইলে, তিনি অন্যের বাক্য, চিন্তা ও কার্য্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। তিনি আপনার কাজ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, এবং বিধাতা তাঁহাকে যেরূপ অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পালন করেন। তিনি ভাবেন তাঁহার ভাগ্য যখন তাঁহার উপযোগী, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপযোগী। তিনি বিবেচনা করেন, জ্ঞানের মূলতত্ত্বটিই সকল মনুষ্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, এবং ভূতদয়া ও সমস্ত জগতের ইষ্টচিন্তা, মানব-প্রকৃতিরই একটি অংশ। যাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিল করিয়া জীবন যাপনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও প্রশংসার কোন মূল্য নাই। যাহারা নিজেকেই সুখী করিতে পারে না, তাহাদের প্রশংসা অপ্রশংসার আবার মূল্য কি?

৫। অনিচ্ছুক হইয়া, স্বার্থপর হইয়া, পরামর্শ না করিয়া, কিংবা মনের আকস্মিক আবেগে কোন কাজ করিবে না। অদ্ভুত ধরণধারণ কিংবা রসিকতা প্রকাশ করিবারও চেষ্টা করিবে না। যতটা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা বেশী কথা কহিবে না, অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। তোমার যে অন্তর্দেবতা তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সাবধান তুমি যেন তাঁহার বিশ্বাস না হারাও। তুমি যদি পুরুষ হও তো ঠিক পুরুষের মতন, যদি স্ত্রীলোক হও তো ঠিক্ স্ত্রীলোকের মতন. তোমার যে বয়সই হউক ঠিক্ সেই বয়সের মতন আচরণ করিবে। পূর্ব্ব হইতেই এমন ভাবে লোকের নিকট তোমার বিশ্বাস ও পসার বজায় রাখিবে যে, হিসাব নিকাশের ছাড় চাহিবার সময়ে যেন তোমার শপথ করিতে না হয়—খরচের স্বাক্ষর-নিদর্শন দেখাইতে না হয়। তোমার মুখ যেন সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকে। বাহ্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিবে না, কিংবা অপরের নিকট হইতে শান্তি যাচঞা করিবে না। এক কথায়—যষ্টির উপর ভর দিয়া থাকিবার জন্য আপনার পা দুটাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে না।

৬। সমস্ত মানব-জীবন-ক্ষেত্র খুঁজিয়া তুমি যদি এমন কিছু পাও যাহা ন্যায় ও সত্য হইতে, মিতাচার ও ধৈর্য্য হইতে, সদাচার-জনিত আত্মপ্রসাদ ও বিধাতার হস্তে আত্মসমর্পণ-জনিত চির-সন্তোষ হইতে অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে আমি বলি, তুমি তাহাকেই উত্তম মনে করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দিকে গমন কর। কিন্তু, যে দেবতা তোমার অন্তরে নিহিত, যিনি তোমার প্রকৃতি ও বাসনা-সমূহের প্রভু, যিনি তোমার মনের ভাব পরীক্ষা করিতেছেন এবং যিনি (সক্রেটিস এই কথা বলিতেন) আপনাকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি দেবতাদের শাসন মানিয়া চলেন, যিনি সমস্ত মানব জাতির শুভ কামনা করেন, সেই অন্তর্দেবতা অপেক্ষা মূল্যবান জিনিস যদি তোমার আর কিছুই না থাকে, যদি আর সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে আর কাহারও হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিও না। কেন না,

যদি আর কোন দিকে তুমি ঝুঁকিয়া পড়, তাহা হইলে, যাহা তোমার প্রকৃত মঙ্গল তৎপ্রতি তোমার অ-বিভক্ত মন প্রয়োগ করিতে পারিবে না; কেন না যাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও যাহা ভিন্ন জাতীয়—এরূপ কোন জিনিস্‌কে (যেমন, লোক-প্রশংসা, ধন ঐশ্বর্য্য সুখ ইত্যাদি) যুক্তি-সঙ্গত ও রাষ্ট্র-সঙ্গত প্রকৃত মঙ্গলের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই সকল জিনিস যদি একবার মনোরঞ্জন করিতে আরম্ভ করে তবে আর রক্ষা নাই, ক্রমে উহারা প্রবল হইয়া মানুষের সমস্ত মনকেই বিকৃত করিয়া ফেলে। অতএব তোমার সমস্ত মনের ঝোঁক্ যেন একদিকেই যায়, যাহা সর্ব্বোত্তম সেই দিকেই যেন তোমার মন ধাবিত হয়। যাহা হিতকর তাহাই সর্ব্বোত্তম। বুদ্ধি-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে যাহা হিতকর বিবেচনা করিবে তাহাই দৃঢ়হস্তে ধরিয়া থাকিবে, কিন্তু যদি উহা শুধু পাশব জীবনের পক্ষেই ইষ্টজনক হয়,—তখনই উহা ত্যাগ করিবে, এবং ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থির বুদ্ধির সহিত বিচার করিয়া দেখিবে। কিন্তু সাবধান, অনুসন্ধানে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়।

(ক্রমশঃ)

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ-ভঞ্জন।

গতবারে আপনাদিগকে উপনিষদ হইতে একটি আখ্যায়িকা বলিয়াছিলাম তাহাতে ব্রহ্মশক্তির ব্যাখ্যা ছিল; এবার ঐ ধরণের আর একটি আখ্যায়িকা বলিব তাহাতে প্রাণশক্তির মাহাত্ম্য দর্শিত হইয়াছে। প্রথম আখ্যায়িকার বিষয় দেবতাদিগের বিবাদ-ভঞ্জন; এই আখ্যায়িকাটি ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ-ভঞ্জন—এই নামে অভিহিত হইতে পারে।

একদা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের, পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল, ইহারা প্রত্যেকে আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ, এই বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। চক্ষু বলিতে লাগিল, আমি কম কিসে? আমিই সকলের প্রতিষ্ঠা, আমি না থাকিলে লোকেরা দিশাহারা হইয়া অপথে পদার্পণ করে।

চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা

কর্ণ বলিল, আমি সম্পদ, সকল সম্পদের কারণ আমিই। আমার প্রসাদে লোকে বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা কর্ম্মশীল হইয়া সম্পদবান্ হয়।

শ্রোত্রং বাব সম্পৎ

রসনা বলিল, আমি বসিষ্ঠ—ঐশ্বর্য্যবান্। বাগ্মিরাই স্বীয় বাগ্মিতাগুণে অন্যকে বশ করিয়া ঐশ্বর্য্যবান্ হয়।

বাগ্বাব বসিষ্ঠা।

মন বলিল, আমি আয়তন, সকলের আশ্রয় স্থান। আমার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ সুনিয়মে চলে নহিলে তাহারা বিভ্রান্ত ও নানাদিকে ধাবিত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়।

মনো বা আয়তনম্

প্রাণ বলিল, আমা হইতে তোমরা সকলই পাইয়াছ, আমিই শ্রেষ্ঠ।

অহং শ্রেয়ানস্মি অহং শ্রেয়ানস্মীতি।

এইরূপে চক্ষু কর্ণ বাক্য মন স্ব স্ব প্রাধান্য জ্ঞাপন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাহা জানিবার জন্য তাহারা প্রজাপতির নিকটে গিয়া বিচারপ্রার্থী হইল। প্রজাপতি বলিলেন,—

যস্মিন্নুৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।

তোমাদের মধ্যে যে না থাকিলে শরীর মৃতবৎ ঘৃণিষ্ট হইয়া উঠে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রজাপতির কথামত ইহারা একে একে দেহ হইতে নিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

সা হ বাগুচ্চক্রাম

প্রথম বাক্ দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। একবৎসরান্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—

'কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?'

তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত ছিলে ?

তাহারা উত্তর করিল—

যথা কলা অবদন্তঃ

যেমন মূকেরা জীবিত থাকে, কেবল কথা কহে না কিন্তু চক্ষে দেখে, কর্ণে শুনে, প্রাণে নিশ্বাস ফেলে, মনে মনন করে, আমরা সেইরূপে জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া রসনা দেহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। পরে,

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম

চক্ষু চলিয়া গেল। সম্বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?'

আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে জীবিত ছিলে ?

তাহারা উত্তর করিল—

যথা অন্ধা অপশ্যন্তঃ

যেমন অন্ধেরা জীবিত থাকে, কেবল চোখে দেখে না কিন্তু কানে শুনে, মুখে বাক্য উচ্চারণ করে, মনে ভাবে, প্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাস বহন করে, আমরা এইরূপে জীবিত ছিলাম। তখন চক্ষুও দেহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। পরে,

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম

শ্রোত্র গেল। সম্বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?

আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে ?

তাহারা উত্তর করিল—

যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ

যেমন বধিরেরা জীবিত থাকে, কেবল কাণে শুনে না কিন্তু চোখে দেখে, মুখে বাক্য বলে, প্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাস বহন করে, মনে মনন করে, আমরা এইরূপে জীবিত ছিলাম। শ্রোত্র দেহে পুনঃপ্রবেশ করিল।

তৎপরে মন চলিয়া গেল। সম্বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?

আমার অভাবে কিরূপে জীবিত ছিলে ?

উত্তর,

যথা বালা অমনস্কঃ

অপ্রৌঢ়মনা বালকেরা যেমন জীবিত থাকে, চোখে দেখে, কাণে শুনে, মুখে বলে, প্রাণে নিশ্বাস ফেলে, কেবল মনোবৃত্তি সকল অপরিস্ফুট থাকে, আমরাও সেইরূপে জীবিত ছিলাম। ইহা শুনিয়া মন দেহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে ইহারা জানিতে পারিল যে ইহাদের কাহারও অভাবে দেহ একেবারে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট বিকল হইয়া পড়ে নাই।

অনন্তর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। মহাতেজা সিন্ধু ঘোটক যেমন তাহার পাদ-বন্ধন-শঙ্কু উৎপাটন করত গমনোদ্যত হয় সেইরূপ অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণ আপনার সঙ্গে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল—তখন সকলে ত্রস্ত হইয়া একবাক্যে নিবেদন করিল, প্রভো আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না, তোমা বিনা আমরা মুহূর্তকাল জীবনধারণ করিতে পারি না। তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অথ হৈনং বাগুবাচ

ইহাঁকে বাক্য বলিল—

যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি।

আমি যদি ঐশ্বর্য্যবান্ হই, সে তোমারই ঐশ্বর্য্য।

অথ হৈনং চক্ষুরুবাচ

চক্ষু বলিল—

যদহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠাঽসীতি।

আমি যদি প্রতিষ্ঠাবান হই, সে তোমারই প্রতিষ্ঠা।

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ

শ্রোত্র বলিল—

যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীতি।

আমি যদি সম্পদবান্ হই সে সম্পদ তোমারই।

অথ হৈনং মন উবাচ।

মন বলিল—

যদহং আয়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি।

আমি যদি আশ্রয়স্থান হই, তুমিই সেই আশ্রয়।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্য ইহারা স্ব স্ব প্রধান নহে, প্রাণই ইহাদের আশ্রয়—ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রাণের শ্রেষ্ঠতা কিসে?

প্রাণ শ্রেষ্ঠ, কেন না প্রাণশক্তি হইতেই দেহের উৎপত্তি। এই প্রাণশক্তিই ক্রমে রস রক্তাদির পরিচালনা করত চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় স্থানগুলি গড়িয়া তোলে। এই স্থানগুলি নির্ম্মিত হইবার পর, সেই সকল স্থানের আশ্রয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি এই সাধারণ প্রাণশক্তির উপরেই নির্ভর করে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার সাধারণ আশ্রয়—প্রাণ। এই প্রাণ কোথা হইতে আসিল? সেই এক বিশ্বব্যাপী প্রাণ-শক্তিই ইহার উৎপত্তি স্থান। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ-এজতি নিঃসৃতং।

এই জগতে যাহা কিছু, বৃহৎ হইতে বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের মধ্যেই এই প্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছে। এই প্রাণশক্তি পরিণত হইয়া সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র তারা রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণশক্তি দ্বারা নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র বক্ষে প্রবেশ করিতেছে, সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে উৎফুল্ল হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, বসুন্ধরা ধন ধান্যে পূর্ণ হইতেছে, বৃক্ষ পল্লবিত হইতেছে, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আহার বিহার করত জীবন ধারণ করিতেছে। এই মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া মনুষ্য সকল দেহ রক্ষার বিবিধ উপায় চেষ্টা করিতেছে, নগর গ্রাম বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিতেছে, স্নেহ-প্রেম দয়াধর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

প্রাণ দেহের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সাঞ্চরিত হইয়া কেমন অলক্ষিত ভাবে তাহাদের হিতের জন্য কার্য্য করে। প্রাণের এই কার্য্য ত্যাগধর্ম্মের আদর্শ। প্রাণের শ্রেষ্ঠতা ত্যাগে। সে আপনার জন্য কিছুই রাখে না। সমুদয় দেহে সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আপনাকে বাটিয়া দিয়া সে আপনি অন্তরালে রহিয়াছে। এই প্রাণের যিনি প্রাণ—মহাপ্রাণ তিনিও সেইরূপ আপনি নির্লিপ্ত ভাবে আপনার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকল লোকের সকল জীবের

কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন। তিনি নিজে কিছুই চাহেন না, কিছুই ভোগ করেন না, কেবলই দান করিতেছেন, জীব ফল ভোগ করিতেছে, তিনি নিরশন থাকিয়া সকল দেখিতেছেন।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

পশু পক্ষী এই প্রাণ স্বরূপকে না জানিয়া কার্য্য করিতেছে—হে মানব! তুমিও কি মূঢ় জীবের ন্যায় তাঁহাকে না জানিয়া আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিবে? আত্মসুখে রত থাকিয়া তোমার প্রাণদাতা, তোমার আশ্রয় দাতাকে ভুলিয়া থাকিবে? তাহা হইলে দেখিবে তোমার 'মহতী বিনষ্টিঃ'। এই ঋষিবাক্য মনে রাখিবে

ন চেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ

হে মানব, তুমি তাঁহাকে জানিবার অধিকার পাইয়াছ সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইও না। তাঁহাকে জান, অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর, তিনি প্রাণের প্রাণ, অমৃতের সেতু—

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের

অনুবৃত্তি।

যে কোন প্রকার নীতিতন্ত্র হউক না, তাহাতে আচরণ সংক্রান্ত নিয়মের কথাই থাক্‌ বা কেবলমাত্র সাদাসিধা উপদেশের কথাই থাক্‌, প্রকারান্তরে সকল নীতিতন্ত্রই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। যখন স্বার্থের নীতি, উপযোগীর নিকট মনোজ্ঞকে বলিদান করিতে উপদেশ দেয়, তখন মনে হয় যেন একথাটাও মানিয়া লয় যে, তাহার সেই উপদেশ অনুসরণ করায় কিংবা না করায় মানুষের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে কোন একটা তথ্য স্বীকার করিলেই হয় না, সেই তথ্য স্বীকার করিবার অধিকার থাকাও চাই। দেখা যায়, স্বার্থনীতির পক্ষপাতী অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে; যে নীতিতন্ত্র, সমস্ত মানব চিত্তকে—মানবের সমস্ত প্রবৃত্তি ও ধারণাকে, কেবল ইন্দ্রিয়বোধ ও ইন্দ্রিয়বোধের ব্যাপার-সকল হইতে টানিয়া বাহির করে, স্বাধীনতাকে স্বীকার করা সে নীতিতন্ত্রের অধিকারায়ত্ত নহে।

কোন একটা মনোজ্ঞ ইন্দ্রিয়বোধ যখন আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে, এবং মুগ্ধ করিয়া তাহার পর চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন আমাদের চিত্ত একটা কষ্ট, একটা অভাব, একটা প্রয়োজন অনুভব করে: তখন চিত্ত বিচলিত হয়, চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই ব্যাকুলতা প্রথমে অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্টভাবে থাকে, একটু পরেই একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে; যে বিষয়কে পাইয়া আমরা সুখানুভব করিয়াছিলাম, এবং যাহার অভাবে এখন কষ্ট পাইতেছি, আমাদের ব্যাকুলতা সেই বিষয়ের প্রতি তখন ধাবিত হয়। তীব্রতার মাত্রা কিছু কমই হোক্‌, বেশীই হোক্‌—চিত্তের এই চাঞ্চল্যই বাসনা।

এই বাসনাতে স্বাধীনতার কি কোন লক্ষণ আছে? স্বাধীনতা কাহাকে বলে? যখন আমি জানি, আমি আমার কার্য্যের কর্ত্তা, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি, রহিত করিতে পারি, কিংবা সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত থাকিতে পারি, তখনই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অনুভব করি। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে

যখন সেই কার্য্য করিব বলিয়া সঙ্কল্প করি, তখন ইহাও বেশ জানি, আমরা ইহার বিপরীত সঙ্কল্প করিতেও সমর্থ; তখনই আমরা স্বাধীনতা অনুভব করি।

যখন আমার আত্ম-চৈতন্য অব্যর্থরূপে সাক্ষ্য দেয়,—আমিই এই কাজের কর্ত্তা, তখনই সেই কাজ স্বাধীন কাজ এবং তখনই সেই কাজের জন্য আপনাকে দায়ী বলিয়া অনুভব করি। আমাতে অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে, এবং এই সকল ক্রিয়া বহির্দর্শকের চক্ষে আমার স্বেচ্ছাকৃত কাজ বলিয়া ভুল হইতেও পারে; কিন্তু আমার কখনই ভুল হইতে পারে না;— সাক্ষী চৈতন্যের নিকট ভুল হওয়া অসম্ভব: যে কোন কাজই হউক না, কোন্ কাজটা স্বেচ্ছাকৃত এবং কোন্ কাজটা স্বেচ্ছাকৃত নহে, অমাদের সাক্ষীচৈতন্য তাহার পার্থক্য বেশ উপলব্ধি করিতে পারে।

যে চেষ্টা স্বেচ্ছাকৃত ও স্বাধীন তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। বাসনা ইহার ঠিক্ বিপরীত। বাসনা যখন চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করে তখনই উহা প্রবৃত্তি নামে অভিহিত হয়; আমাদের ভাষা ও আত্মচৈতন্য উভয়ই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রবৃত্তির অধীনে মানুষ অকর্ত্তা; প্রকৃতি যতই প্রবল হয়, উহার বেগ যতই দুর্দ্দমনীয় হয়, ততই আত্মার যে নিজস্ব কার্য্যশক্তি আছে—আত্মশাসনী শক্তি আছে—সেই আদর্শ হইতে মানুষ দূরে পড়িয়া যায়।

যে ইন্দ্রিয়বোধ বাসনার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বাসনাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করে, বাসনার ন্যায় সেই ইন্দ্রিয়বোধেরও বশে, আমরা পরাধীন। যদি কোন প্রীতিজনক বস্তু আমার সম্মুখে স্থাপিত হয়, আমার কি সুখবোধ হইবে না? যদি কোন কষ্টকর জিনিস আমার সম্মুখে আসে,—আমার কি কষ্ট হইবে না? ঐ সুখকর অনুভূতি অন্তর্হিত হইলেও, স্মৃতি ও কল্পনার পথে আবার উদয় হইলে, উহা পূর্ব্ববৎ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি আমার কষ্ট হইবে না? উহার অভাব ও প্রয়োজন কি আমি অনুভব করিব না? যে বস্তুকে পাইলেই আমার ব্যাকুলতার শান্তি হয়, আমার মনের কষ্ট দূর হয়, সেই বস্তুর প্রতি আমার বাসনা কি ধাবিত হইবে না?

বাসনার উদয়ে অন্তরের মধ্যে কিরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, একবার প্রণিধান করিয়া দেখ:—তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার চিন্তার অপেক্ষা না রাখিয়া, তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া, সেই বাসনা উঠিতেছে পড়িতেছে, বাড়িতেছে কমিতেছে। তোমার ইচ্ছায়, বাসনার উদয়ও হইতেছে না, নিবৃত্তিও হইতেছে না।

অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা বাসনার সহিত যুদ্ধ করে, এবং অনেক সময় যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহার বশীভূত হয়। যে সকল বহির্বিষয় হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, সেই বহির্বিষয়কে আমরা দোষ দিই না, এবং ঐ ইন্দ্রিয়বোধ হইতে যে বাসনা উৎপন্ন হয় সে বাসনাকেও দোষ দিই না, আমরা শুধু দোষ দিই সেই ইচ্ছাকে,—যার সম্মতিতে বাসনার উদয় হইয়াছে, এবং দোষ দিই সেই সকল কার্য্যকে যাহা বাসনা হইতে প্রসূত হইয়াছে; কেন না ঐ সকল কার্য্য আমাদের নিজ আয়ত্তের মধ্যে।

ইচ্ছা ও বাসনা এক নহে; অনেক সময় বাসনা, ইচ্ছাশক্তির বিলোপ করে, এবং মানুষের দ্বারা এমন সকল কাজ করাইয়া লয় যাহা মানুষ সে সমস্ত আপনার কাজ বলিয়া মনে করিতে পারে না, কারণ সে কাজ

তাহার স্বেচ্ছাকৃত নহে। এমন কি,আদালতে অনেক অপরাধের আসামী এই ওজরের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রচণ্ড বাসনা ও দুরতিক্রমণীয় প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাজ করিয়াছে, এই কাজে তাহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না—এই বলিয়া তাহারা নিজ দোষ ক্ষালন করিবার চেষ্টা করে।

যদি বাসনাই ইচ্ছার মূল ভিত্তি হইত, তাহা হইলে বাসনা যতই প্রবল হইত আমরা ততই স্বাধীন হইতাম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহার বিপরীতটাই সত্য। যে পরিমাণে বাসনার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে, মানুষের আত্মপ্রভুত্ব কমিয়া যায়, এবং যে পরিমাণে, বাসনা হীনবল হয় ও প্রবৃত্তি-অনল নির্ব্বাপিত হয়, সেই পরিমাণে, মানুষ আবার আপনার উপর প্রভুত্ব লাভ করে।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, বাসনার উপর আমাদের কোন প্রভাব নাই। কোন দুই বস্তু ভিন্ন হইতে পারে, তাই বলিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কাজে-কাজেই যে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না,এ কথা বলা যায় না। কতকগুলি পদার্থ আমাদের হইতে দূরে রাখিয়া, কিংবা সেই সকল পদার্থ আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে সেই সুখকে আমাদের চিন্তা হইতে দূরে রাখিয়া, আমরা কিয়ৎপরিমাণে, ঐ সকল পদার্থের ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াকে অপসারিত করিতে পারি, এবং ঐ সকল পদার্থ আমাদের মনে যে বাসনার উদ্রেক করে সেই বাসনাকে এড়াইতে পারি। আমরা, কতকগুলি পদার্থ আমাদের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিয়া, আমাদের অন্তরে কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ ও কতকগুলি বাসনার উদ্রেক করিতে পারি; তাই বলিয়া উহাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত বলা যায় না; আপনার উপর আপনি পাথর নিঃক্ষেপ করিয়া যে আঘাত-বোধ হয় সেই আঘাত-বোধটা যেমন স্বেচ্ছাকৃত নহে, ইহাও তেমনি। এই সকল বাসনার নিকট নতশির হইলে, উহাদের আরও বলবৃদ্ধি হয়, এবং উহাদিগকে প্রতিরোধ করিলে, উহাদের তেজ কমিয়া যায়। উপযুক্ত নিয়ম অবলম্বন করিলে আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও কতকটা আমাদের বশে আনিতে পারা যায়, এমন কি উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াতেও কতকটা রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়। ইহাতে করিয়া সপ্রমাণ হয় যে, আমাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে ভিন্ন; বাসনাদির উপর ঐ শক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব না থাকিলেও, কখন-কখন ঐ শক্তি উহাদের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব প্রকটিত করিয়া থাকে।

ইচ্ছা ও বুদ্ধি এক না হইলেও ইচ্ছা বুদ্ধিকে পরিচালিত করে। ইচ্ছা করা ও জানা—এই দুইটি ব্যাপার স্বরূপতঃ ভিন্ন। আমরা আমাদের ইচ্ছামত বিচার করি না, পরন্তু বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম-অনুসারে আমরা বিচার করি। সত্যের জ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্কল্প এক নহে। যেমন মনে কর,—ইচ্ছা এ কথা বলে না যে, পিণ্ডের বিস্তৃতি আছে,পিণ্ড আকাশে অবস্থিত, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে ইত্যাদি। তথাপি, আমাদের বুদ্ধির উপর আমাদের ইচ্ছার অনেকটা প্রভুত্ব আছে সন্দেহ নাই। আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, স্বাধীনভাবেই কার্য্য সম্পাদন করি, কতকগুলি বিষয়ের প্রতি, আমরা অল্প কিংবা অধিকক্ষণ, অল্প পরিমাণে কিংবা অধিক পরিমাণে মনোযোগ দিই; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিকে যেমন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারে, তেমনি মন্দীভূত ও নির্ব্বাপিত করি-

হেও পারে। অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, আমাদের অন্তরে এমন একটি পরাশক্তি বিদ্যমান আছে যাহা কি বুদ্ধি, কি ইন্দ্রিয় চেতনা—আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করে, উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করে, উহাদের সহিত মিশ্রিত হয়, উহাদিগকে পরিশাসিত করে, উহাদিগকে স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট হইতে দেয়; ইচ্ছাশক্তির সহিত বিচ্ছেদ হইলে উহাদের আসল প্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেন না, যে মনুষ্য ইচ্ছাশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে স্বীকার করে যে, সে তার আপনার প্রভু নহে, সে যেন সে-মানুষই নহে। আসল কথা, সেই মহতী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এই ইচ্ছাশক্তি এমন সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইলেও এই শক্তিকে লোকে অনেক সময় ভুল বোঝে। ইচ্ছা ও বাসনাকে এক করিয়া ফেলিয়া একটা অদ্ভুত খিচুরী করিয়া তোলে। যাঁহারা এইরূপ খিচুরী পাকাইয়াছেন, তাহার মধ্যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশশতাব্দির বিপরীত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক—স্পিনোজা, মাল্‌ব্রাঁশ্, কঁদিয়াক্ প্রভৃতিকেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় অতিমাত্র ধর্ম্মভাব ও ভ্রান্ত ধর্ম্মভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্য হইতে মনুষ্যের নিজস্ব কর্ত্তৃত্ব শক্তি উঠাইয়া লইয়া সমস্ত কর্ত্তৃত্বশক্তি ঈশ্বরেতেই কেন্দ্রীভূত করে; এবং অপর সম্প্রদায়, সেই শক্তি প্রকৃতির উপর আরোপ করে। এক সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ ঈশ্বরেরই একটা প্রকার-ভেদমাত্র; অপর সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ প্রকৃতিপ্রসূত একটি ফল মাত্র। বাসনাকে যদি একবার কর্ত্তৃভাবের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছুই থাকে না, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। একটি দর্শনতন্ত্র তেমন প্রণালীবদ্ধ না হইলেও, কতকগুলি তথ্যের অনুসরণ করিয়া, সহজ জ্ঞানের দ্বারা উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার শক্তি হইতে, অকর্ত্তা বাসনাকে পৃথক্ করিয়া, ঐ দর্শনশাস্ত্র, যাহা মানুষের বিশেষ লক্ষণ, সেই প্রকৃত কর্ত্তৃত্বশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইচ্ছাশক্তিই কর্ত্তৃপুরুষের প্রধান ধর্ম্ম ও অব্যর্থ লক্ষণ। যে পুরুষ ইচ্ছা করিতে পারে, নিজ ইচ্ছার দ্বারা কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে, এবং সেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া আপনাকে অনুভব করে, সেই সকল কার্য্যের দায়িত্ব অনুভব করে, সে কেমন করিয়া অন্য এক পুরুষের প্রকার-ভেদ মাত্র হইবে? ঐ শক্তি সে অন্য এক সত্তা হইতে ধার করিয়াছে এ কথা কেমন করিয়া বলিবে?

একটা কর্ত্তৃত্বহীন মনোব্যাপার হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র যদি প্রকৃত কর্ত্তৃশক্তির ব্যাখ্যা,—স্বেচ্ছাসাপেক্ষ স্বাধীন কর্ত্তৃশক্তির ব্যাখ্যা করিতে না পারে, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ঐ দর্শনতন্ত্র হইতে প্রকৃত নীতিতত্ত্ব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না; কেন না, নীতি বলিলেই তাহার মূলে স্বাধীনতা আছে এইরূপ বুঝায়। কোন ব্যক্তির উপর আচরণের নিয়ম চাপাইতে হইলে দেখা আবশ্যক, সেই নিয়ম পালন কিংবা লঙ্ঘন করিবার তাহার সামর্থ্য আছে কি না। কোন কার্য্যের ভাল-মন্দ সেই কার্য্যের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু যে উদ্দেশ্যে সেই কার্য্য সম্পাদিত হয় তা-

হার উপরেই নির্ভর করে। সুবিচারপরায়ণ আদালতের নিকট, অপরাধ উদ্দেশ্যেতেই অপরাধ বর্ত্তে, এবং উদ্দেশ্যেরই সহিত দণ্ড সংযুক্ত। অতএব যেখানে স্বাধীনতা নাই, যেখানে বাসনা ও প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই, সেখানে নীতিতত্ত্বের ছায়াও থাকিতে পারে না। কিন্তু এসব কথা পাড়িয়া, আমরা ইন্দ্রিয় মূলক নীতিকে একেবারে অপসারিত করিতে চাহি না। ঐন্দ্রিয়িক নীতির মেটি মূল সূত্র, সেই মূল সূত্রটি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইব যে সে মূলসূত্র হইতে ভাল মন্দের ধারণা কিংবা তৎসংযুক্ত অন্য কোন নৈতিক ধারণা বাহির হইতে পারে না।

আলোক ও বর্ণজ্ঞান।

অক্ষি-যবনিকায় (Retina) বিস্তৃত দৃষ্টি-নাড়ীর (Uptic nerve) প্রান্তে বাহিরের আলোক পড়িলে তাহা কি প্রকারে মস্তিষ্কে চালিত হইয়া দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করে, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অদ্যাপি কেহই তাহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। বিষয় যতই জটিল ও দুর্ব্বোধ হউক না কেন, আজকালকার দিনে কোন ব্যাপারেরই ব্যাখ্যানের অভাব হয় না। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এজন্য আজকাল এ সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা স্থান পাইয়া গিয়াছে। কেবল পুস্তক পড়িয়া এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে গেলে জ্ঞানলিপ্সুর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রসিদ্ধ শারীরতত্ত্ববিদ্ হালিবার্টন্ সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—আলোক অক্ষি-যবনিকার উপর পড়িয়া যে পরিবর্ত্তন করে, সেটা সম্ভবতঃ নিছক্ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। যবনিকায় যে জীবসামগ্রী (Protoplasm) বিস্তৃত থাকে, তাহার উপর আলোক পড়িলেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, এবং এই পরিবর্ত্তনই দৃষ্টিনাড়ীর প্রান্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। কিন্তু ইহার পর উত্তেজনাটা মস্তিষ্কে পরিবাহিত হইয়া যে কি প্রকারে দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করায়, হালিবার্টন সাহেব তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করা সত্যই অসম্ভব।

আলোক পদার্থ বিশেষের উপর পড়িয়া তাহাকে যে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করে, তাহাতে আর এখন অবিশ্বাস করা চলে না। শত শত প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় আলোকের রাসায়নিক কার্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ক্লোরিন (Chlorine) ও হাইড্রোজেন (Hydrogen) বায়ুকে একটি কাচপাত্রে মিশাইয়া অন্ধকার ঘরে রাখিলে, উভয় বায়ু কেবল মিশিয়া থাকে মাত্র। এ অবস্থায় তাহাদের কোনই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পাত্রটিকে কিছুক্ষণ সূর্য্যালোকে রাখিয়া দিলে আলোকের স্পর্শে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন্ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ উৎপন্ন হয়। ফটোগ্রাফের কাচের উপরকার প্রলেপ আলোক পাইলেই যে কালো হইয়া যায় তাহাও আলোকের রাসায়নিক কার্য্যের একটি উদাহরণ। বৃক্ষের পত্রাদিতে যে সকল সবুজবর্ণের অণু পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহারাই বাতাসের অঙ্গারক বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অঙ্গার উৎপন্ন করে, এবং তাহাই দেহস্থ করিয়া উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের আলোকই উদ্ভিদের হরিদাণুগুলিকে সক্রিয় করায়। সুতরাং অক্ষি-যবনিকায় পড়িলে তদ্দ্বারা জীবসামগ্রীর পক্ষে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হওয়ারই যে সম্ভাবনা

অধিক, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নাই, অক্ষি-যবনিকার কোষগুলি প্রায় সর্ব্বদাই একপ্রকার রঙিন্ পদার্থে পূর্ণ থাকে, এবং তা'ছাড়া দণ্ডাকৃতি ও মোচাকারের (Rods and Cones) কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ উহার সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, আলোক পাইলেই কোষমধ্যস্থ বর্ণকণিকাগুলি সচঞ্চল হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মোচাকার জিনিসগুলাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ভেক প্রভৃতি কতকগুলি ইতর প্রাণীর অক্ষি-যবনিকায় যে দণ্ডাকৃতি পদার্থ থাকে, সেগুলিকে প্রায়ই একপ্রকার বর্ণরসে (Visual purple) পূর্ণ দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অন্ধকারে ঐ রসের কোন বিকার হয় না, কিন্তু আলোক পাইলেই তাহা আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। কাজেই আলোক চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিলে যে সত্য সত্যই রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়, তাহাতে আর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

অক্ষিযবনিকার বিস্তৃত দণ্ড ও মোচাকার কোষগুলির উপরে আলোকের পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণজ্ঞান উৎপত্তির সহিত ইহার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মনে হইয়াছিল, এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হেরিং ও হেলেম্‌হোজ্ সাহেব বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে দুইটি পৃথক সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন।

হেরিং সাহেব বলেন,—ভেকের অক্ষি-যবনিকাস্থ কোষে যেমন একপ্রকার বর্ণরস দেখা যায়, মানবের চক্ষু-যবনিকায় সম্ভবতঃ সেইপ্রকার তিনজাতীয় বর্ণরস বর্ত্তমান আছে, এবং এই রসগুলির প্রত্যেকেই এক বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট। লাল সবুজ, পীতনীল এবং শ্বেতকৃষ্ণ এই তিন জোড়া বর্ণের আলোক ঐ তিনজাতীয় বর্ণরসের এক একটিকে নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য করে। অর্থাৎ লালসবুজ আলোক যে বর্ণরসের উপর কার্য্য করে, নীলপীত বা শ্বেতকৃষ্ণালোক তাহার কোনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

লালসবুজ ইত্যাদি যে তিন জোড়া বর্ণের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকের দুই দুইটি বর্ণ পরস্পরের বিরোধী। অর্থাৎ লালসবুজ এই বর্ণযুগ্মের লালে সবুজের কোনই উপাদান নাই, এবং এই দুই বর্ণ পরস্পরের বিরোধী বলিয়া ইহাদের মিশ্রণে অপর কোন বর্ণ উৎপন্ন হয় না। শ্বেতকৃষ্ণ এবং নীলপীতের দুই দুইটি বর্ণের মধ্যেও ঠিক ঐপ্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান। হেরিং সাহেব বলেন,—এই তিন জোড়া আলোকের প্রত্যেক জোড়া সাড়া দিবার উপযোগী বর্ণরসের উপর আসিয়া পড়িলে, অবস্থা বিশেষে সেই পদার্থের ক্ষয় বা বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, এবং এই ক্ষয় বৃদ্ধির দ্বারাই একই বর্ণরসের সাহায্যে দুই দুইটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অক্ষি-যবনিকার সেই তিন জাতীয় বর্ণরসের মধ্যে যেটি কেবল লালসবুজে সাড়া দিতে পারে, তাহার উপর কোন আলোক পড়িয়া যদি পদার্থের পরিমাণকে বাড়াইয়া দেয়, তবে দ্রষ্টা ইহার ফলে কেবল লাল বর্ণই দেখিতে পাইবে; এবং অপর কোনও আলোক দ্বারা যদি সেই পদার্থেরই ক্ষয় আরম্ভ হয়, দর্শকের চক্ষে তবে তাহা সবুজ আলোক হইয়া দাঁড়াইবে।

এখন হেলেম্‌হোজ্ বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে কি

বলেন দেখা যাউক। তিন জোড়ার ছয়টি মূলবর্ণের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া, এবং অক্ষি-যবনিকার বর্ণরসের তিনটি পৃথক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া হেরিং সাহেব বর্ণজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব প্রথমেই ঐপ্রকার ছয়টি মৌলিক বর্ণের অস্তিত্বে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মতে, লাল সবুজ ও বেগুণিয়া এই তিনপ্রকার বর্ণ ব্যতীত আর কোন বর্ণই আমাদের চক্ষু দেখিতে পায় না। আমরা যে এগুলি ছাড়া আরো শত শত বর্ণ দেখি, তাহারা ঐ তিন বর্ণেরই বিচিত্র সংমিশ্রণের ফল। হেরিং সাহেবের সিদ্ধান্তের সহিত হেলম্‌হোজের মতবাদের ইহাই একমাত্র অনৈক্য নয়। হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব আরো বলিয়াছেন, দৃষ্টিনাড়ীগুচ্ছের প্রান্তে যে সকল দণ্ড ও মোচাকার কোষ দেখা যায়, তাহারাই আলোকে উত্তেজিত হইয়া চক্ষুতে বর্ণ দেখায়। বাহিরে এই দণ্ড ও মোচাকার কোষগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা যায় না বটে, কিন্তু মূলে তাহারা তিন জাতীয় বিধর্ম্মী জিনিস। লাল সবুজ বেগুণিয়া এই তিনটি মৌলিক বর্ণের আলোক ঐ তিনজাতীয় কোষের উপর একসঙ্গে কাজ করিতে পারে না, এক একটি আলোক ঐ তিন শ্রেণীর কোষের এক একটিকে বাছিয়া লইয়া উত্তেজিত করে, এবং সেই উত্তেজনা দৃষ্টিনাড়ী দ্বারা মস্তিকে নীত হইলে বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জন্য লোহিতালোক উৎপাদক কোষগুলি যে আলোক দ্বারা উত্তেজিত হয়, তাহাকে আমরা লোহিতালোক রূপেই দেখি। অপর দুই জাতীয় কোষ এই আলোকে মোটেই সাড়া দিবে না।

আমাদের চক্ষু কেবল লাল সবুজ ও বেগুণিয়া এই তিন মৌলিক বর্ণ দেখিয়াই ক্ষান্ত হয় না। শত শত আলোক চক্ষে পড়িয়া সর্ব্বদাই শত শত বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি করে এই প্রসঙ্গের হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব বলেন, কোনও মিশ্র আলোক অক্ষি যবনিকায় পড়িয়া যদি পূর্ব্বোক্ত তিন জাতীয় কোষকে একসঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত করে, তবে ইহার ফল লাল সবুজ ও বেগুণিয়া এই তিনটি মৌলিক বর্ণের মিশ্রণের ফলের অনুরূপ হয়। কাজেই মূলে তিনটি মাত্র বর্ণ থাকিলেও আমরা এইপ্রকারে নানা বর্ণের আলোক দেখিতে আরম্ভ করি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে হেলম্‌হোজের মতে, সেই দণ্ডাকৃতি ও মোচাকার তিন জাতীয় কোষের বিচিত্র উত্তেজনাই বর্ণ বৈচিত্র্যের মূলকারণ। যদি কোন আলোক কেবল এক জাতীয় কোষকেই উত্তেজিত করে, তবে এই কোষের জাতিহিসাবে আমরা লোহিত সবুজ বা বেগুণিয়া বর্ণের মধ্যে কেবল মাত্র একটিকেই দেখিতে আরম্ভ করিব।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি পৃথক সিদ্ধান্তের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল হেলম্‌হোজের উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সহস্র সহস্র বর্ণের মধ্যে ইনি কেবল লাল সবুজ ও বেগুণিয়াকে কি কারণে মৌলিক বর্ণ বলিয়া স্থির করিলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপযোগী নয়। চক্ষুর উপর সুকৌশলে নানা বর্ণের আলোকপাত করিয়া হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব অক্ষি-যবনিকাকে কেবল লাল সবুজ ও বেগুণিয়া বর্ণেই অবসাদগ্রস্ত হইতে দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার আরো অনেক পরীক্ষার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ই যে মৌলিক বর্ণ তাহা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়াছিল। হেরিং সাহেবের ন্যায় নিছক্ কল্পনার উপর দাঁড়াইয়া হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব কোন কথাই বলেন নাই, যাহা বলিয়াছেন হাতে হাতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। বোধ হয় এইজন্যই আজ হেলম্‌হোজের সিদ্ধান্তটির এত আদর। *

* আলোকের শক্তি কি প্রকারে দৃষ্টিনাড়ীর উত্তেজনায় পরিণত হয়, আমরা পরপ্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

সেখ সাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধুকে দেখিলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবে; তাঁহার অন্তরের ভিতরে যাহাই থাক্, তাহা অনুসন্ধান করিবার তোমার আবশ্যক নাই।

পাপীরা ঈশ্বরের নিকট কৃতপাপের জন্য অনুতাপ করে; কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে জানে, তাহারা ইহাই বলে, হে ভগবন! বড়ই পরিতাপ যে ইহজীবনে তোমার সেবা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সাধু ঈশ্বরের নিকট ইহাই নিবেদন করে, হে ঈশ্বর! আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া আমার উপর বিচার করিও না, কিন্তু দয়াময় তুমি; তোমার দয়ার দিক দিয়া আমার উপর বিচার কর।

প্রতিদিন প্রভাতে বিনয়ের সহিত ইহাই যেন বলিতে পারি, হে ভগবন্! তোমাকে ত ভুলিব না, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া তোমার এই দীন ভৃত্যকে স্মরণে রাখিও।

যাহারা ঈশ্বরের পথের যাত্রী, তাহারা শত্রুর অস্ত্রেও ব্যথা দিতে চায় না। যাহারা অপরের সহিত বিবাদ করিতে যায়, তাহারা সে পথের সন্ধান কোথায় পাইবে।

ছিন্ন পরিচ্ছদ সাধুতার পরিচায়ক নহে। যিনি সংসারের চিন্তা আড়ম্বর ও মোহ ছাড়িতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।

অনেক সময়ে একাকী থাকাই নিরাপদ। দুর্বৃত্ত সহচর হইতে প্রায়ই বিপদ ঘটে।

যে অহঙ্কারী, সে আপনাকেই বড় দেখে। কিন্তু যদি কখন সত্যের আলোক প্রতিফলিত হয়, সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, যে তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দীন আর কেহ নাই।

অপরে শতমুখে একজনের প্রশংসা করিতেছিল, তাহাতে তিনি বিনয়ের সহিত বলিলেন, আপনারা আমার বাহিরের কার্য্যগুলি দেখিয়া প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু আমার অন্তরের মলিন ভাবের ত পরিচয় পান নাই। লোকে ময়ূরের পক্ষচ্ছটা দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু হায়! যখন সে নিজে তাহার কদর্য্য পায়ের উপর দৃষ্টিপাত করে, লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

আমার অবস্থা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। একবার চমকাইতেছে, পরক্ষণেই গাঢ় অন্ধকার! আমি এক একবার এখান হইতে স্বর্গের ছবি দেখিতে পাই, তাহার পরেই হায়! নিজের পদনিক্ষেপও যে লক্ষ্য করিতে পারি না। যদি ঈশ্বরে স্থায়ীভাবে মনস্থির করিতে পারিতাম, তবে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া যাইতাম।

কোরাণে আছে, আমাদের গ্রীবায় যে ধমনী আছে, ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও আমাদের নিকটে। তিনি আমাদের এত নিকটে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা তাঁহার প্রতি বিমুখ।

একজন সাধু ব্যাঘ্রের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন, তথাপি তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ দেখিয়া আর একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দেহে এত যন্ত্রণা তবুও ঈশ্বরের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতার কারণ কি? সাধু উত্তরে বলিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পাপ আমাকে দংশন করিতে পারে নাই, আমি কেবল দৈববিপদে পড়িয়াছি। ঈশ্বর যদি মৃত্যুকে প্রেরণ করেন, আমি বিন্দুমাত্র বিষন্ন হইব না। আমি কেবল ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিব, প্রভু! তোমার সেবায় এই দীন ভৃত্যের কি অপরাধ, যে তাহার প্রতি তুমি বিরক্ত হইয়াছ।

রাজা একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি আমার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। সাধু উত্তরে বলিলেন, যখন ঈশ্বরকে ভুলি, তখনই আপনার কথা মনে হয়।

সাধু! বৃথা তুমি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেছ। কার্য্যে সাধুতার পরিচয় দাও; বৃথা বেশ ধারণে কি হইবে।

যিনি আপনাকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তিনি ঈশ্বরকে জানিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

দস্যুর নিকটে সদুপদেশ নিতান্তই নিষ্ফল। লৌহশলাকা কঠিন প্রস্তরে কিছুতেই বিদ্ধ হয় না।

সম্পদের সময় দীনদরিদ্রকে বিস্মৃত হইও না। সহাস্য-বদনে দান কর। তাহা না হইলে সম্পদ অচিরেই চলিয়া যাইবে।

একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কাহার নিকট হইতে ভব্যতা শিক্ষা করিয়াছ। উত্তরে বলিল অসভ্যের নিকট হইতে। যাহা ভব্যতার বিরোধী—তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া ও তৎসমস্ত পরিহার করিয়া আমার এই ভব্যতা শিক্ষা।

অতি-ভোজন করিও না, অতি-ভোজনে জ্ঞান ও বুদ্ধি সমস্তই তেজোহীন হইয়া পড়ে।

অনুতাপে ঈশ্বরের ক্রোধ চলিয়া যায়; কিন্তু নিন্দুকের নিন্দা হইতে লোকের নিস্তার কোথায়?

গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে প্রতিবেশীরা আমার কার্য্যাকার্য্য কিছুই জানিতে পারে না। কিন্তু কই, ভগবন্! তোমার দৃষ্টি হইতে যে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারি না!

সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, যে নিন্দুকের মুখ রুদ্ধ হইবে। সেতার যতক্ষণ বেসুর না হয়, ততক্ষণ তাহার কান টিপিবার আবশ্যক কোথায়?

তোমার সম্পত্তি প্রভুত্ব মান মর্য্যাদা সকলই থাক, তোমার মন যদি ঈশ্বরে সংস্থিত থাকে, তবে ত তুমি ঋষি।

পশু পক্ষী সকলেই উচ্চরবে আনন্দে ঈশ্বরের যশ ঘোষণা করিতেছে, তুমিই কি কেবল নীরব থাকিবে?

পাখীরা যে কেবল ঈশ্বরের যশ গান করিতেছে, তাহা নহে; গোলাপের প্রত্যেক কণ্টকেরও জিহ্বা আছে। তাহারাও ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তনে নীরব নহে।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

এস দয়া, গলে যাক্ পাষাণ হৃদয়।
এস পুণ্য, হোক্ প্রাণ পবিত্রতাময়।

এস মৈত্রী, খুলে দাও মনের দুয়ার,
নরনারী সকলেরে করি আপনার।
এস ভক্তি, উৰ্দ্ধপানে টেনে লও মন,
এস প্রীতি, ছিন্ন হোক্ স্বার্থের বন্ধন,
এস শুভবুদ্ধি, তব উদার আলোকে
চলি সংসারের পথে সুখে দুঃখে শোকে।
বিরাজ অচলা শান্তি হৃদয়ের মাঝে,
ছয় রিপু তোমা হেরি দূরে থাক্ লাজে,
সর্ব্বোপরি তুমি দেব আসি দেখা দাও,
নববর্ষে নবশক্তি জীবনে জাগাও।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

নানা কথা।

উপাসনা। বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহর্ষিদেবের বাটীতে পারিবারিক বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত করিয়াছিলেন। উপাসনাদির কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।—পুণার ডেকান কলেজের অধ্যাপক E. A. Woodhouse উডহাউস সাহেব Vedic magazine and Gurukul Samachar নামক পত্রে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের পুনরধ্যাপনার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতীয় ছাত্রগণকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত দর্শনশাস্ত্রের ঘনিষ্টতম যোগ। এই শিক্ষায় ভারতীয় যুবকগণের চরিত্র সংগঠিত হইবে। তিনি বলেন, ভারতীয়গণ সকল অবস্থাতেই উচ্চতম আদর্শ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য লালায়িত। তাহারা ঐ আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতেও কিছুমাত্র কাতর নহে। তিনি বলেন যদি ভারতীয় প্রাচীন মহত্ত্ব জাগাইতে চাও, প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে জাগাইয়া তোল, জাতীয় ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান কর। তিনি আরও বলেন দর্শনের কূট সিদ্ধান্তের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে চরিত্রের মহত্ত্ব বিকশিত হয়, মনের কোমল ও উৎকৃষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন হয়, অধ্যাপককে এই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

Indian Review January 08. p. 54.

আদি ব্রাহ্মসমাজ।—বিগত দুই তিন বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বায়ু পরিবর্তন জন্য রাঁচিতে গমন করায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় দুই মাস ধরিয়া বুধবারের উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে।

জপ।—"তদর্থভাবনং" কেবলমাত্র শব্দবিশেষের পুনরাবৃত্তিতে জপ হয় না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্থ চিন্তা করা চাই। অর্থের দিকে মন সন্নিবেশ না করিয়া কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া চলিয়া গেলাম; মনকে স্তোক দিলাম যে উপাসনা করিয়াছি। কিন্তু সে উপাসনায় কি হইবে, যদি উপাসনার প্রতি বাক্য ও প্রতি শব্দের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিলাম। আমরা বৈদিক সংস্কৃত মন্ত্রে উপাসনা করি। একই মন্ত্র, একই বাঙ্গালা তাৎপর্য্য। অনেক সময় হয় ত সমস্বরের দিকে আমাদের লক্ষ্য রহিয়াছে, বচনবিন্যাসের প্রতি সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভাব গ্রহণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই বা প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার দিকে আমাদের আয়াস নাই। উপাসনা করিতে আসিয়া আমাদের সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে, যাহাতে উপাসনার প্রতি শব্দ ও প্রতি বাক্য উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাৎপর্য্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য যায়, বাক্য ও শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের প্রতি আমাদের সমস্ত মন প্রধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উপাসনায় যোগ দিবার সার্থকতা ঠিক এইখানে। উপাসনান্তে বিদায় গ্রহণের সময় বক্তৃতাটি বেশ হইয়াছে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের পরিবর্ত্তে, যেন সমস্ত হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি, যে ব্যাকুল চিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করিতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে সে ব্যাকুলতার অবসান হইয়াছে, উপাসনা ও উপদেশ শ্রবণে হৃদয় জুড়াইয়াছে, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিয়া ধন্য ও আপ্তকাম হইয়াছি।

উপাসনা-মন্ত্র।—প্রাচীনত্বের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবার জন্য, সমগ্র হিন্দুজাতির সহিত সখ্যবন্ধনের জন্য এবং সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক অনন্ত সত্যের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য আমরা প্রাচীন ঋষিগণের সাধনলব্ধ ব্রহ্মমন্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐ ঋষিমন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিতেছি। ঋষিরা আমাদের অবলম্বিত ঐ এক এক মন্ত্রের সাধনায় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্মমন্ত্রের শাণিত খড়্গাঘাতে অজ্ঞানের দৃঢ়বন্ধন ছেদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাচীন ঋষিদিগের শাণিত অস্ত্র এক্ষণে আমাদের হস্তে; কিন্তু চালনা করিবার আবশ্যকীয় শক্তি নাই বা তাহা লাভ করিবার জন্য আমাদের সেরূপ আয়াস নাই; তাই আমরা সিদ্ধকাম হইতে পারিতেছি না। মনঃসংযম ও সাধনা প্রভাবে যে দিন মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিব, দূর হইতে দেখিতে পাইব, মুক্তির দ্বার অনাবৃত হইয়া আসিতেছে এবং বুঝিতে পারিব হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

উপদেশ। যাহাতে উপাসনা-মন্ত্রের প্রতি-বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিবার আমাদের সামর্থ্য জন্মে, ঠিক এই ভাবে উপদেশ দেওয়া আচার্য্যের কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত কয়েক বুধবার ধরিয়া ব্রহ্মোপাসনার প্রতিশ্লোকের প্রতি শব্দ প্রথম হইতে ব্যাখ্যা করিয়া চলিতেছেন। শব্দের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহারও আভাস দিতেছেন। রবিবাবু ইতিপূর্ব্বে মাঘোৎসবে যে সকল মর্ম্মস্পর্শী লিখিত বক্তৃতা পাঠ

করিয়াছেন, ব্রাহ্মসঙ্গীত জগতে তাঁহার স্থান অতি-উচ্চে। আজকালকার তাঁহার বাচনিক বক্তৃতায় তাঁহার প্রতিভা তুল্যভাবে বিকশিত, তাঁহার আবেগ-ময়ী ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দ বাস্তবিকই বিমুগ্ধ। রবিবাবুর বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্ম-সাধারণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে স্বদেশীয়তা। আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চান, হিন্দু-জাতির গৌরব রক্ষা করিতে চান, আর্য্য পিতৃ-পিতামহকে সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে চান। আদিব্রাহ্মসমাজ বিদেশীয় সত্যের প্রতি বিমুখ নহেন, এবং ইহাও বলিতে চান, যে একই সত্য যদি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, তবে স্বদেশীয় গ্রন্থ-নিবদ্ধ সত্য আমাদের অধিকতর আদরের এবং অন্তরঙ্গ বলিয়াই উহা বিশেষরূপে গ্রাহ্য। অধিকন্তু যে ভাবে ঐ সত্য দেশীয় শাস্ত্রে বিকশিত তাহা আমাদের প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী। আজকাল স্বদেশীভাবের স্রোত চারি-দিকে প্রবাহিত। ফলতঃ এই স্বদেশীয় ভাবে আধ্যা-ত্মিক ধর্ম্মের বিকাশ স্থান—এই আদি ব্রাহ্মসমাজ। এবং স্বদেশীয় ভাবসম্পন্ন বলিয়াই আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বিদেশী চাকচিক্যে সকলেরই মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু মনীষী রামমোহনরায় বা দেবেন্দ্রনাথ উহাতে বিচলিত হন নাই। তাঁহারা কতপূর্ব্বে স্বদেশীয় ভাবে স্বদেশীয় অথচ বিশ্বজনীন সত্যগুলিকে নির্ব্বাচিত ও বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১১।৴৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮৬২৸৶০
সমষ্টি	...	৩১৭৪।৴৬
ব্যয়	...	৪৫৮৷৶৩
স্থিত	...	২৭১৫৸৶৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
১১৫৸৶৩
২৭১৫৸৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২১৪৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নরনাথ মুখোপাধ্যায়
১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র
৺ হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দান
৪৲

২১৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৬৷৶৬
পুস্তকালয়	...	১১৶০
যন্ত্রালয়	...	৬২।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৭।৶০
সমষ্টি	...	৩১১।৴৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৮৭॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩০।৴৩
পুস্তকালয়	...	১৶৩
যন্ত্রালয়	...	১৩৯৵৯
সমষ্টি	...	৪৫৮৷৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

সপ্তদশ-কল্প
দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯।

৭৮০ সংখ্যা | ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत् तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

৭। যে কাজে তোমার বাক্যস্খলন হয়, লজ্জা চলিয়া যায়, যে কাজে কাহার প্রতি তোমার দ্বেষ, সন্দেহ, অভিসম্পাত প্রকাশ পায়, কিংবা এমন কোন কাজে তোমার প্রবৃত্তি হয়, যাহা দিনের আলোক সহিতে পারে না, যাহা জগতের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস পায় না, জানিবে, সে কাজ তোমার স্বার্থের অনুকূল নহে। যে ব্যক্তি আপনার মনকে, এবং আপনার অন্তর্দেবতার পূজাকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহার কোন শোকের অভিনয় করিতে হয় না, কোন দুর্দ্দশায় পড়িয়া পরিতাপ করিতে হয় না, তাহার বিজনতাও আবশ্যক হয় না, লোকসঙ্গও আবশ্যক হয় না; সে জীবনকে প্রার্থনাও করে না, জীবন হইতে পলায়নও করে না; তাহার শরীর, তাহার আত্মাকে দীর্ঘকাল কি অল্পকাল আবৃত করিয়া রাখিবে,— সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। যদি তাহার এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হয়,—জীবনের অন্য সমস্ত নিয়মিত কাজের জন্য সে যেমন প্রস্তুত, ইহার জন্যও সে তেমনি প্রস্তুত। যতদিনই সে বাঁচিয়া থাকুক,—যাহাতে তাহার মন, জ্ঞানবুদ্ধি-বিশিষ্ট সামাজিক জীবের যোগ্য কাজে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে পারে,—তাহার সমস্ত দীর্ঘ জীবনে, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

৮। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, বিশোধিত হইয়াছে, তাহাকে যদি পরীক্ষা কর ত দেখিতে পাইবে, তাহার মধ্যে বিকৃতভাব, মলিনভাব, কিংবা মিথ্যাভাব কিছুই নাই। মৃত্যু তাহার অসম্পূর্ণ জীবনের সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে বিস্ময়বিহ্বল করিতে পারে না; কেহ এ কথা বলিতে পারে না যে, জীবনের নাট্যমঞ্চে তাহার অভিনয় শেষ না হইতে হইতেই সে প্রস্থান করিল। তা'ছাড়া, তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা দাসত্বব্যঞ্জক, কিংবা যাহা আড়ম্বরসূচক; সে অন্যের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আসক্তও

হয় না, কিংবা তাহাদের হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকে না; তাহাদের নিকট তাহার দায়িত্বও নাই, তাহাদিগকে সে একেবারে বর্জ্জনও করে না।

৯। বিবেকবুদ্ধিকেই নিয়ত মানিয়া চলিবে; কেননা, যদি তুমি কোন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এমন কোন কাজে প্রবৃত্ত হও, যাহা বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধ, যাহা বুদ্ধি-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তাহা হইলে, সেই বিবেকবুদ্ধিই তোমাকে সেই কাজ হইতে বিরত করিবে। এই জ্ঞান-বুদ্ধি-সমন্বিত মানব-প্রকৃতির অনুশাসন এই যে, অবিবেচনার সহিত কোন কাজ করিবে না, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেবতাদের আদেশ পালন করিবে।

১০। আর যত চিন্তা আলোচনা, সমস্তই তোমার মস্তিষ্ক হইতে দূর করিয়া দেও; কেবল উপরিউক্ত দুই চারিটি উপদেশ মনে রাখিও; আর মনে রাখিও, প্রতি মনুষ্যের জীবন বর্ত্তমানেই অবস্থিত,—যে বর্ত্তমানকাল কালের একটি বিন্দুমাত্র; কেননা, যাহা অতীত,তাহা অতিবাহিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ কাল অনিশ্চিত। জীবনের গতি সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে বদ্ধ; এবং মানুষ যেখানে অবস্থিতি করে, তাহাও জগতের একটি ক্ষুদ্র কোণ মাত্র। যে যশ খুব দীর্ঘস্থায়ী, তাহাই বা কতদিনের জন্য? হায়! যে সব ক্ষণস্থায়ী দীন মর্ত্ত্য মানব পৃথিবীতে একটু যশ রাখিয়া যায়, তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে অল্পই জানে; এবং তাহাদের সম্বন্ধেও আরও কম জানে, যাহারা তাহাদের বহুপূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

১১। উপরে যে সকল বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম, তাহার সহিত এই কথাটিও যোগ করিতে পার:—তোমার মনে যে কোন বিষয় উপস্থিত হইবে, তাহার লক্ষণ ও কার্য্যাদি-সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় লইবে; তাহা হইলে তাহার আসল প্রকৃতি কি, সে বস্তুটা স্বরূপতঃ কি, তৎসম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিতে পারিবে। কেননা, এই জীবনে যাহা কিছু ঘটে, তাহা যদি পদ্ধতিক্রমে পরীক্ষা ও আলোচনা কর, তাহাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি জানিতে পার, প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজন কি, কি প্রকারে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার ব্যবহার করে—সমগ্র বিশ্বের সম্বন্ধে, ও যে মানুষ সেই বিশ্বরূপ রাজধানীর একজন নাগরিক, সেই মানুষের সম্বন্ধে তাহার মূল্য কি, সেই বস্তু আমার মনের উপর কিরূপ ছাপ্ দেয়, উহা কত দিন স্থায়ী হয়, উহাকে ব্যবহার করিতে গেলে আমার মধ্যে কি গুণ থাকা আবশ্যক—সুশীলতা, ধৈর্য্য, সত্যপরায়ণতা,সরলতা, ও আত্মনির্ভরশীলতা থাকা আবশ্যক কি না—এই সমস্ত যদি আলোচনা কর, তাহা হইলে তোমার মন যেরূপ মহত্ত্বলাভ করিবে, এমন আর কিছুতে করিবে না।

১২। তুমি যদি বিবেকের শাসন মানিয়া চল, যদি শ্রম, বীর্য্য ও ধীরতার সহিত তোমার হাতের কাজগুলি সম্পাদন কর, তুমি যদি কোন নূতন আকর্ষণের প্রতি ধাবিত না হও, যদি তোমার অন্তর্দেবতাকে বিশুদ্ধ রাখ—এমনিভাবে বিশুদ্ধ রাখো যে এখনি বিধাতার দান বিধাতাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরাইয়া দিতে পার, যেন তোমার জীবনের শেষ পরীক্ষা—এই ভাবে যদি তোমার মনকে দৃঢ় ও সুসংযত কর, তুমি যদি এই সকল উপদেশবাক্যকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাক, তোমার যেটি শ্রেষ্ঠ অংশ, তাহারই অনুগত

হইয়া চল,—কিছুরই ভয় না করিয়া, কিছুরই আকাঙ্ক্ষা না করিয়া তোমার প্রকৃতির অনুসারে চল, নির্ভীকভাবে তোমার কথার সত্যতা রক্ষা কর, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক, তাহা হইলেই তুমি সুখী হইবে—এ কাজে সমস্ত জগৎও তোমাকে বাধা দিতে পারিবেনা।

১৩। যেমন অস্ত্রচিকিৎসকেরা আকস্মিক ঘটনার জন্য তাহাদের অস্ত্রাদি সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখে, সেইরূপ তুমি সেই সব তত্ত্বজ্ঞানের মূলসূত্র ও নিয়ম ঠিক্ করিয়া রাখিবে, যাহার দ্বারা তুমি মানব-বিষয়ের ও ঐশ্বরিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও; এবং ইহাও মনে রাখিও যে তোমার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজে, মানব-বিষয়ের সহিত ঐশ্বরিক বিষয়ের বিশেষ যোগ আছে; কারণ, ঐশ্বরিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, মনুষ্যের প্রতি তোমার ব্যবহার যথোচিত হইবে না।

১৪। উদ্দেশ্যহীন হইয়া আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে না। বার্দ্ধক্যে তোমার কাজে লাগিবে বলিয়া তুমি যে তোমার জীবনের দৈনিক ঘটনা-সকল লিখিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাও পড়িবার সময় পাইবে না। তোমার গন্তব্য পথের দিকে দ্রুতপদে চল। আর আত্মবঞ্চনা করিও না। যদি তোমার নিজের উপর কিছুমাত্র মমতা থাকে, যত দূর পার, এখনও তোমার নিজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও।

১৫। মানুষের তিনটি জিনিস আছে;—শরীর, হৃদয়, ও মন। শরীরের ইন্দ্রিয়-বোধ, হৃদয়ের আবেগ, মনের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যপদার্থের ছাপ্ পড়ে—এই বিষয়ে মানুষ, গো-মহিষাদি পশুর সমান; প্রবৃত্তির আবেগ ও আবেশে অধীর হইয়া পড়া—ইহা হিংস্রজন্তু, ফ্যালারিস্, ও নীরোর ন্যায় ভোগবিলাসীদের ধর্ম্ম—নাস্তিক ও বিশ্বাসঘাতকদের ধর্ম্ম, এবং যাহারা লোকলোচনের অগোচরে কাজ করে, তাহাদের ধর্ম্ম। এগুলি যদি মনুষ্য ও পশুর সাধারণ ধর্ম্ম হইল, তবে এখন দেখা যাক্, সাধুব্যক্তির বিশেষ লক্ষণ কি? সাধুব্যক্তির বিশেষত্বটি এই যে, তাঁহার বিবেকবুদ্ধিই তাঁহার জীবনের নেতা; তাঁহার ভাগ্যে যাহা কিছু আইসে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট; বহির্ব্বিষয়ের কোলাহলে অবিচলিত থাকিয়া, তিনি তাঁহার অন্তর্দেবতাকে পরিশুদ্ধ রাখেন, শান্ত রাখেন, এবং তাঁহার আদেশবাণী দেববাণীর ন্যায় পালন করেন। বাক্যে তিনি সত্য-পরায়ণ, কার্য্যে তিনি ন্যায়-পরায়ণ হয়েন। যদি সমস্ত জগৎ তাঁহার সততায় অবিশ্বাস করে, তাঁহার আচরণের প্রতিবাদ করে, তিনি যে সুখী, সে বিষয়ে সন্দেহ করে,—তথাপি তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হয়েন না, কিংবা তাঁহার জীবনের গন্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র পরিভ্রষ্ট হয়েন না। তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া, শান্ত-দান্ত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়া, নিজ অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, সেই গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হয়েন।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনের মতে,—উপযোগী কিংবা আবশ্যক ছাড়া মঙ্গল আর কিছুই নহে। মূলসূত্রের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, মনোজ্ঞের স্থানে শুধু উপযোগীকে বসাইয়া, ঐন্দ্রিয়িক দর্শন অনেকগুলি আপত্তি

খণ্ডন করিবার সুবিধা পাইয়াছে; কেননা, ঐ সম্প্রদায় এই কথা সর্ব্বদাই বলে, সুবিবেচিত স্বার্থ, আর আপাত-প্রতীয়মান ইতর স্বার্থের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে; কিন্তু আমারা দেখাইব,—এই মতবাদ, অপেক্ষাকৃত একটু মার্জ্জিত আকার ধারণ করিলেও ভালমন্দের পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

যদি উপযোগিতা, কিংবা সুবিধাই ভাল কাজের একমাত্র মানদণ্ড হয়, তাহা হইলে কোন কাজ করিবার সময় সেই কাজে আমার কি লাভ হইতে পারে, শুধু এই বিষয়টির প্রতিই আমার দৃষ্টি রাখিতে হয়।

মনে কর, আমার একজন বন্ধু, যাহাকে আমি নিরপরাধী বলিয়া জানি, সে হঠাৎ রাজার, কিংবা লোকের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইল—(লোক মতের উৎপীড়ন এক এক সময় রাজার উৎপীড়ন অপেক্ষাও বেশী); এই অবস্থায় আমার বন্ধুর বন্ধুত্ব রক্ষা করা আমার পক্ষে হয়ত বিপদ-জনক, কিংবা বন্ধুকে পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে লাভজনক। এক দিকে নিশ্চিত বিপদ, আর একদিকে অব্যর্থ লাভ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই স্থলে, হয় আমার দুর্ভাগ্য বন্ধুটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নয় স্বার্থের নীতিকে—সুবিবেচিত স্বার্থের নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

কিন্তু উহারা উত্তরে এই কথা বলিতে পারে, মানুষ-ব্যাপারের অনিশ্চিততা ভাবিয়া দেখ; ভাবিয়া দেখ, তুমিও একদিন এইরূপ বিপদে পড়িতে পার; যদি তোমার বন্ধুকে তুমি এখন পরিত্যাগ কর, তাহাহইলে তোমার বিপৎকালেও তোমার বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন।

আমি এই উত্তর দিই ঃ—প্রথমতঃ ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত, বর্ত্তমানই সুনিশ্চিত। যদি কোন কার্য্যে আমার এখনি নিশ্চিত লাভ হয়, তবে ভাবী বিপদের শুধু সম্ভাবনা মনে করিয়া, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ লাভকে বিসর্জ্জন করা নিতান্তই অসঙ্গত। তা'ছাড়া আমার বিবেচনায়, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাগুলিই আমার অনুকূলে।

লোকমতের কথা আমার নিকট বলিও না। যদি ব্যক্তিগত স্বার্থই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত নীতি সূত্র হয়, তবে লোকমতও আমার অনুকূলে হওয়া উচিত। যদি লোকমত আমার বিরুদ্ধ হয়, তাহাহইলে উক্ত নীতিসূত্রের সত্যতার সম্বন্ধে উহাই ত একটা আপত্তির কথা; কারণ, যে নীতিসূত্রটি সত্য, যাহা ন্যায্যরূপে মানব-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা কেমন করিয়া লোকসাধারণের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ হইবে?

অনুতাপের আপত্তিও উত্থাপন করিও না। যদি স্বার্থ-নীতি সত্য হয়, তবে সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া আমার কি কখন অনুতাপ হইতে পারে? বরং তাহাতে আমি আত্মপ্রসাদই অনুভব করিব।

এখন বাকী রহিল পারত্রিক দণ্ড-পুরস্কারের কথা। কিন্তু যে দর্শনতন্ত্রে মানবজ্ঞান শুধু রূপান্তরিত ইন্দ্রিয়বোধের সীমার মধ্যেই বদ্ধ, সে দর্শনতন্ত্রে পরলোকের বিশ্বাস কিরূপে স্থান পাইবে?

অতএব দেখা যাইতেছে, আমার বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার পক্ষে আমার কোন প্রয়োজনই নাই—কোন কার্য্যপ্রবর্ত্তক হেতুই নাই। অথচ, সমস্ত মানব-মণ্ডলই এই বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে চাপাইতেছে; আমি যদি ঐ বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে না পারি, আমি লোকের নিকট অবমানিত হইব।

যদি সুখই আমাদের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শুধু কাজে ভাল-মন্দ বর্ত্তায়

না, উহার ভালমন্দ পরিণামে; উহার সুখজনক, কিংবা দুঃখজনক পরিণামের উপর ভালমন্দ নির্ভর করে।

কোন একব্যক্তি বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে দেখিয়া ফন্টেনেল্ বলিয়াছিলেনঃ—"ঐ লোকটার গণনায় ভুল হইয়া গিয়াছে"। এই যুক্তি অনুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়—ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ করিয়াও যদি কোন প্রকারে মৃত্যুদণ্ডকে এড়াইতে পারিত, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত, উহার গণনা ঠিক হইয়াছিল; এবং তাহা হইলে তাহার আচরণও প্রশংসনীয় হইত। তবেই দাঁড়াইতেছে, ঘটনা অনুসারেই কোন কাজ ভাল, কিংবা মন্দ; আসলে কোন কাজ ভাল, কিংবা মন্দ নহে।

সততা যদি উপযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই না হয়, তাহা হইলে ফলাফল গণনার প্রতিভাই বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা; শুধু বিজ্ঞতা কেন—উহাই ধর্ম্ম! কিন্তু এই প্রতিভা সকলের আয়ত্তের মধ্যে নহে। প্রতিভার অর্থ—দীর্ঘকালের জীবনের অভিজ্ঞতা চাই, পর্য্যবেক্ষণের এমন একটা ধ্রুব শক্তি চাই, যাহাতে করিয়া কার্য্যের সমস্ত ফলাফল এক নজরেই উপলব্ধি হইতে পারে, এমন সতেজ ও বিশাল মস্তিষ্ক থাকা চাই, যাহাতে করিয়া সমস্ত সম্ভাবনাগুলি গণনার মধ্যে আনিয়া, তাহা ঠিকমত ওজন করা যাইতে পারে। দীনচেতা কোন অজ্ঞ যুবক ভাল-মন্দের পার্থক্য, সৎ-অসতের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না। মানবব্যাপারসমূহ এরূপ তমসাচ্ছন্ন যে, খুব দূরদৃষ্টি থাকিলেও, অনপেক্ষিত অভূতপূর্ব্ব ঘটনার হাত হইতে এড়ান দুষ্কর! বস্তুতঃ, "সুবিবেচিত" স্বার্থের নীতিতন্ত্রের মধ্যে, সততার শিক্ষার জন্য, একটা বিরাট্ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবশ্যক; সচরাচর সৎকার্য্যের জন্য এরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ সৎকার্য্যের বীজ মন্ত্রঃ—"উচিত কাজ ত করি, তার পর যা হ'বার তা' হবে"। কিন্তু এই বীজমন্ত্রটি, স্বার্থনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। দুয়ের মধ্যে একটা নির্ব্বাচন করিতে হইবে;—একমাত্র স্বার্থই যদি যুক্তির অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে নিঃস্বার্থপরতা একটা মিথ্যা কথা, একটা প্রলাপবাক্য, মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

তথাপি সমস্ত মানবমণ্ডলী নিঃস্বার্থপরতার কথা বলিয়া থাকে, এবং নিঃস্বার্থপরতার তাহারা অর্থ এরূপ বুঝে না যে, স্থায়ী সুখের জন্য, ধ্রুব সুখের জন্য, কোন সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে হইবে। এ কেহ বিশ্বাস করে না যে, কোন উৎকৃষ্ট বিশেষ প্রকারের সুখের আকাঙ্ক্ষাই নিঃস্বার্থপরতা। যে কোন প্রকার স্বার্থই হউক, স্বার্থ-বিবর্জ্জিত কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট স্বার্থকে বলিদান করাকেই নিঃস্বার্থপরতা বলে; সমস্ত মানবমণ্ডলী এইরূপ ভাবকেই নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া শুধু বুঝে, তাহা নহে, এইরূপ নিঃস্বার্থপরতা মানবসমাজে বাস্তবিকই আছে বলিয়া বিশ্বাস করে; আরও বিশ্বাস করে যে, এইরূপ নিঃস্বার্থভাবের কাজ করিতে মানব-আত্মা সমর্থ। মহাত্মা Regulus আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর শত্রুদের দেশে গিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে,—আপনার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া, বেশ মানমর্য্যাদার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে কোন স্বার্থের ভাব দেখা যায় না; তাই লোকে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গের জন্য তাঁহাকে এত ভক্তি করে।

কিন্তু কেহ কেহ বলিবেন, তা' কেন—প্রচণ্ড যশো-লালসাই রেগুলাস্‌কে ঐরূপ কাজে উত্তেজিত করিয়াছিল; অতএব ঐ পুরাতন রোমকের কাজে যাহা বীরত্ব বলিয়া আপাতত প্রতীয়মান হয়, তাহা আসলে এক-প্রকার স্বার্থপরতা। মানিয়া লও, ঐরূপ ভাবের স্বার্থবুদ্ধি, যার-পর নাই অসঙ্গত ও হাস্যজনক—মানিয়া লও, বীরেরা নিতান্তই স্বার্থপর এবং তাহাদের এই স্বার্থপরতা অবিবেচনামূলক, ও ফলাফলজ্ঞানশূন্য। Regulus-এর, Assas কিংবা Saint Vincent De Paul-এর প্রস্তর-প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া উহাদিগকে তবে বাতুলাশ্রমে পাঠানোই শ্রেয়। সেখানকার কড়াক্কর নিয়মের মধ্যে থাকিলে, উহাদের উদারতা, বদান্যতা, মহানুভবতা প্রভৃতি সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে, উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে—উহারা আবার প্রকৃতিস্থ হইবে;—উহারা আবার সেই সব লোকের মত হইবে, যাহারা শুধু আপনার কথাই ভাবে, যাহারা স্বার্থ ছাড়া আর কোন নীতি বুঝে না।

যদি নিজের কোন স্বাধীনতা না থাকে, ভাল-মন্দের মধ্যে যদি স্বরূপত কোনো পার্থক্য না থাকে, স্বার্থই যদি আমাদের জীবনের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, তাহা হইলে আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই থাকে না।

প্রথমতঃ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কর্ত্তব্যতা বলিলেই বুঝায়—এমন কোন জীব আছে যে কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ; স্বাধীন জীব ছাড়া কর্ত্তব্য-শব্দ আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তাহার পর, কর্ত্তব্যতার প্রকৃতিই এইরূপ, যদি আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে ত্রুটি হয়,—আমরা আপনাকে অপরাধী বলিয়া অনুভব করি; পক্ষান্তরে, যদি আমাদের স্বার্থ ঠিক্ না বুঝি—যদি ভুল করিয়া বুঝি,—তাহার ফল শুধু এই হয়—আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই। তবে কি, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়া, ও অপরাধী হওয়া একই জিনিস? এই দুইটি ধারণা মূলতঃ বিভিন্ন। তুমি আমাকে পরামর্শচ্ছলে বলিতে পার "তোমার স্বার্থ যদি তুমি ঠিক্ না বোঝো, তাহা হইলে তুমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে; কিন্তু তুমি এরূপ উপদেশ দিতে পার না—"তোমার স্বার্থ ঠিক্ না বুঝিলে তুমি অপরাধী হইবে।"

অপরিণামদর্শিতাকে কেহ কখন অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করে না। নৈতিক হিসাবে যখন উহার কেহ দোষ দেয়, তখন হদ্দ এই কথা বলে, উহাতে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়।

অতএব, প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করা অনেক সময় অতীব দুরূহ; কিন্তু যাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা সকল সময়েই প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট। প্রবৃত্তি ও বাসনা উহার সহিত যতই যুদ্ধ করুক না কেন, মিথ্যা-যুক্তি যতই কুতর্ক আনুক না কেন, বিবেকবুদ্ধির স্বাভাবিক সংস্কার, অন্তরাত্মার গূঢ় বাণী, স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রজ্ঞার উপদেশ—ঐ সমস্ত কুতর্কজালকে নিদূরিত করিয়া, কর্ত্তব্যতাকে প্রকাশ করে।

স্বার্থের উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন,—উহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে—উহার সহিত একটা বোঝাপড়া করা যাইতে পারে।—অসংখ্য প্রকারে সুখী হওয়া যাইতে পারে। তুমি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছ, এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে আমি ধনশালী হইব। তাহা সত্য; কিন্তু আমি ধন-ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শান্তি ভালবাসি। শুধু সুখের হিসাবে দেখিতে গেলে, আলস্য অপেক্ষা কর্ম্মচেষ্টা

যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা যায় না। কাহাকেও স্বার্থসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যেমন কঠিন, এমন আর কিছুই না;—পক্ষান্তরে সততা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ।

যাই বল না কেন, অবশেষে, উপযোগিতা, কার্য্যতঃ মনোজ্ঞতাতেই পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ সুখেচ্ছাতেই পরিণত হইতেছে। এখন, সুখের কথা যদি ধর,—উহা মনের ক্ষণিক ভাবের উপর, লোকবিশেষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি ভালমন্দের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ না থাকে, তবে উচ্চতর সুখ ও নিম্নতর সুখ বলিয়া সুখের মধ্যেও কোন তারতম্য থাকিতে পারে না; এমন কোন সুখের সামগ্রী নাই, যাহা আমাদিগকে অল্প-বিস্তর সুখী না করে। আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিই এইরূপ। এইজন্যই স্বার্থবুদ্ধি এরূপ খামখেয়ালী। যেটা যা'র ভাল লাগে, তাই তা'র স্বার্থ; কেন না, যেটা যা'র ভাল লাগে, তা'র বিবেচনায় সেইটিই তা'র স্বার্থ বলিয়া মনে হয়। একজন ইন্দ্রিয়-সুখে বেশী মুগ্ধ হয়, আর একজন মনের সুখে,—হৃদয়ের সুখে বেশী মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রিয় সুখের স্থানে যশঃস্পৃহা আসিয়া কাহারও চিত্ত অধিকার করে; কাহারও নিকট প্রভুত্বস্পৃহা, যশঃস্পৃহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটা বিশেষ প্রকৃতির অধীন; অতএব প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণে আপনার স্বার্থ বুঝিয়া থাকে; তা' ছাড়া, আমার আজিকার যে স্বার্থ, তাহা কালিকার স্বার্থ না হইতেও পারে।

স্বাস্থ্যের তারতম্যে, বয়সের প্রভাবে, ঘটনার পরিবর্ত্তনে, আমাদের রুচি ও মেজাজেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। আমরা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাসনা ও স্বার্থও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কিন্তু কর্ত্তব্যের অবশ্যতা সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিলে, এমন একটা কিছু বুঝায়, যাহার নড়্‌চড়্ হইতে পারে না। কর্ত্তব্যের বন্ধন কোন ব্যপদেশেই শিথিল হয় না, এবং সকলের পক্ষেই সমান বলবৎ। ইহা এমন একটা জিনিস, যাহার নিকটে, আমার মনের খেয়াল, আমার কল্পনা, আমার সূক্ষ্ম চেতিতা, সমস্তই অন্তর্হিত হইবার কথা; ইহা একপ্রকার মঙ্গলভাব, যাহার সহিত বাধ্যতার ভাব জড়িত। আমার মেজাজ যে প্রকারই হোক্ না কেন, আমার অবস্থা যাহাই হোক্ না কেন, যে কোন বাধাই থাক্ না কেন, কর্ত্তব্যের আদেশ আমি পালন করিতে বাধ্য। ইহার নিকট শৈথিল্য চলে না, আপোসে বোঝাপড়া চলে না, ওজর-আপত্তি খাটে না। তোমার প্রতিই হউক্, আমার প্রতিই হউক্, যে কোন স্থানে হউক্, যে কোন অবস্থায় হউক্, আমাদের মনের ভাব যে-রকমই হউক্,—কর্ত্তব্যের আদেশ হইবামাত্রই তাহা পালন করিতে হইবে। কর্ত্তব্যের আদেশ আমরা না মানিতেও পারি, কেন না আমরা স্বাধীন; কিন্তু এই আদেশ লঙ্ঘন করিবা মাত্রই আমাদের মনে হইবে, আমরা দোষ করিতেছি, আমরা আমাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছি, এবং তাহার দণ্ডস্বরূপ তখনই আমাদের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

স্বার্থের উপদেশ, বিষয়বুদ্ধির উপদেশ শুনিলে আমরা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, না শুনিলে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইতে পারি। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি সুখী হইতে বাধ্য? যে জিনিস দুর্লভ, যাহা আমি

ইচ্ছা করিলেই পাই না, সেই সুখসৌভাগ্যের সহিত কি বাধ্যতা সংযুক্ত হইতে পারে? যদি আমি কোন বিষয়ে বাধ্য হই, তবে যে বিষয়ে আমি বাধ্য, তাহা করিবার শক্তিও আমার থাকা চাই; কিন্তু সুখসৌভাগ্যের উপর স্বাধীনতার বড় একটা হাত নাই; কেননা, সুখসৌভাগ্য এমন অসংখ্য জিনিসের উপর নির্ভর করে, যাহা আমার আয়ত্তের বাহিরে; কিন্তু ধর্ম্মোপার্জ্জন সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ধর্ম্মোপার্জ্জনে আমাদের স্বাধীনতা আছে। নীতিতত্ত্বের হিসাবে—সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টও নহে, নিকৃষ্টও নহে। যদি আমার স্বার্থ আমি ঠিক বুঝিতে না পারি, তাহার দণ্ডস্বরূপ আমি দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিব; কিন্তু অনুতাপ অনুভব করিব না। যে দুঃখ-দুর্দ্দশা শুধু বৈষয়িক, যাহা কোন মানসিক পাপের ফল নহে, তাহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে; কিন্তু তাহা আমার হীনতা ঘটাইতে পারে না।

আমরা পুরাতন ষ্টোয়িক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি না। আমরা দুঃখের প্রতি এই কথা বলি না:—"দুঃখ! তুমি অমঙ্গল নও"। আমরা বরং বলি, যত দূর পার, দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে চেষ্টা কর, আপনার স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, দুঃখ বর্জ্জন কর, সুখ অন্বেষণ কর। আমরা দূরদৃষ্টি ও পরিণামদর্শিতার খুবই পক্ষপাতী। আমরা শুধু এইটি প্রতিপন্ন করিতে চাই যে,—সুখ এক জিনিস, ধর্ম্ম আর এক জিনিস; সুখের স্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক হইলেও কর্ত্তব্যের বাধ্যতা শুধু ধর্ম্মেরই সহিত জড়িত; সুতরাং আমাদের স্বার্থের পাশাপাশি একটা ধর্ম্মনীতির নিয়ম রহিয়াছে। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দেয়, সমস্ত মানব-মণ্ডলী ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই ধর্ম্মনীতির অনুশাসন অকাট্য, উহা লঙ্ঘন করিলে আমার অধর্ম্ম হয়, আমার লজ্জা বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

ধনিয়া-সুত্ত।

(মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন)

ধনিয়া।

"পক অন্ন, গাভীদুগ্ধ আছি খেয়ে পিয়ে,
মহীতীরে ভাই-বন্ধু মিলি করি বাস;
কুটীর ছাদিত, অগিনি আহিত,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"অক্রোধ বন্ধনশূন্য আমি যে এখন,
মহীতীরে সবেমাত্র এক রাত্রি বাস;
গৃহ অনাবৃত, অগ্নি নির্ব্বাপিত,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"অন্ধক-মশক হ'তে মুক্ত ধেনুগুলি
তৃণাচ্ছন্ন গোচরণে চরিয়া বেড়ায়;
আসুক্ না বৃষ্টি, না করিবে দৃষ্টি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"নৌকাখানি সুগঠন, বদ্ধ আটে ঘাটে,
বড় বড় ঢেউ ঠেলি তাহে হৈনু পার;
নৌকার এখন কিবা প্রয়োজন,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"গোপী মম সুচরিতা, পতিব্রতা সতী,
একত্রে করিনু ঘর দীর্ঘকাল ধরি,
নাহি তা'র নামে নিন্দা শুনি কাণে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"চিত্ত মম সংযত স্বাধীন, বহুকাল,
বহু তপস্যার তা'র আনিনু স্ববশে;
তাহে পাপ-লেশ না করে প্রবেশ,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"আপন অর্জিতধনে চালাই সংসার,
পুত্রগণ নীরোগ সবল; নিন্দা কোন
তাহাদের নামে শুনি নাই কাণে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"কারো নহি বৃত্তিভোগী, আপনার প্রভু,
অবাধে আপন মনে ভ্রমি সর্ব্বলোকে;
দাসত্বে কি কাজ বল মোর আজ,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"আছে গাভী দুগ্ধবতী, আছে বৎস কত,
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও আছে হেথা,
আছে ও তেমতি বৃষভ গোপতি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"নাহি গাভী দুগ্ধবতী, না আছে বাছুর,
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও নাহি মোর,
নাহিও তেমতি বৃষভ গোপতি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"সুদৃঢ়-নিখাত খুঁটা * কিছুতে না টলে,
নব এই মুঞ্জদাম, এমনি কঠিন
বাছুরে ছিনিতে নারে কোন রীতে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"বৃষভ বন্ধন কাটি পলায় যেমতি,
যেমতি বিহরে নাগ বিদলি লতিকা,
প্রমুক্ত উদাস, কাটি গর্ভবাস;
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

* * * *

উচ্চনীচ সর্ব্বস্থল করিয়া প্লাবন
মহামেঘ বরষিল উঠিয়া তখন;
দেখিয়া ধনিয়া, বিগলিত হিয়া,
বুদ্ধদেবে এই ভাবে করে নিবেদন:—

ধনিয়া।

"সামান্য এ লাভ নহে, ওহে ভগবন্,
পাইনু যে ইথে মোরা তব দরশন;
রাখ হে সুগতে, শরণ-আগতে,
ও পদ-আশ্রয় আজি দেহ মহামুনি।

"আমি ও গৃহিণী মম ধরি ও চরণ
ব্রহ্মচর্য্য আচরিব করিলাম পণ;
জনম মরণ কাটায়ে বন্ধন
তরি যাব, হবে সব দুঃখ বিমোচন।"

পাপবুদ্ধি মার।*

"পুত্রবান্ পুত্রলাভে হয় পুলকিত,
গোপাল গোধনলাভে তেমনি হর্ষিত;
আসক্তি হইতে হয় নরের নন্দন,
'অনাসক্ত' নিরানন্দে কাটায় জীবন।"

বুদ্ধদেব।

"পুত্রবান্ পুত্রশোকে সদাই কাতর,
গোপাল গোধনতরে ব্যথিত অন্তর;
আসক্তিই মানবের দুঃখের কারণ,
অনাসক্ত জনে দুঃখ না হয় কখন।"

চক্ষু ও আলোক।

আলোক বাহির হইতে আসিয়া অক্ষি-যবনিকার উপর পড়িলে, তাহার অংশবিশেষকে নানাপ্রকারে উত্তেজিত করে, এবং ইহার ফলে বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এ সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত সিদ্ধান্তের কথা আমরা গত আষাঢ় মাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" আলোক ও বর্ণজ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আলোকের শক্তি কি প্রকারে দৃষ্টিনাড়ীকে (Optic nerve) উত্তেজিত করে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

---

* খুঁটা।

* ধনিয়া সুত্তের শেষ দুই চরণ এই—

মারো পাপিমাঃ।

"নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি;
উপধীহি নরস্স নন্দনা,
নহি সো নন্দতি যো নিরুপধী।"

ভগবাঃ।

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি;
উপধীহি নরস্স সোচনা,
নহি সো সোচতি যো নিরুপধীতি।"

উপধী—আসক্তি
নিরুপধী—অনাসক্ত

অক্ষিযবনিকার (Retina) গঠন পরীক্ষা করিলে, ইহাতে কতকগুলি কোষ পর পর সজ্জিত দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বে যে দণ্ড ও মোচাকার (Rods and Cones) কোষের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ স্তরমালার সর্ব্বোপরি সেগুলি বিন্যস্ত থাকে। কাজেই ইহাদেরই উপরে সর্ব্বাগ্রে আলোকপাত হয়, এবং আলোকের কাজও ইহাদেরই উপর দিয়া সুরু হয়।

বাহিরের শক্তি প্রাণিকোষের উপর কার্য্য করিয়া কি ফল উৎপন্ন করে, আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং আলোক প্রাপ্ত হইলে দেহের অপর কোষগুলি যে-প্রকারে কার্য্য করে, অক্ষিকোষগুলিও যে সেই প্রকারে কার্য্য করিবে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্ এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

দেহের নানা অংশের কার্য্য পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, কোষস্থিত জীবসামগ্রী (Protoplasm) উত্তেজনা পাইলে আপনা-হইতেই এক এক প্রকার রস নির্গত করিতে থাকে। এই রসগুলি ইংরাজিতে (Ferments) নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এ গুলিকে কিণ্ব বলা যাইতে পারে। এই রসনির্গমন জীবসামগ্রীর (Protoplasm) সজীবতার একটা প্রধান লক্ষণ। কিণ্বসকল জীব-দেহে সঞ্চিত হইলে, কখনই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকে না। ইহাদের প্রত্যেকেই দেহের ভিতরে এক একটা রাসয়নিক কার্য্য সুরু করিয়া দেয়, এবং ইহার ফলে অবস্থা-বিশেষে দেহের ক্ষয় বা গঠনকার্য্য চলিতে আরম্ভ করে। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ জীবসামগ্রী হইতে সঞ্চিত নানা প্রকার কিণ্বের এই ক্ষয় ও সংগঠন কার্য্য (Kata. bolic and anabolic) অবলম্বন করিয়াই দেহতত্ত্বের অনেক সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন।

উদাহরণ লওয়া যাউক। পাকাশয়স্থ কোষের (Gastric cells) কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এগুলি হইতে পেপ্সিন্ (Pepsin) নামক একপ্রকার রস উত্তেজনা পাইলেই নির্গত হয়। উদরস্থ খাদ্যের প্রটিড্ (Proteid) নামক অংশের সহিত মিশিয়া ইহা রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়, এবং ইহার ফলে প্রটিড্ পিপ্-টোনে (Peptone) পরিণত হইয়া পড়ে। প্রটিড্ জিনিসটা উদ্ভিজ্জ খাদ্যমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। রক্ত এবং পেশার ইহা একটি প্রধান উপাদান। পাকাশয়ের নিকটে ক্লোম (Pancreas) নামক একটি অংশ আছে। ইহারও কোষগুলি হইতে একপ্রকার রসনির্গমন দেখা গিয়াছে। ইহা উদরস্থ দ্রব্যের শ্বেতসারের সহিত মিশিয়া, তাহাকে চিনিতে পরিণত করে, এবং এই সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ও স্নায়বিক শক্তিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, প্রাণিদেহের অপর অংশের কোষগুলি যেমন নানা জাতীয় কিণ্ব নির্গত করিয়া জীবনের কার্য্য করিতে থাকে, সম্ভবতঃ অক্ষিযবনিকার কোষগুলির উপরে আলোক পড়িলে, সেই প্রকার কোন কিণ্ব আপনা হইতেই নির্গত হয়; এবং ইহাই অবস্থা-বিশেষে ক্ষয় বা সংগঠন কার্য্য সুরু করিয়া দৃষ্টিনাড়ীকে উত্তেজিত করে।

অক্ষিযবনিকার কোষগুলির উপর আ-লোক পড়িলে যে সত্যই ঐপ্রকার কার্য্য হয়, সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ওয়ালার (Waller) সাহেব তাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়াছেন। ইনি ভেকের চক্ষু কাটিয়া লইয়া

একটি তারের দুই প্রান্ত চক্ষুর সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তড়িৎমাপকযন্ত্র (Galvanometer) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, অতি মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ চক্ষুর পুরোভাগ হইতে পশ্চাৎদিকে চলিতেছে। ইহাই চক্ষুর স্বাভাবিক প্রবাহ। তা'র পর হঠাৎ চক্ষুর উপর আলোকপাত করায় সেই প্রবাহকেই প্রবলতর হইতে দেখা গিয়াছিল। ইহা হইতে পরীক্ষক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন আলোকের উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে চক্ষে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হয়। পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার আঘাত-উত্তেজনার প্রয়োগে চক্ষুকে অবসন্ন করিয়া আলোকপাত করিলে প্রবাহ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে আসিতে আরম্ভ করে। ডাক্তার ওয়ালার ইহাকে আলোকের ক্ষয়কার্য্যের (Katabolic Changes) অব্যর্থ লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

ডাক্তার অলচিন্ (Allchin) একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ। আলোকের শক্তি অক্ষিযবনিকার উপর পড়িলে, যে রস নির্গত হয়, তাহাকে ইনিও দৃষ্টিনাড়ীর উত্তেজনার মূল কারণ বলিয়াছেন। ইহাঁর মতে কেবল এই রসই ক্ষয় বা সংগঠন কার্য্য করিয়া রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন করে, এবং শেষে সেই শক্তিই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চক্ষুর পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণ ও স্নায়ুগুলীর নড় চড় প্রভৃতি নানা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়।

পাকাশয়ের পাকরস ও ক্লোমরসের (Amylopsin) পরিচয় আমরা জানি। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল রস প্রাণীদেহ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আলোক পাইলেই অক্ষিযবনিকার কোষসকল যে রস নির্গত করে, তাহা আজও সংগ্রহ করা হয় নাই। হেরিং সাহেব বর্ণজ্ঞান উৎপত্তির ব্যাখ্যান দিবার সময়, অক্ষিকোষের মধ্যস্থ রস বিশেষে (visual purple) কতকগুলি ধর্ম্মের আরোপ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে যে কিণ্বের (ferment উল্লেখ করিয়াছি, সম্ভবত তাহা এবং হেরিং সাহেব কল্পিত অক্ষিকোষের রস, মূলে একই জিনিস।

আলোক ও দৃষ্টিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এখন আলোক জিনিসটা কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ঈথর নামক পদার্থের ক্ষুদ্র তরঙ্গমালাই আলোকের উৎপাদক। এই তরঙ্গগুলির মধ্যে কোনটিই নিজে আলোক নয়। ইহারা যখন চক্ষে আসিয়া অক্ষিযবনিকার কোষগুলির উপর ধাক্কা দেয়, তখন কেবল আমাদেরই নিকট সেই ধাক্কা আলোক-আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লঙ্কা মরিচ নিজে কটু নয়, জিহ্বাগ্রকে স্পর্শ করিয়া সে কটুতার পরিচয় দেয়। ঈথর তরঙ্গও সেইপ্রকার নিজে আলোক নয়। অক্ষিযবনিকায় আসিয়া ধাক্কা দিয়া, কেবল আমাদেরই চক্ষুতে আলোকের প্রকাশ করে।

জল আলোড়িত হইলে, তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের তরঙ্গমালা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ঈথরের কোন অংশ নাড়া পাইলে, তাহাতে ঐ প্রকারের নানা আকারের ছোটবড় তরঙ্গ চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমাদের চক্ষু এই বিচিত্র তরঙ্গমালার সকলগুলিতে

সাড়া দেয় না। বৃহৎ এবং অতিক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি চক্ষুকে মোটেই সচেতন করিতে পারে না। কোন পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে বৃহৎ তরঙ্গগুলি তাপের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। তখন ইহারা দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হইয়া কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া পড়ে। অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির কার্য্য আরো সৃষ্টিছাড়া। দর্শনেন্দ্রিয় বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর ইহাদের কোনই প্রভাব নাই। কতকগুলি পদার্থের উপর আসিয়া পড়িলে, সেখানে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়া নিজেদের আস্তিত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ফোটগ্রাফের কাচ সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত রাখিলে, ঐ অতিক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই কাচের প্রলেপকে কালো করিয়া দেয়।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক অন্ধকার-ঘরের দীপশিখায় যেন একখণ্ড তারকে গরম করা হইতেছে। উত্তাপ পাইলেই পদার্থমাত্রেরই অণু ঘন ঘন কম্পিত হইতে আরম্ভ করে। এই কম্পন অবশ্য আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না; কিন্তু তাপ পাইলেই যে পদার্থের অণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়, তাহার শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাপের বৃদ্ধির সহিত যখন তারের অণুগুলির অতিদ্রুত কম্পন সুরু হয়, তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঈথর চঞ্চল অণুর ধাকায় কম্পিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের তরঙ্গ রচনা করিতে থাকে। স্থির জলের কোন অংশকে আলোড়িত করিলে, আলোড়নস্থানকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ছোট বড় নানা তরঙ্গ জলাশয়ের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এখানেও তারটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা ঈথরতরঙ্গ চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। তাপের পরিমাণ যখন অল্প থাকে, তারের আণবিক কম্পন খুব দ্রুত চলে না। কাজেই এই সকল কম্পনের ধাকায় যে ঈথরতরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহার আকার খুব বড় হইয়া পড়ে। এই বৃহৎ তরঙ্গগুলিই তাপতরঙ্গ। চক্ষু ইহাদের আঘাতে সাড়া দেয় না। কোন পদার্থ এই তরঙ্গগুলির ধাকা পাইলে গরম হইয়া উঠে মাত্র। তারগাছটিকে সদ্য সদ্য দীপশিখা হইতে উঠাইয়া গাত্রসংলগ্ন করিতে গেলে আমরা যে তাপ অনুভব করি, তাহা ঐ বড় বড় ঈথর-তরঙ্গগুলিরই ধাকার সংস্পর্শের ফল।

এখন মনে করা যাউক, তারগাছটিকে যেন বহুক্ষণ দীপশিখায় রাখিয়া অত্যন্ত গরম করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় ইহার অণুগুলির আর পূর্ব্বের ন্যায় ধীর কম্পন থাকিবে না। অতি দ্রুতবেগে ঘন ঘন কম্পিত হইয়া সেগুলি পার্শ্বস্থ ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা উৎপন্ন করিতে থাকিবে। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলিই আলোকোৎপাদক তরঙ্গ। ইহারাই চক্ষে আসিয়া ধাকা দিলে আলোকের উৎপত্তি হয়।

ইহার পরও তারগাছটিকে গরম করিতে থাকিলে তাহাতে যে সকল অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সে গুলিতে মোটেই আলোক উৎপাদন শক্তি দেখা যায় না, এবং অতি বৃহৎ তরঙ্গগুলির ন্যায় তাহাদের তাপোৎপাদন শক্তি থাকে না। এই সকল তরঙ্গের সংস্পর্শে আসিলে কতকগুলি জিনিসে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, কেবল তাহা দ্বারাই ইহাদের অস্তিত্ব জানা যায়।

দুইটি প্রবন্ধে চক্ষুর উপরে ঈথর তরঙ্গের যে সকল অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের কথা আলোচিত হইল, তাহা মনে করিলে চক্ষুকে একটি সুগঠিত যন্ত্র বলিয়া স্বীকার

করিতেই হয়। যান্ত্রশিল্পের উন্নতির সহিত আজ কাল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কোনটি-কেই চক্ষুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। বিধাতার নির্দ্দেশে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী যে যন্ত্রকে ধীরে ধীরে সর্ব্বাংশে কার্য্যোপ-যোগী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে চির-দিনই শত শত মানব-"বিশ্বকর্ম্মার" শিল্পচাতুর্য্যকে পরাভব করিতে থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। একজন খ্যাতনামা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাঁহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—আমাদের চক্ষু যে খুব সুব্যবস্থিত যন্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও সুব্যবস্থিত যন্ত্র আজ কাল অনেক শিল্পী নিজের হাতে প্রস্তুত করিতেছেন। কথা কয়েকটি যে কত অসার এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী বৈজ্ঞা-নিকপ্রবরের মুখে সেগুলি যে কত অশো-ভনীয় হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন। পণ্ডিতপ্রবর নিশ্চয়ই জানেন, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বিশ্বের সৌন্দর্য্য কোন ক্রমে বিশ্বের নিজস্ব নয়। তরুলতার নয়ন-স্নিগ্ধকর শ্যামলতা, ঊষার অরুণিমা এবং মেঘের বিচিত্র বর্ণলীলা, তরুলতা, ঊষা বা মেঘ কাহারও বিশেষ ধর্ম্ম নয়। ঈথর বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ প্রতিফলন করিয়াই তাহার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলে। তার পর এক চক্ষুই সেই তরঙ্গগুলিকে আশ্চর্য্যজনক বিচিত্রবর্ণে পরিণত করে। এই সকল ব্যাপার জানিয়াও যাঁহারা চক্ষুর ন্যায় এক সুব্যবস্থিত অদ্ভুত যন্ত্রকে সাধা-রণ যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া তাহার অপকৃষ্টতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ধৃষ্টতা সত্যই অমার্জ্জনীয়।

ঈথরের অন্ধ কম্পন যে যন্ত্রের সুব্যব-স্থায় বিচিত্রবর্ণের আলোকে পরিণত হইয়া সর্ব্বদা মানবমাত্রেরই আনন্দবর্দ্ধন করি-তেছে, তাহাকে বিশ্বনাথের একটি শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বলিয়া সকলকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সেখ সাদি।

মানসিক অশান্তি অপেক্ষা ইহজীবনে মনুষ্যের দুর্গতি আর কি হইতে পারে? অমূল্য সম্পদ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা সন্তোষ।

নিত্য আনুগত্য অপেক্ষা মধ্যে মধ্যে বন্ধু-সন্দর্শন প্রণয়ের ভাবকে বিবর্দ্ধিত করে। নিত্য সমুদিত রবি-কিরণ লোকের তত প্রীতিকর নহে, কিন্তু শীতের দারুণ কুজ্ঝটিকায় সূর্য্য-প্রকাশ লোকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে।

কলহপ্রিয়া স্ত্রী শান্তিময় সংসারে নরকের অশান্তি আনয়ন করে। হে ঈশ্বর! আমাকে অশান্তি, নরক ও যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।

যাঁহারা বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক হইয়াও সংসারলিপ্সু, তাঁহারা কি অপরকে পথ দেখাইতে পারেন? তাঁহা-দের জীবনে ও উপদেশে বৈষম্য থাকিলেও, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে কদাপি বিমুখ হইও না।

সাধু! পাপীর প্রতি বিমুখ হইও না, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার কর।

দস্যুহস্তে নিগ্রহ ভোগ করিয়া জনৈক সাধু বিলাপ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া অপর একজন সন্ন্যাসী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বিষণ্ণ হইও না, তোমার সন্ন্যাসের শতগ্রন্থি ছিন্নপরিচ্ছদের ভিতরে নিরাশা ও ক্ষোভের কোন স্থান নাই; নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্ণুতা চাই; তাহা না হইলে ঐ বেশ পরিত্যাগ কর। সুগভীর নদীতে লোষ্ট্র নিক্ষেপে তাহার জল কলুষিত হয় না; তুমি এক্ষণে আর অগভীর ক্ষুদ্র নদী নহ, যে সামান্য কারণে বিক্ষিপ্ত হইবে। স্মরণে রাখিও, দয়া ও সহিষ্ণুতার গুণে তোমার সকল পাপ ক্ষালিত হইবে"।

ভাই! আমাদিগকে পরিণামে ত সকলকেই ধূলা হইতে হইবে; চেষ্টা করিয়া দেখ না, যদি এখনই ধূলা (ধূলার ন্যায় বিনম্র) হইতে পার। যাহারা সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া থাকে, তাহাদের সমুন্নত মস্তক একদিন অবনত হইবেই হইবে।

ক্ষীণাকৃতি জনৈক বলিষ্ঠ পুরুষ অপরের মুখে নিজের নিন্দাবাদ শ্রবণে ক্রোধে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিলে,

অন্য এক সাধু তাহাকে বলিল, তুমি তোমার বলিষ্ঠ স্কন্ধে শত সের পরিমিত ভার সহজে ধারণ করিতে পার, আর একটী ক্ষুদ্র বাক্যের ভার বহন করিতে পার না। তোমার বাহুতে অমিত বল দেখিতেছি, তোমার মুখ হইতে সুমিষ্ট বাক্য উচ্চারিত হউক। তোমাতে যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভাব থাকে, তবে তোমার বীরত্ব কোথায়? আদমের পুত্রেরা (মনুষ্যেরা) ধূলি হইতেই বিগঠিত। তাহার দেহে যদি ধূলির মত নম্রতা না থাকে, তবে সে আর মানুষ কিসের।

একজন সাধু অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভাই! সুফি (suffi) সম্প্রদায়স্থ লোকের (মুসলমানগণের ভিতরে ধর্ম্মপ্রাণ এক সম্প্রদায়) লক্ষণ কি? সে উত্তরে বলিল, তাহাদের মধ্যে হীনতম ব্যক্তিও নিজের সুখ-দুঃখে উদাসীন থাকিয়া অপরের সেবা করে।

যিনি ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরবিমুখ শত সহস্র আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ হইতেও প্রিয়তর।

কদভ্যাস একবার অর্জ্জিত হইলে মৃত্যু ভিন্ন তাহার আর প্রতীকার কোথায়?

সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি রাজার ঘৃণা-দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ভিতর হইতে অনেক সাধু সাহসের সহিত কহিল, রাজন! আড়ম্বর বাহুল্যে আপনি শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু আনন্দ ভোগে আমরাও শ্রেষ্ঠতর; মৃত্যুতে আমরা আপনার সমান, (মৃত্যুর অন্তে) বিচার দিনে, ঈশ্বরের কৃপায়, আমাদের ভবিষ্যৎ আপনা হইতেও উজ্জ্বলতর। আপনি দেশবিজয়ী এবং প্রাচুর্য্যের ভিতরে অবস্থিত; আর আমরা এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত। কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়া নিজ সম্বল লইয়া পৃথিবী হইতে শেষ বিদায়ের দিনে আপনা হইতে অধিকতর আনন্দের সহিত আমরা যাত্রা করিতে পারিব।

ছিন্নবেণী কেশহীন সাধু তাহার আত্মাতে জীবিত —দেহে নহে। প্রকৃত সন্ন্যাসী কে—যিনি ঈশ্বরে চির-কৃতজ্ঞ, তাঁহার প্রশংসা ও পূজা নিরত, বিনম্র, সন্তুষ্ট, দানশীল, তাঁহার একত্বে, দয়াতে ও মঙ্গলস্বরূপে চিরবিশ্বাসী, সুখ দুঃখে তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল এবং সকলের প্রতি ক্ষমাবান। তোমার পরিচ্ছদ চাকচিক্যময় হইল, তাহাতে কি? তোমার অন্তরে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই, বাহ্য পরিচ্ছদ লইয়া কি হইবে; তোমার গৃহের ভিতরে ছিন্ন কন্থা-তৃণশয্যা, দ্বারদেশে মূল্যবান পর্দা টাঙ্গাইয়া কি করিবে?

প্রস্ফুটিত গোলাপের সুন্দর তোড়া; তৃণের বাঁধনে ফুলের বৃন্তগুলি বাঁধা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া একজন বলিল, তৃণ! তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা, যে তুমি গোলাপের সহিত এক আসনে বসিতে চাও?' তৃণ আক্ষেপ করিয়া বলিল মহাশয়! যাহারা প্রকৃত সাধু, তাহারা কোন অবস্থায় সঙ্গিগণকে বিস্মৃত নহেন। আমার সৌন্দর্য্য সুগন্ধ কিছুই নাই সত্য। কিন্তু গোলাপের উৎপত্তিস্থান যেখানে, সেই উদ্যানে আমি জন্মিয়াছি। আমি গোলাপের সহিত একত্রেই বর্দ্ধিত হইয়াছি। আমার নিজের কোন মূল্য নাই, তাহাতে কি! ঈশ্বরের উপরেই আমার সকল নির্ভর।

প্রভো! এ দাস বহুকাল ধরিয়া তোমার সেবা করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে এ ক্রীতদাসকে দয়া করিয়া মুক্তি দাও।

হে পৃথিবীর লোকেরা! তোমরা ঈশ্বরের পথ ধরিয়া চল। সেই দুর্ভাগ্যবান্, যে তাঁর পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়,—তাঁহার নিকটে যাইবার প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় না।

দান করিতে বিরত হইও না। দ্রাক্ষালতাকে যতই ছাঁটিয়া দিবে, ততই উহা হইতে অসংখ্য ফল বাহির হইতে থাকিবে।

নানা কথা

ভোট বাগান। হাবড়া কলিকাতার অপরপারে অবস্থিত; হাবড়ার উত্তরে সালকিয়া নামক স্থানে ভোটবাগান বলিয়া একটি স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে Waddell সাহেব প্রণীত Lassa and its mysteries, p-15, নামক গ্রন্থে আভাস মিলে। ওয়ারেন হেষ্টিংশ যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়া আইসেন, বাণিজ্য ও রাজ্য বৃদ্ধির দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি রেনেল (Rennel) সাহেবকে দিয়া সমগ্র ভারতের মানচিত্র প্রস্তুত করান। তিনি তিব্বতের সহিত সখ্য ও বাণিজ্য বন্ধন স্থাপন করিবার জন্য ১৭৭০ সালে (Bogle) বগল ও হ্যামিলটন সাহেবকে তিব্বতে প্রেরণ করেন, রংপুরে একটি বৃহৎ বাজার স্থাপন করেন এবং তিব্বতীয় ব্যবসায়ীগণের ব্যবহার জন্য হাবড়ার অদূরে উদ্যানের ভিতরে একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করান। বগল সাহেবের বন্ধু তাসিলহুম্পুর প্রধান লামা (Grand Lama of Tashilhumpo) কর্ত্তৃক প্রেরিত কতকগুলি তিব্বতীয় পুস্তক ও দেবমূর্ত্তি ঐ মন্দির মধ্যে রক্ষিত

হয়। ১৭৭২ সালে ভুটিয়ারা কুচবিহার অধিকার করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া চলিয়া গেলে ইংরাজ সৈন্ত অচিরে কুচবিহার প্রদেশ শত্রু হস্ত হইতে পুনরধিকার করে, অধিকন্তু ভোটগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু প্রধান লামার অনুরোধ আসিয়া পড়ায় ওয়ারেন হেষ্টিংশ সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তৎসত্বেও তিব্বতের সহিত সখ্য ও অবাধ বাণিজ্যের আশা ভবিষ্যতে ফলবতী হয় নাই। ক্রমে ঐ উদ্যানস্থ মন্দির জীর্ণ হইয়া আসিলে উহার পূর্ব্ব ইতিহাস লোকে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া যায়। ১৮৮৭ সালে ঐ মন্দিরের ও উদ্যানের কথা পুনরুত্থাপিত হইলে দেখা যায়, পুস্তকাদি সমন্বিত তিব্বতীয় দেবমূর্ত্তি হিন্দুর দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে! যে স্থানে ঐ মন্দিরাদি স্থাপিত ছিল, তাহাই ভোটবাগান বলিয়া বর্ত্তমানে খ্যাত।

ভাষার উপর শীতের প্রভাব।—Waddell সাহেব বিগত তিব্বত যুদ্ধে লাসা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি জনৈক সরকারি ডাক্তার। তাঁহার তিব্বত অভিযানের বিবরণ সমধিক গবেষণা পূর্ণ। তিনি তিব্বতের ভীষণ শীতের প্রকোপ সহ্য করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা ও ভূরি দর্শনফলে অধিকন্তু তিব্বতীয় ও উত্তরমেরুর সন্নিকটস্থ রুষীয়-ভাষা আলোচনায় বলিতে চান, যে প্রচণ্ড শীতপ্রধান দেশের ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তত্তৎ দেশীয় লোকেরা মুখ না চাপিয়া কথা কহিতে পারে না। মুখ একটু বেশী উন্মুক্ত করিয়া কথা কহিলে নিদারুণ শীতল বায়ু মুখের ভিতরে প্রবেশ করে এবং দন্ত ও মুখবিবরকে সমধিক যাতনা দেয়। কাজেই ঐ সকল দেশের ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে হইলে অধর ওষ্ঠ ও মুখগহ্বরকে যে অধিক প্রসারিত করিতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। Lassa its mysteries. P. 144. Third Edition.

স্বদেশী—এদেশে কার্পাসজাত বস্ত্রের দিন দিন আধিক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৯০১।২ ভারতের বিভিন্ন কলে প্রায় ৩৯॥০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯০৭।৮ সালে উহা ৬৫ কোটী গজে দাঁড়াইয়াছে। ধুতির পরিমাণও প্রায় ১০ কোটী হইতে ১৭ কোটী গজে পৌঁছিয়াছে।

মধু।—বিজ্ঞানযন্ত্রের সাহায্যে দেশের উৎপন্ন সামগ্রীকে যে প্রকারে সম্প্রসারিত ও সুলভ করিয়া তুলিতে হয় এবং তদ্বারা স্বদেশকে যে প্রকারে ঐশ্বর্য্যশালী করা যায়, বর্ত্তমান ইউরোপ ও মার্কিন প্রদেশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভারতের প্রকৃতি আমাদের অনুকূল বলিতে কি উর্ব্বরশক্তিমূলক এই প্রকৃতির অনুগ্রহই আমাদিগকে অলস করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষিজাত অন্যান্য সামগ্রী ছাড়িয়া দিয়া মধু সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। ভারতে অরণ্যের অভাব নাই, ফুল কুসুমেরও অসদ্ভাব নাই। দেশের বিভিন্ন স্থানের স্বভাবজাত মধু সংগ্রহ করিয়াই আমরা পরিতৃপ্ত। কিন্তু এদেশে যাহা এক প্রকার অনায়াস-জাত, বিলাতে তাহা শ্রমজ পণ্য। "কৃষক" নামক একখানি বাঙ্গালা সুন্দর মাসিক পত্র বলেন, যে আমেরিকায় এমন অনেক লোক আছে, মধুচাষই যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। তথাকার বৃহৎ বৃহৎ মক্ষিকাশালায় শত শত কৃত্রিম মধুচক্রে অসংখ্য মধুমক্ষিকা পরিপুষ্ট হইতেছে এবং ঐ সমস্ত মধুচক্র হইতে সমধিক পরিমাণে মধু সংগ্রহ হইতেছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিনে একটিও মক্ষিকাশালা ছিল না। কিন্তু আজ কাল তিন লক্ষ লোক ঐ চাষে নিযুক্ত; ১১০টি সমিতি, ৪ খানি সাময়িক পত্র, মধুচক্র ও তাহার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের ১৫টি বাষ্পীয় কারখানা চলিতেছে ও তাহার ফলে প্রতিবৎসর দুই কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার মধু ও মোম উৎপন্ন ও বিক্রীত হইতেছে। ভারতীয় মক্ষিকা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মক্ষিকা নহে, অথচ ভারতের লোক এই ব্যবসার সন্ধান পাইয়াও নিশ্চেষ্ট।

ভারতের দৈন্য।—প্রবুদ্ধ-ভারতের বিগত যে সংখ্যায় প্রকাশ যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক অধিবাসীর গড় বার্ষিক আয় দুই পাউণ্ড মাত্র। (ডিগ্‌বির মতে এক পাউণ্ড পাঁচ সিলিং দেড় পেন্স)। কিন্তু রুসিয়ার প্রতি অধিবাসীর বার্ষিক আয় গড়ে এগার পাউণ্ড, জর্ম্মানির বাইস পাউণ্ড, ফ্রান্সের সাতাইস পাউণ্ড, আমেরিকার উনচল্লিশ পাউণ্ড, ইংলণ্ডের বিয়াল্লিশ পাউণ্ড।

ধর্ম্মপ্রচার।—ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে যে কি প্রকার অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন, খৃষ্টীয়-সমাজ তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল। Christian Life এর ৯ই মে সংখ্যায় প্রকাশ, যে ১৮০৭ সালে চীন দেশে একজনও প্রটেষ্টাণ্ট চীন-খৃষ্টান ছিল না। কিন্তু ১৮৮০ সালে তাহাদের সংখ্যা ৩০০ এবং ১৯০০ সালে নব্বুই সহস্র হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ নব্বুই হাজার হইয়া পড়িয়াছে। ধন্য উদ্যম ও চেষ্টা।

বিধবাবিবাহ। গত ১৯শে আষাঢ় লাহোরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার লালা রোসনলাল মহাশয়ের গৃহে আর্য্যসমাজের সভাসদ লালা গোপিমলের বিধবা-কন্যার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের নাম লালা দেবীদয়াল, বি এ। ফেরোজপুর আর্য্যসমাজের উচ্চ বিদ্যালয়ের তিন প্রধান শিক্ষক।

দুর্ভিক্ষসভা। গত ১৩ই বৈশাখ মিরটের সুপ্রসিদ্ধ উকিল লালা সীতারাম মহাশয়ের নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ অকাল-সেবক নামে এক সভার অধিবেশন হয়। অনেকগুলি শিক্ষিত যুবক সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হন ও প্রতি পল্লী হইতে তাঁহাদিগের যত্নে এই মহদুদ্দেশ্যে ভিক্ষা সংগ্রহ হয়। ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩১০৮০ সংগৃহীত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ভিক্ষাদান করিয়াছেন।

সাহায্য। ভারত-দুর্ভিক্ষ-নিবারণ দাতব্য-ফণ্ড আবার যুক্ত ও মধ্য-প্রদেশ এবং মধ্য-ভারতের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন।

অনাথাশ্রম। বোম্বাই প্রদেশে পুনা সহরের নিকটবর্ত্তী গান্ধারপুর নামকস্থানে কতিপয় স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র লোক মিলিত হইয়া একটি হিন্দু অনাথ-বালক-বালিকাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। রাও বাহাদুর খারে রাব্‌জী ভোস্‌লে ইহার অধ্যক্ষ এবং বোম্বাই-গভর্ণর পৃষ্ঠ-পোষক মনোনীত হইয়াছেন।

মঠ। স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সম্প্রতি মুরশিদাবাদ অবস্থানকালে বহরমপুর ডিষ্ট্রীক্টের লালবাগ সব্‌ডিবিসনের গঙ্গাতীরবর্ত্তী বারনগর গ্রামে কতিপয় বৈষ্ণব-মন্দির ও মঠের ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। খোদিত প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায়, যে অপেক্ষাকৃত বড় ও পুরাতন মঠটি প্রভু গৌরাঙ্গের সময়ে এবং অপরগুলি তাঁহার তিরোভাবের চল্লিশ বৎসর পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশে এক সময়ে রামদাস ভারতীর স্থাপিত বৈষ্ণব-বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। মঠগুলির প্রাচীর দালান ও কয়েকটি প্রকোষ্ঠ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভিতরের দেওয়ালগুলি বৈষ্ণবসাহিত্যকথিত স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তিতে অঙ্কিত। স্বামীজি তাঁহার এই কৌতুহলপূর্ণ আবিষ্কারের বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, চৈত্র মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৯৬৸৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭১৫৸৵৩
সমষ্টি	...	৩১১২৸/৯
ব্যয়	...	৩৯৫৷৵৬
স্থিত	...	২৭১৭৷৶৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
অদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১১৭৷৶৩

২৭১৭৷৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০০৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে
প্রাপ্ত মাসিক দান

২০০৲

তত্ত্ববোধিনা পত্রিকা	...	১৫৲
পুস্তকালয়	...	২০৸/৬
যন্ত্রালয়	...	১৫৬॥০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৪॥৵০
সমষ্টি	...	৩৯৬৸৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৪৷৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩১৸/৩
পুস্তকালয়	...	৫৷৶০
যন্ত্রালয়	...	১৫২॥/৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১১ ৶৩
সমষ্টি	...	৩৯৫৷৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

মার্কস্ অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১। তোমার প্রত্যেক কার্য্যের যেন একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে, এবং যে কার্য্য করিবে, ঐ জাতীয় কার্য্যের পক্ষে যেন উহা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়।

২। কেহ কেহ বিজনবাসের জন্য, জনশূন্য পল্লীপ্রদেশে, সমুদ্র-তীরে, কিংবা পর্ব্বতে গমন করিয়া থাকে; এবং তুমিও এইরূপ করিবে বলিয়া অনেক সময় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক; কিন্তু আসলে ইহা একটা মনের খেয়াল বই আর কিছুই নহে। কেন না, তুমি ইচ্ছা করিলেই তোমার অন্তরের নিভৃত দেশে গিয়া বিশ্রাম করিতে পার। তোমার চিন্তাগুলি যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে মনের শান্তি রক্ষিত হইতে পারে, মন সুব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার মন অপেক্ষা জন-কোলাহলশূন্য বিজন স্থান আর কোথাও নাই। অতএব, নিভৃত মন-আশ্রমে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধনা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা; এবং এই উদ্দেশ্যে, কতকগুলি ভাল ভাল তত্ত্বকথা তোমার বিজনবাসের সম্বল করিয়া রাখিবে। একটা দৃষ্টান্ত; কিসে তোমার মন উদ্বেজিত হইয়াছে?—সংসারের শঠতায়। ইহাই যদি তোমার উদ্বেগের কারণ হয়—তোমার বিষহারী ঔষধটা ত তোমার নিকটেই আছে। ইহাই বিবেচনা করিবে, পরস্পরের হিতের জন্যই, জ্ঞান-প্রধান জীবদিগের সৃষ্টি, ক্ষমা ন্যায়েরই একটা অংশ, এবং লোকে যে অন্যায় কার্য্য করে, সে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, কত লোক কলহ-বিবাদে, সন্দেহ ও শত্রুতায় তাহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছে; কিন্তু এখন তাহারা কোথায়?—তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে। অতএব শান্ত হও, চিত্তকে আর বিচলিত করিও না। জগতের বর্ত্তমান ব্যবস্থাটা তোমার ভাল না-ও লাগিতে পারে। বিকল্পে অন্য ব্যবস্থা কি হইতে পারে, একবার ভাবিয়া দেখ:—হয় একজন বিধাতা, নয় কতকগুলা পরমাণু জগৎকে শাসন করিতেছে। জগৎ যে একটা সুব্যবস্থিত

নগরের মত শাসিত হইতেছে, তাহার কি অসংখ্য প্রমাণ এখনও পাও নাই ? তোমার শরীরের অসুস্থতাবশতঃ তুমি কি কষ্ট পাইতেছ ? যদি তোমার অন্তরাত্মা স্বকীয় শক্তি ও অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে, তবে ইন্দ্রিয়-প্রবাহ অবাধে চলিতেছে, কি বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে তোমার আইসে-যায় কি ? তাহার পর, সুখ দুঃখের গূঢ় তত্ত্বটা একবার ভাবিয়া দেখ। তবে কি যশের জন্য তোমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে ? তাহা যদি হইয়া থাকে, মনে করিয়া দেখ, পৃথিবীর জিনিস কত শীঘ্র অন্তর্হিত হয়—লোকে সে সমস্ত কত শীঘ্র ভুলিয়া যায়। মধ্যে অনন্তকাল, তাহার দুই পার্শ্বে বিস্মৃতির অতলস্পর্শ। লোক-প্রশংসা ! মনে করিয়া দেখ, উহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, অল্পকাল স্থায়ী, অল্প পরিসরের মধ্যে বদ্ধ, এবং যাহাদের প্রশংসা চাহিতেছ, তাহারাও কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি। সমস্ত পৃথিবী একটি বিন্দুমাত্র ; এই বিন্দুর মধ্যে আবার তোমার বাসস্থানটি কি ক্ষুদ্র, এবং সংখ্যা ও যোগ্যতায় তোমার ভক্তবৃন্দও কি অকিঞ্চিৎকর। মোদ্দা কথা,—বিশ্রামের জন্য, আপনার ক্ষুদ্র অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিতে ভুলিও না। মানুষের মত, স্বাধীন জীবের মত, স্বাধীনভাবে সহজভাবে সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখ ; ইহার মধ্যে কোন যুঝাযুঝির ভাব নাই। তোমার অন্য পুঁজির মধ্যে এই দুইটি বীজমন্ত্রও যেন তোমার সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকে :—প্রথম,কোন বহির্বিষয় অন্তরাত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না ; বহির্বিষয়গুলা বাহিরেই অচলভাবে অবস্থিতি করে ; চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ আত্মার অন্তর হইতেই—অন্তরের ভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়, কাল-যবনিকা এখনি পতিত হইবে, বর্ত্তমান দৃশ্যটি একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। তোমার জীবনের মধ্যে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তুমিত তাহা দেখিয়াছ। এক কথায়, জগতের সমস্তই শুধু রূপান্তর-পরম্পরা, জীবনটা অন্তরের ভাব বই আর কিছুই নহে।

৩। যদি বুদ্ধিবৃত্তিটা আমাদের সকলেরই সাধারণ-সামগ্রী হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তির হেতু যে প্রজ্ঞা, তাহাও অবশ্য আমাদের সাধারণ জিনিস হইবে ; এবং আর-একটা বুদ্ধি, যাহা বিধি-নিষেধের দ্বারা আমাদের আচরণকে নিয়মিত করে, সেই বিবেকবুদ্ধিও আমাদের সাধারণ সম্পত্তি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, সমস্ত মানবজাতিই একটা সাধারণ নিয়মের অধীন; তাহা যদি হইল, তবে সমস্ত জাতিই এক রাষ্ট্রের অধীন,সকলেই এক রাজ্যের প্রজা।

৪। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই প্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। জীবন, যে সকল উপাদানকে একত্র সম্মিলিত করে, মৃত্যু সেইগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেয়—বিলীন করিয়া দেয়। অতএব ইহাতে এমন কিছুই নাই—যাহাতে মানুষ লজ্জা পাইতে পারে ;—এমন কিছুই নাই—যাহা জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং মানব-প্রকৃতির পরিকল্পনার বিরুদ্ধ।

৫। আচরণ ও মনের ভাব প্রায় একই জিনিস্ বলিলেই হয়। অমুক প্রকৃতির লোকের অমুক প্রকার আচরণ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে যদি আশ্চর্য্য হও, তাহা হইলে, ডুমুর গাছ রসদান করে বলিয়াও তুমি আশ্চর্য্য হইবে। এটা যেন মনে থাকে, তুমি ও তোমার শত্রু উভয়ই মরিয়া পড়িবে ; এবং শীঘ্রই তোমাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

৬। তুমি ব্যথিত হইয়াছ বলিয়া মনে করিও না—তাহা হইলেই তোমার ব্যাথা চলিয়া যাইবে। ব্যাথা জানাইও না, দেখিবে তোমার ব্যথা আর নাই।

৭। যাহাতে মনুষ্যত্বের হীনতা হয়, তাহাতেই মানুষের প্রকৃত হীনতা। তা ছাড়া,—কি বাহিরে, কি অন্তরে,—মানুষের আর কোন অনিষ্টের কারণ নাই।

৮। এই দুইটি মূলমন্ত্র যেন তোমার জীবনের নিয়ামক হয়ঃ—প্রথমতঃ, তোমার অন্তরে যিনি নিয়ন্তারূপে, অধিপতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন,সেই বিবেকের আদেশ ও উপদেশ ছাড়া তুমি কোন কাজ করিবে না; যাহা মনুষ্যের পক্ষে হিতজনক, সেই কাজই করিবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি তোমার কোন বন্ধু তোমার মত-পরিবর্ত্তনের পক্ষে উৎকৃষ্ট হেতু দেখাইতে পারেন,তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মত পরিবর্ত্তন করিবে। সাধারণের হিত ও ন্যায়ধর্ম্মের খাতিরেই তুমি তোমার মত পরিবর্ত্তন করিতে পার, তোমার খেয়াল অনুসারে, কিংবা যশের জন্য মত পরিবর্ত্তন করিবে না।

৯। এখন তোমার প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে রহিয়াছে, ব্যষ্টিভাবে রহিয়াছে; শীঘ্রই উহা সমষ্টির মধ্যে মিশাইয়া যাইবে;—যে বিশ্ব-প্রজ্ঞা হইতে তুমি জন্মলাভ করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আবার প্রবেশ করিবে।

১০। জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলিতে আরম্ভ কর;—এখন যাহারা তোমাকে বানর বলিয়া, পশু বলিয়া, অবজ্ঞা করিতেছে, তাহারাই আবার তোমাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে।

১১। দশ হাজার বৎসর যেন তুমি অনায়াসে অপব্যয় করিতে পার, এরূপভাবে কোন কাজ করিও না। মৃত্যু তোমার শিয়রে বসিয়া আছে। জীবন থাকিতে থাকিতেই একটা কিছু ভাল কাজ কর, এবং তাহা তুমি অনায়াসেই করিতে পার।

১২। যে পরছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া, পরচর্চ্চা না করিয়া, কিসে আপনি ভাল হইবে, সৎ হইবে, সেই উদ্দেশে আপনার প্রতিই তাহার সমস্ত অন্তর্দৃষ্টি নিয়োগ করে, সে ব্যক্তি কতটা সময় হাতে পায়, তাহার কাজ কত সহজ হইয়া পড়ে।

১৩। আমি মরিয়া গেলে, আমার কথা লইয়া সকলেই বলাবলি করিবে,—এই মনে করিয়া যাহারা আপনার স্মৃতির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তাহারা ভাবে না, তাহার পরিচিত লোক সকলই চলিয়া যাইবে। বংশপরম্পরাক্রমে তাহার যশ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকিবে; পর পর বংশ, যাহারা নিজেই যশের প্রার্থী, তাহারা পূর্ব্ববংশীয় লোকের যশকে লাঘব করিবে, এইরূপে সেই যশ একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। আচ্ছা, মানিলাম তোমার স্মৃতি অমর, তোমার ভক্ত লোকেরা অমর; কিন্তু তাহাদের প্রশংসায় তোমার কি লাভ? তোমার মৃত্যুর উত্তর-কালের কথা বলিতেছি না, মনে কর—তুমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই যদি খুব প্রশংসা পাও, সে প্রশংসায় যদি সাধারণের কোন হিত না হয়, তাহা হইলে সে প্রশংসার মূল্য কি?

১৪। যাহা কিছু ভাল, তাহা স্বতই ভাল; সে ভাল গুণ সে নিজের স্বরূপ হইতেই পাইয়াছে; লোকের প্রশংসা তাহার কোন অংশ নহে। অতএব শুধু প্রসংসিত হইয়াছে বলিয়া কোন জিনিস ভালও নহে, মন্দও নহে। ন্যায়, সত্য, সুশীলতা, সংযম—এই সমস্ত জিনিস কোন প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ যদি মাণিকের

গুণ কীর্ত্তন না করিয়া নীরব থাকে, তাহাতে মাণিকের উজ্জ্বলতার কি কিছু মাত্র লাঘব হয় ?

১৫। যদি মৃত্যুর পরেও মানব-আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে অনন্তকাল হইতে যে সকল আত্মা ক্রমাগত ইহ-লোক হইতে অপসৃত হইতেছে, তাহাদের জন্য আকাশে কি স্থান হইবে? ভাল, আমি জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে যে এত লোক কবরস্থ হইতেছে তাহাদের জন্য কি স্থান হইতেছে না? প্রত্যেক শব কিছুকাল থাকিয়া পরিবর্ত্তিত ও বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহার স্থান আবার অন্য শব আসিয়া অধিকার করিতেছে; সেইরূপ যখন কোন মানুষ মরে, তাহার মুক্ত-আত্মা আকাশে চলিয়া যায়, তখন সে কিছুকাল সেই ভাবে থাকিয়া আবার পরিবর্ত্তিত হয়, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, অনলশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়; অথবা বিশ্বের প্রজননী-শক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা পর-পর অন্য আত্মার জন্য স্থান ছাড়িয়া দেয়।

১৬। উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিও না; তোমার উদ্দেশ্য যেন সৎ হয়, তোমার বিশ্বাস যেন ধ্রুব হয়।

১৭। হে বিশ্বপ্রকৃতি! তোমার যাহা প্রীতিকর, আমার নিকটেও তাহাই প্রীতিকর। তুমি যাহা সময়োচিত বলিয়া মনে কর, আমি তাহা বেশী শীঘ্র আসিয়াছে, কিংবা বেশী বিলম্বে আসিয়াছে বলিয়া মনে করি না। হে বিশ্বপ্রকৃতি! তোমার ঋতুরা যে সব ফল আনয়ন করে, তাহাই আমার পক্ষে উপাদেয়। তোমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তোমাতেই স্থিতি করে, এবং তোমাতেই পুনর্ব্বার প্রবেশ করে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

দ্বিতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ন্যায় অধিকার-বুদ্ধি সম্বন্ধেও, স্বার্থনীতি কোন সন্তোষ-জনক হিসাব দিতে পারে না। কেন না, কর্ত্তব্য ও অধিকার পরস্পরের সহিত অনুস্যূত।

শক্তি ও অধিকারকে একত্র মিশাইয়া ফেলিলে চলিবে না। কোন সত্তা ঝটিকার ন্যায়, বজ্রের ন্যায়, কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় শক্তিমান্ হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহার স্বাধীনতা না থাকে, তবে সে একটা ভীষণ জিনিস মাত্র, ব্যক্তি নহে;—উহা অল্লাধিক পরিমাণে আমাদের ভয় ও আশার উদ্রেক করিতে পারে; কিন্তু সে আমাদের ভক্তির অধিকারী নহে; তাহার প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও অধিকার বুদ্ধি—ইহারা দুই ভাই। স্বাধীনতাই উহাদের সাধারণ জননী। একই দিনে উহাদের জন্ম, একসঙ্গে উহাদের বৃদ্ধি, এক সঙ্গে উহাদের মরণ। এমন কি, এরূপও বলা যাইতে পারে, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য ও আমার নিজের অধিকার একই জিনিস,—কেবল উহাদের মুখ, দুই বিভিন্ন দিকে। আমি যদি তোমার নিকট হইতে ভক্তিলাভের অধিকারী হই—প্রকারান্তরে কি এই কথাই বলা হইতেছে না, যে আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য, কেননা, আমি এক জন স্বাধীন ব্যক্তি? কিন্তু তুমিও একজন স্বাধীন ব্যক্তি; অতএব আমার অধিকারের ও তোমার কর্ত্তব্যের ভিত্তি একই ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে।

একমাত্র স্বাধীনতার সম্বন্ধেই সকল

মনুষ্য সমান, আর সকল বিষয়েই মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যেমন বৃক্ষের দুইটি পত্র সমান নহে, সেইরূপ কি শরীর, কি ইন্দ্রিয়াদি, কি মন, কি হৃদয়,—এই সকল বিষয়ে কোন দুইটি মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সমান নহে। কিন্তু এক ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার সহিত অন্য-ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার যে কোন পার্থ্যক্য আছে—এ কথা মনে ধারণা করাও যায় না। হয় আমি স্বাধীন, নয় আমি স্বাধীন নই। যদি আমি স্বাধীন হই, আমি তোমারই মতন সমান স্বাধীন, এবং তুমিও আমারই মতন সমান স্বাধীন। উহার কিছুমাত্র কম বেশী নহে।

এই স্বাধীনতার অধিকার সূত্রেই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত সমান নীতিমান্। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাভূমি যে ইচ্ছা, তাহা সকল মানুষের মধ্যেই সমান। এই ইচ্ছার সাধন পক্ষে—কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক—এরূপ বিভিন্ন উপায় থাকিতে পারে, এরূপ বিভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে —যাহা অসমান; কিন্তু যে সকল শক্তির সাহায্য লইয়া ইচ্ছা কাজ করে, সে সকল শক্তি স্বয়ং ইচ্ছা নহে; কেন না, সে সকল শক্তি ইচ্ছার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে। একমাত্র ইচ্ছার শক্তিই স্বাধীন শক্তি, এবং স্বরূপতঃ স্বাধীনতাই ইচ্ছার ধর্ম্ম। ইচ্ছা যদি কোন নিয়ম মানে, ত সে নিয়ম—প্রবৃত্তি-মূলক কিংবা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনামূলক নিয়ম নহে ঃ—সে নিয়ম মানসিক নিয়ম,—যেমন মনে কর, ন্যায় ধর্ম্মের নিয়ম; আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা, এই নিয়মটিকে মানে, এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানে যে, এই নিয়মটি পালন, কিংবা লঙ্ঘন করা তা'র সাধ্যায়ত্ত। ইহাই স্বাধীনতার আদর্শ এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত সাম্যেরও আদর্শ; অন্য আদর্শ একটা অলীক কথা মাত্র। এ কথা সত্য নহে যে, সমান ধনবান্, সমান বলবান্ ও সমান সুন্দর হইবার অধিকার—এক কথায়, সমানরূপে সুখভোগ করিবার, সুখী হইবার অধিকার সকলেরই আছে; কেন না, সুখ-সৌভাগ্য, ধন ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিবার উপযোগিতা সম্বন্ধে, বিভিন্ন লোকের শক্তিসমার্থ্য ও প্রকৃতির মধ্যে বহুল তারতম্য লক্ষিত হয়। ঈশ্বর, সকল বিষয়েই অসমান শক্তি-বিশিষ্ট করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলে, সমতা প্রকৃতির বিরুদ্ধ,—জগতের চিরন্তন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ; যেরূপ সৌসামঞ্জস্য ও একতা—সেইরূপ বৈষম্য ও বিচিত্রতাও সৃষ্টির নিয়ম। এইরূপ আত্যন্তিক সমতার কল্পনা করা নিতান্তই বাতুলতা। যাহাদের হৃদয় ও মন প্রকৃতিস্থ নহে, যাহারা আত্মম্ভরী, যাহারা অত্যাকাঙ্ক্ষী,—মিথ্যা সাম্য, তাহাদেরই আরাধ্য পুত্তলী। প্রকৃত সাম্য, ঈশ্বর-কৃত সমস্ত বাহ্য অসমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে না,—সে সকল অসমতা অপনীত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। গর্ব্ব ও ঈর্ষ্যার প্রচণ্ড দুশ্চেষ্টার সহিত সংগ্রাম করা—উদার স্বাধীনতার আবশ্যক হয় না। কেন না, প্রকৃত স্বাধীনতা প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষী নহে, এবং সুখ-সৌভাগ্য, রূপ-লাবণ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে কাল্পনিক সমতা লাভেরও প্রত্যাশী নহে। তা'ছাড়া, এইরূপ সমতা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, প্রকৃত স্বাধীনতার চক্ষে উহার মূল্য যৎ-সামান্য; প্রকৃত স্বাধীনতা এমন কিছু চাহে—যাহা সুখ অপেক্ষা, সৌভাগ্য অপেক্ষা, পদমর্য্যাদা অপেক্ষা বড়—তাহা সম্মাননা-বুদ্ধি; যাহা কিছু লইয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বের পবিত্র অধিকারের প্রতিই স্বাধীনতা সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহে; কেন না, কোন ব্যক্তির

ব্যক্তিত্বই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে সাম্য,—ইহা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না, কিছুরই দাবী-করে না। সম্মাননা ও ভক্তিকে যেন আমরা একসামিল করিয়া না ফেলি। প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের চরণেই আমরা ভক্তি-অঞ্জলি প্রদান করি। আমি কেবল মনুষ্যত্বকেই সম্মান করি; অর্থাৎ স্বাধীন-প্রকৃতি মনুষ্যমাত্রকেই সম্মান করি; কেন না, মানুষের মধ্যে যাহা কিছু স্বাধীন নহে, তাহার সহিত মনুষ্যত্বের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা মনুষ্যত্বের বিপরীত ধর্ম্ম। অতএব যাহা কিছু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিধান করে, ঠিক্ সেই বিষয়েই মানুষ মানুষের সমান। প্রকৃত সাম্য, এমন জিনিসের প্রতি সম্মান করিতে বলে, যাহা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান; কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি কুৎসিত কি সুন্দর, কি ধনী কি দরিদ্র, কি প্রতিভাশালী ব্যক্তি, কি সাধারণ মনুষ্য, কি স্ত্রী কি পুরুষ—যে-কেহ আপনাকে জিনিস বলিয়া নহে—পরন্তু ব্যক্তি বলিয়া জানে,—প্রকৃত সাম্য তাহাকেই সম্মান করিতে আদেশ করে। সাধারণ স্বাধীনতার প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন—ইহা, কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি অধিকার-বুদ্ধি—উভয়েরই নিয়ম; ইহা প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম ও সকলেরই নিরাপদ আশ্রয় স্থান; মনুষ্যগণের মধ্যে ইহাই আত্মমর্য্যাদা, ও ধরা-মাঝে ইহাই শান্তিরূপে বিরাজমান। এই বিষয়ে একটা আশ্চর্য্য ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহান্ ও পবিত্র স্বাধীনতার উদ্দেশেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হৃদয়, সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হৃদয়,মনুষ্যের প্রকৃত হিতকামী ব্যক্তিদিগের হৃদয় এক সময়ে বিস্পন্দিত হইয়াছিল। প্লেটোর উচ্চ কল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া, মন্টেস্ক্যুর সারবান্ চিন্তা-সমূহ পর্য্যন্ত, গ্রীসের ক্ষুদ্রতম নগরের উদার ব্যবস্থাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া, ফরাসী বিপ্লবের অবিনশ্বর "মনুষ্যের অধিকার" ঘোষণা পর্য্যন্ত—যুগযুগান্তরকালের মধ্য দিয়া,—প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র এই আদর্শকেই চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।

ইন্দ্রিয়বোধের দর্শনশাস্ত্র যে মূলতত্ত্ব হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পরিণাম যেমন অনিষ্টজনক, স্বাধীনতার মূলতত্ত্বের পরিণাম তেমনই হিতকর। ইচ্ছা ও বাসনাকে এক-সামিল করিয়া ফেলিয়া, উক্ত দর্শনতত্ত্ব প্রকারান্তরে—ঠিক্ যেটি স্বাধীনতার বিপরীত, সেই উদ্দাম প্রকৃতির সমর্থন করিয়াছে; ঐ দর্শনশাস্ত্র, সমস্ত বাসনা ও সমস্ত প্রবৃত্তির বন্ধন-শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়াছে; কল্পনা হইতে, হৃদয় হইতে, রাশরজ্জু উঠাইয়া লইয়াছে; ইহারই শিক্ষা-প্রভাবে, মানুষ প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞার দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছে, জনসমাজকে অরাজকতার দিকে, কিংবা অত্যাচার-উৎপীড়নের দিকে ক্রমাগত ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, বাসনা জন্মাইবার পর, স্বার্থ-বুদ্ধি আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়? অবশ্য, সম্পূর্ণরূপে সুখী হই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। তাহার পর, স্বার্থবুদ্ধি আসিয়া বলে, যে কোন উপায়েই হউক, (কেবল যাহাতে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা ছাড়া) সুখী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি আমি মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ হইয়া থাকি, তাহা হইলে উহার দ্বারা আমার যে সুবিধা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। যদি অদৃষ্ট-

ক্রমে আমি নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমার তেমন সুখ-সম্পদ না থাকে, যদি আমার কোন বিষয়ে তেমন কোন স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকে, অথচ যদি আমার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অসীম হয়—(কেন না, বাসনার অন্ত নাই) তখন আমি আপনাকে দুর্ভাগ্যবান্ মনে করিয়া, আমার সাংসারিক অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি, আমার মনে নানা প্রকার কল্পনার স্বপ্ন জাগিয়া উঠে ; আমি চাই, সমস্ত সংসার ওলট্‌পালট্ হইয়া যায় ; বৃথা গর্ব্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে ; অবশ্য আমি প্রচণ্ড রাষ্ট্র-নৈতিক বিপ্লব চাহি না ; কেন না, তাহা আমার স্বার্থের অনুকূল নহে। মনে কর, অশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমি সুখ-সৌভাগ্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিলাম। পূর্ব্বে স্বার্থবুদ্ধি যেমন আমাকে নানাবিধ চেষ্টা-আন্দোলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, এক্ষণে আবার যাহাতে আমি নিরাপদে থাকিতে পারি, আমার স্বার্থবুদ্ধি তাহাই চাহিতে লাগিল। এক্ষণে নিরাপদ হইবার আকাঙ্ক্ষা,—আমাকে অরাজকতার পক্ষ হইতে সুশাসনের পক্ষে আনয়ন করিল ; অবশ্য আমি সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের পক্ষ অবলম্বন করি,—শুধু উহা আমার স্বার্থের অনুকূল বলিয়াই ; এই স্বার্থ বুদ্ধির কথাতেই —আমার সাধ্য হইলে—আমি অত্যাচারী প্রভু হইতেও পারি, কোন অত্যাচারী প্রভুর স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিত দাস হইতেও পারি। অরাজকতা ও অত্যাচার, স্বাধীনতা-পথের এই যে দুই মহাবিঘ্ন, উহার প্রতিরোধের এক মাত্র দুর্গ—স্বত্বাধিকারের বিশ্বজনীন ভাব ;—উহা ভাল মন্দের প্রভেদের উপর, ন্যায় ও উপযোগিতার প্রভেদের উপর, হিতকারিতা ও মনোহারিতার প্রভেদের উপর, ধর্ম্ম ও স্বার্থের প্রভেদের উপর, ইচ্ছা ও বাসনার প্রভেদের উপর, এবং ইন্দ্রিয়-বোধ ও আত্মচৈতন্যের প্রভেদের উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

পরম পিতা।

যাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করা যায়, তিনি পিতা। যিনি অন্নদান করেন, ভয়ে ভীত হইলে, যিনি অভয়দান করেন, সেই অন্নদাতা এবং ভয়ত্রাতাকেও পিতা বলা হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যায় দীক্ষিত করিবার জন্য যিনি বিদ্যার অধিকারে উপনীত করেন, মাণবক যাঁহার চরণ-প্রান্তে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-লাভার্থ উপনীত হয়, তিনিও পিতা সাকল্যে ব্যবহারক্ষেত্রে—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনিতা চোপনীতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"

এই পাঁচটি পৃথক্ পুরুষ পিতার মহনীয় আসনে সমাসীন। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত করেন, তিনিই গরিষ্ঠ পিতা। মনু বলিয়াছেন ;—

"উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥
কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্ যদ্ যোনাবভিজায়তে॥
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্ বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাঽজরাঽমরা॥
ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ॥"

(২ অঃ, ১৪৬—১৫০)

'উৎপাদক ও ব্রহ্মদাতার মধ্যে ব্রহ্ম-দানকারী পিতাই গরীয়ান্ ; যে হেতু, জ্ঞানকাম ব্যক্তির ব্রহ্মজন্ম ইহলোক ও পর-লোক, উভয় লোকেই শাশ্বত—নিত্যস্থায়ী।

বালক যে মনুষ্যযোনিতে অভিজাত হয়,সেটা তাহার অভিব্যক্তি মাত্র। বেদপারগ আচার্য্য জগতের প্রসবকারিণী ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে তাহার যে উন্নতিরূপ জাতির উৎপাদন করেন, সেই জাতিই সত্য; কারণ, সে জাতির বার্দ্ধক্য বা মরণ নাই। অতএব ব্রাহ্ম-জন্মের কর্ত্তা, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুশাসিতা জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্ম শিশুও জ্ঞানহীন বয়োবৃদ্ধের ধর্ম্মতঃ পিতা হয়।' সেই গরিষ্ঠ-পিতা-ব্রহ্মদাতারও পিতা পর ব্রহ্ম। ব্রহ্মদাতাও একদিন ব্রহ্মজন্ম লাভের জন্য আচার্য্যের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মী-জাতি লাভ করিয়া গরিষ্ঠ হইয়াছিলেন; সুতরাং যাঁহার জ্ঞান, যাঁহার পবিত্রতা, যাঁহার মঙ্গলভাব, ও যাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিয়া, যাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বররূপে দেখিয়া আচার্য্য গরীয়ান্ হইয়াছেন, যে বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল ইচ্ছাতে মানবজন্ম ধারণ করিয়া আমাদিগের আচার্য্য হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানে ও পবিত্রতায়, মঙ্গলভাবে ও স্বতন্ত্রতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরীয়ান্ পিতা;—এই জন্য পরম-পিতা।

এই পরম-পিতাই বিশৃঙ্খলাবহুল বিশ্বসংসারের উন্মত্ত শক্তিপুঞ্জকে শাসিত করিয়া, সকল কার্য্যের অনুগামী ও কার্য্যকারী করেন বলিয়া বিশ্বনিয়ন্তা, এবং বিশ্বসংসারের প্রত্যেক কার্য্য,নিজের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রাখিয়া, সম্পাদন করান বলিয়া সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ। অতএব ইনি পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম।

যাঁহারা ঈশ্বরকে পরমপুরুষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সৃষ্টির ভাব মনে করিতে গিয়া নানা ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা প্রকৃতির অতীত স্বতন্ত্র এক পূর্ণ শক্তিকে না দেখিয়া, প্রকৃতির রাজ্য হইতে সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন, বীজ হইতে যেমন ব্রীহিযবাদি-বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; সেইরূপ ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর বাধ্য হইয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া, ঈশ্বর ও জগৎকে এক করিয়া ফেলেন।

অনেকে জগৎ-কারণকে এক অন্ধ শক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন।

তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মের বিশেষ মতভেদ আছে। ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের সেই সকল কল্পিত মতের অনুমোদন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে অন্যপ্রকার উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম, এক অন্ধ দৈব শক্তিকে জগতের আদিকারণ বলেন না; কিন্তু এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছা, জগৎ-সৃষ্টির মূলে দেদীপ্যমান দেখেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, বহু হইব—প্রজাত হইব। ঈক্ষণ করা এবং জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বের প্রেরণায় মঙ্গলময় ইচ্ছা করা—একই কথা। যেখানে জ্ঞান নাই, কর্ত্তৃত্বের তীব্র তাড়না নাই, সেখানে মঙ্গলময়ী মহদিচ্ছাও নাই। অজ্ঞানের ঘন অন্ধকারে মঙ্গলের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় না; প্রমত্তের অশুভ ইচ্ছা বিকশিত হইতে পারে।—সেইরূপ কর্ত্তৃত্বের উদ্দাম প্রেরণাও যেখানে নাই, সেখানেই বা ইচ্ছার মঙ্গলভাব কিরূপে উপলব্ধি করা যাইবে? উন্মত্তের যাদৃচ্ছিক প্রেরণায় কোথাও কি মঙ্গলময় ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়? সুতরাং সেই মহান্ পুরুষের সৎ-ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব এবং মঙ্গল-ভাব, এসকলই আছে। অতএব বলিতে হয়, সেই স্বতন্ত্র-শক্তি, সেই পরম-পুরুষ, সেই জীবন্ত ঈশ্বরই পরম কারণ।

তিনি বাধ্য হইয়া এ জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু অপর কাহারও সাহায্য ব্যতীত, আপন ইচ্ছায়, আপন মঙ্গলভাবে, এই সমস্ত রচনা করিয়া আপন কর্ত্তৃত্বের দায়িত্বভার লাঘব করিয়াছেন।

তিনি অন্য কাহারও দ্বারা নিয়মিত হন নাই; কিন্তু আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়া দ্বারাই এই সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।" তাঁহার প্রখর জ্ঞান, তাঁহার অপ্রতিহত বল বীর্য্য, এবং অব্যভিচরিত ক্রিয়া তাঁহার স্বভাবানুগত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অমিতবল এবং ক্রিয়াযোগী বা সর্ব্বকর্ম্মক্ষম; এই জন্য তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা কখনই বিঘ্নবিহত বা নিষ্ফল হয় না।

তিনি আলোচনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আলোচনা করিয়াই তাঁহার মঙ্গলভাব সম্পন্ন করিতে সকলকে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল-নিয়মে সকলেই নিয়মিত হইয়া, তাঁহারই মঙ্গলময় শাসনের প্রচার করিতেছে। সূর্য্য তাঁহারই মঙ্গলময় আদেশে, তাঁহার মঙ্গলময় ভাবের আলোচনা করিয়া, প্রত্যহ তাঁহারই সৃষ্টির মঙ্গলভাব সম্পন্ন করিতেছে; তাঁহার মঙ্গল-শাসন অতিক্রম করিতে না পারিয়া, মঙ্গলময় নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। তাঁহার স্নেহসুধার আধার ঐ চন্দ্র, ওষধির পোষণ করিতেছে; তাঁহার সদিচ্ছার কণামাত্র আভাস পাইয়া এই বায়ু, মঙ্গলময় প্রাণের বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত; তাঁহার প্রেমতরঙ্গিণীর ক্ষুদ্র একটা ঊর্ম্মির অনুসন্ধান পাইয়া, তাঁহার প্রেমে দ্রবীভূত ঐ বরুণ, মঙ্গলময় জীবনের অবাধ-প্রসারণকারী। জগতের মঙ্গল আলোচনায় জগৎ অন্যমনস্ক; কখনই সেই পরম-পিতার মঙ্গলময় আদেশের প্রতিকূল হইবার ইচ্ছাও করে না। যে যখনই তাঁহার মঙ্গলময় আদেশের আলোচনায় বহির্ম্মুখ হয়, পরম পিতা তখনই তাহার নিকটে "মহদ্ভয়ং বজ্রমিব" মহদ্ভয় বজ্রের ন্যায় আবির্ভূত হন। তলবকারোপনিষদে দেখিতে পাই,—ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ আদি দেবতাগণ দেবাসুর-সংগ্রামে পরমপিতার ইঙ্গিতে জয়লাভ করিয়া, সে মহিমা তাঁহাদিগেরই, পরম-পিতার মঙ্গলময় ইচ্ছার মহিমায় নহে, ভাবিয়াছিলেন। অমনই পরম-পিতা দেবগণকে আপন মঙ্গলময় শাসনের অনুগামী করিবার জন্য 'অদৃষ্টপূর্ব্ব পূজ্য' তেজঃপুঞ্জ-রূপে আত্মবিকাশ করিলেন। দেবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া জানিবার চেষ্টা করিলেন। জানিলে, ভয়ের মাত্রার লাঘব হয়; কিন্তু কেহই জানিতে পারিলেন না, তিনি যে কে; তাহা প্রত্যক্ষতঃ কেহই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না।

যখন আবার তাঁহার মঙ্গলময় অনুশাসনের মধ্যে দেবগণ আসিলেন, তখন তিনি 'বহুশোভমানা হৈমবতী' উমারূপে—ব্রহ্মবিদ্যারূপে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া দিলেন, তিনি কে?—এইরূপ জগতের প্রত্যেক স্থানেই তিনি মহদ্ভয় উদ্যত বজ্রের ন্যায় বিদ্যমান আছেন। আবশ্যক হইলেই আত্মপ্রকাশ করিয়া শিক্ষা দিবেন। সেইরূপ সমস্ত মঙ্গলের নিধানও সেই পরম-পিতা। তিনি ভীতের অভয় দান করেন; বুভুক্ষুকে অন্নদান তিনিই করেন; তাঁহারই ঔরসজাত ব্রাহ্মীকন্যার পরিণয় করিয়া সকলে গৃহস্থ হয়; তিনিই জন্মদাতা প্রত্যক্ষ-দেবতা—পিতা। যদি কেহ অভয়দাতা এজগতে থাকে, তবে সে তাঁহারই মঙ্গলময় অনুশাসনে নিয়মিত হইয়া; যদি কেহ অন্নদাতা এজগতে আত্মপ্রকাশ করে, তবে সে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় ইচ্ছার মহতী

প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া; সুতরাং সেই পরম-অভয়দাতা ও পরম-অন্নদাতাকে পরম-পিতা বলিব, না ত' কাহাকে পরম-পিতা বলিব? অন্য যাহাকেই পরম-পিতা বলি না, তিনি কোনও একজন মহানের মহতী প্রেরণার অনুগামী বলিয়া; কিন্তু তিনিও যেখানে পরিমিত বা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হন, সেখানে ত তিনি 'পরম' নহেন—সর্ব্বাতিশয়িত মহান্ নহেন। অতএব যিনি কুত্রাপি পরিমিত—ক্ষুদ্র নহেন, যিনি অন্যের প্রেরণা দান করেন, যাঁহাকে অন্যে প্রেরণা দান করিতে পারে না, যাঁহাতে অপরিসীম মঙ্গল-ভাব পূর্ণ অবস্থায় বিরাজিত, ব্রাহ্মী জাতি-লাভের যিনি মূল কারণ, যাঁহার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল, যাঁহার আনন্দে জগৎ আনন্দিত—উজ্জীবিত, সেই জগৎপ্রাণ, প্রকৃতির অধীশ্বর, আনন্দময়, বিদ্যাশরীর এক, অদ্বৈত পরব্রহ্মই আমাদিগের পরম-পিতা। জগৎ তাঁহার মঙ্গল আলোচনায় নিযুক্ত; তিনি জগতের মঙ্গলরূপে আরও প্রকাশিত হউন। জগৎ মঙ্গলময় হউক; জগৎ আনন্দময় হউক; জগতের তিনি হউন; জগৎ তাঁহার হউক; আনন্দসাগরে আনন্দনদী মিলিয়া যাক; মঙ্গল মঙ্গলের জন্য হউক; আনন্দ আনন্দের জন্যই বিরাজিত থাকুক; অপূর্ণ সম্পূর্ণ হউক।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE

(TRANSLATED FROM BENGALI,)

"ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাচাসুতৃপউক্থশাসশ্চরন্তি॥"

(ঋগ্বেদঃ ১ম, ৬ অ, ৮৩ সূঃ।)

"Him you know not who created all this world, Who dwelleth :in your souls, distinct from all else. You go about the world enveloped in a cloud, engaged in wrangling, addicted to the pleasures of life and engrossed in ceremonial observances."

O Men, Him you know not, who created heaven and earth and all that is in them. By His will the sun shines and illumines this world ; by His will the moon sheds her ambrosial light by night, nourishing plants and trees ; by His will at the close of the summer-season the clouds, driven by the wind, pour down welcome showers to allay the heat ; by His will rivers flow from snowy mountains to irrigate and fertilize the earth; by His will the trees of the forest and the garden put forth flowers breathing delightful fragrance and bear fruits delicious to the taste ; by His will the mother-earth supports countless beings with her inexhaustible stores of fruitful harvest; by His will a mother's love, flowing out with the milk of her breast, sustains the life of her infant ; by His will man, endowed with wisdom and righteousness, has risen higher than brutes in the scale of existence ; by His will heaven and earth, the minutes and the hours, the years and the seasons run on smoothly in their several courses. Alas ! you know Him not, though He dwells within your inmost souls.

"YUSHMAKAM ANTARAM VABHUVA"

He dwelleth within you, distinct from all else, in the inmost recesses of your souls. The God who dwelleth within your heart of hearts, you know not; and how should you know Him, when you go about the world enveloped in the darkness of ignorance, as in a thick cloud, engaged in vain wrangling, allured by pleasures of the senses and spending your days in a round of useless rites and ceremonies. If you wish to know the Highest, the Para-Brahma, you must enrich your minds with wisdom and knowledge, embrace the truth in word and in deed, bring your senses under the subjection of moral laws, and renouncing all desire for heaven, pray and strive for true Salvation (mukti). Such are the precepts of the Rishis of old. The latter-day sages also speak in the same strain:—

ধিক্ ধিক্ জীবন ব্রহ্ম ন জানো, হৃদয় দেশমে সো ন উপাসো, পাস দূর কর মানো—

Woe to thy life, that thou should'st not know *Brahma*, that thou should'st not worship Him in the sanctuary of thy heart, deeming far One who is so near.

He, who dwelleth within and pervadeth the sky, the sun, moon, and stars, the air, fire, and water, the light and darkness, and ruleth them from within, whose manifestation they are and yet they know Him not, He is the Being that dwells within each of you, as your inner-soul. This Antar-yamin, the inner-guide, the immortal Being is in close contact with our souls. He cannot be touched with the outer hand, but we can feel Him and realise His presence in our souls. The Yogi, who detaches himself from the world, enjoys the boundless happiness of transcendental communion with Brahma. He is 'Arupa,' without form and without colour. He is neither white nor yellow, nor blue nor red ; this formless and colourless Being is by no means visible to the fleshly eye, but to the eye of wisdom He is revealed as the embodiment of joy and immortality. The blessed saint who has seen His form of Truth and Love remains absorbed in his Beloved for ever and ever. The beauty of that Supreme Love is beyond compare. It knows no increase nor decrease. The resplendent sun and moon, the forest blooming with flowers, the lily of the lake with its thousand petals, (satadala), all earthly Youth, Beauty and Grace, are but faint reflections of that divine Beauty. The love that is fixed on that Beauty never fades. He is without Rasa (flavour), and cannot he tasted as we taste water, fruit or honey ; but He is 'Rasa' itself, the very essence of sweetness. He, who has tasted that essence is blessed with joy everlasting. He is without odour (Agandha) but the morning flowers are charged with balmy fragrance by coming in contact with Him. He is without sound (Asavda); but He dwells in the souls of men and women and silently conveys these Commandments to their conscience:—

Speak the Truth—Do the right. Righteousness is the highest of all, and is honey-sweet for all, Thou shalt not earn money by unjust means. Thou shalt not covet thy neighbour's riches, nor be jealous of his good fortune. Forgive one another's trespasses. Thou shalt not commit adultery, nor indulge in intoxicating drink. Acquire knowledge with diligence. Bear thy burden of duty with patience. Be moderate in food and recreation. Do thy house-work with cheerfulness and wifely devotion. Forbear from quarrelling, wrangling and foolish talk. Be queen of thy house-hold, ;devoted to goodworks and armed with self-control. Obey and honour thine elders. Pity the poor and downtrodden. Give up extravagant and miserly habits. Neglect not thy temporal and spritual welfare. Shrink not from sacrificing life itself at the call of Duty.

Such are the silent admonitions of the Spirit in every soul. He who performs his life-work in obedience to these commandments, conquers death. What though his body be slain, he reaches the Immortal regions, bearing the Life of his life within his soul.

This Supreme Spirit cannot be known by fine speech, nor by understanding, nor by much learning. He alone knows, unto whom the Spirit reveals Himself. And knowing Him, he is fired with zeal and enthusiasm to proclaim the glory of his Beloved. And to whom doth He reveal Himself ? To him, who hungers and thirsts after the Lord, doth He reveal himself, in his infinite Majesty.

O worship Him, the Infinite Spirit, the First Cause increate, whose works these are. Let us worship in a tranquil spirit, Him who is Peace and Rest.

আত্মজ্ঞানেই সুখ।

জগতে জীবকে দুঃখের অভিঘাত সহিতে হয়। যতদিন শরীর, ততদিন দুঃখ-ভোগ জীবের অবশ্যম্ভাবী। আমরা দুঃখ চাই না, সুখই চাই; কিন্তু সুখ জগতে অতি বিরল। যে সুখ আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে সুখ ক্ষণেকের নিমিত্ত; সুতরাং দুঃখ পক্ষেই ধর্ত্তব্য। মানবের জন্ম হইতে

মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং জীবের দেহত্যাগ, অর্থাৎ মৃত্যুই দুঃখের অবসানকারী।

তবে কি জীবের আজন্মকাল দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে? ইহার নিবৃত্তির উপায় কি নাই? আছে, ইহার একমাত্র অতি সুন্দর উপায় আছে; তাহা আত্ম-জ্ঞান। এই জ্ঞানের বলেই জীব দুঃখের কবল হইতে রক্ষা পায়। সে অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্ত্তা নই, ভোক্তা নই, আমার নিজের কোন ব্যাপার নাই। আমার সমস্ত কর্ত্তৃত্বই, সেই মূল কর্ত্তা জগৎ-কর্ত্তার ইচ্ছাধীন। আমার সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের ইচ্ছা-সম্ভূত। শুদ্ধ এই ভাবই মনুষ্যকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে। সে ব্যক্তি এই সংসারে যে তাহার কতদূর সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারে, এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখে কোন প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করে না। সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-চারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, অথবা অরণ্যবাসীই হউন, তিনি জ্ঞানী পুরুষ।

আমাদের এক "আমি" ছাড়া যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাই জড়। জড়ের ধ্বংস আছে। "আমি" নিত্য এবং চৈতন্য-রূপ; "আমার" ধ্বংস নাই; "আমি" চির অমর; ঈশ্বরের মঙ্গলভাব পূর্ণ করিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছি; কিন্তু এই দেহরূপী আমি প্রকৃতপক্ষে "আমি" নহি।

"আমি আছি" বলিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমার আমিত্ব প্রমাণ করিতে এক আমিই তা'র প্রমাণ। সেই আমি, অর্থাৎ যে শক্তি আমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে, সে শক্তিই আমার জ্ঞান। এই-রূপে ক্রমে আত্মজ্ঞানের বহু সাধনায় পর-মাত্মজ্ঞান লাভ করা যায় ও জীব উন্নত হয়। তখন তাহার সাংসারিক শোক দুঃখ দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট-জীবন কখন ম্রিয়মাণ হয় না, তখন সে ব্যক্তি পরম সুখী। সে সুখ এই জগতের সুখ নহে, সে পারলৌকিক সুখ। সে সুখে স্বার্থ নাই, সে সুখে দুঃখ নাই, সে সুখ মহৎ সুখ। সেই প্রকৃত সুখী জনকে আমি স্বাধীন বলি। এরূপ জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম, স্বাধীন ব্যক্তি অতি বিরল।

মানব স্বভাবতঃ ভ্রমান্ধ; এবং তুচ্ছ বস্তুর নিকট সে পরাধীন। জগৎপিতা আমা-দের বুদ্ধি দিয়াছেন—শ্রেয়-বিষয়ে যোগ দিবার জন্য; কিন্তু আমরা স্বার্থেতে মজিয়া ও মায়া-মোহের বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া স্রষ্টাকে ভুলিয়া যাই ও সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য যে জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধন, তাহা ভুলিয়া গিয়া আজীবন দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করিতে থাকি। মেঘের মত আঁধার হিয়া চির-অন্ধ হইয়া পড়ে। সে হৃদয়ে পরম বিদ্যুৎ কখন ঝলসিত হয় না, সে হৃদয়াকাশে কখন চন্দ্রমা হাসে না, সেখানে কখন পরমপিতার আবির্ভাব হয় না। হে আমার ভ্রমান্ধ মন! সংসারের অন্তরালে সেই দেবপথ ধর, যদি বাঁচিতে চাও। নতুবা তোমার জীবন বৃথা—জীবন ধারণ করিয়াও তুমি মৃত। ইহা অপেক্ষা পরিতাপ আর কি হইতে পারে? হে দেব! অন্তরে পরমাত্মার জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত কর। সকল সংশয়-তিমির মিটিয়া যাউক, ধ্রুব বিশ্বাসের অগ্নির মধ্যে যেন দেখি, এক মহান্ অনন্তর-শোভন পরম জ্যোতি প্রদীপ্ত রহিয়াছে, তখনই দুঃখের কবল হইতে রক্ষা পাইব। ইহা ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় গতি নাই।

—

ভারতে বৌদ্ধধর্ম।

বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন সে দিন কলিকাতায় যে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। আমরা ভাষায় তাহার সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। "বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি এই ভারত; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ ধর্ম্ম এ দেশ হইতে এককালে নির্ব্বাসিত। বুদ্ধদেব নিজেই ইহার এরূপ ঘোর পরিণাম পূর্ব্বে হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিষ্য মহাকাশ্যপ (অনু বুদ্ধ) কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধদেব নিজেই বলিয়াছিলেন যে, যখন পুরুষ ও স্ত্রী ভিক্ষু ও উপাসকগণ বুদ্ধে শ্রদ্ধাহীন হইবে, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর আস্থা হারাইবে, সমাধি-জীবনে বীতরাগ হইবে, ধর্ম্মোপদেশে বিমুখ হইবে, তখনই এই ধর্ম্ম বিলয়দশা প্রাপ্ত হইবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস বা ঝটিকাবলে এ ধর্ম্মের ধ্বংস সাধন হইবে না; কিন্তু মূর্খ ও নির্ব্বোধের আবির্ভাবে এ ধর্ম্ম হত হইবেন। তাহারা এ ধর্ম্মকে নিষ্কলঙ্কে থাকিতে দিবে না।" বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত দীপাঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে আহুত হইয়া যাইবার প্রাক্‌কালে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন যে,মুসলমানগণের আগমনে, ধর্ম্মের প্রতি ভিক্ষুদিগের অপ্রীতিফলে—তন্ত্র-মন্ত্রের অনুপ্রবেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সত্য সত্যই তাহা ফলিয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণপ্রায় আলোক এই ভারতে নিতান্ত ম্লান জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে এই বৌদ্ধধর্ম্মের অমিত-প্রতাপ ছিল। সপ্তমশতাব্দীতে দেখিতে পাই শীলাদিত্যের সভায় একবিংশতি করদরাজা সমুপস্থিত। তাঁহাদের সঙ্গে অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত, যোগী ও ভিক্ষু। তৃতীয় হইতে সপ্তমশতাব্দীপর্য্যন্ত দক্ষিণভারতে পল্লব বংশীয়গণের (Pallava dynasty) সহায়তায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের দারুণ শ্রীবৃদ্ধি। ঠিক এই সময়ে সমগ্র ভারতের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। তখনও মুসলমান এদেশে প্রবেশ করে নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ-শাসিত সমগ্র হিন্দুস্থান! দক্ষিণভারতে মহাযান-সম্প্রদায়ের মহামহা বৌদ্ধ সুপণ্ডিতের যে আবির্ভাব হইয়াছিল, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, দিঙ্‌নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মপাল তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পল্লব রাজগণের আনুকূল্যে কনজিভারং (কঞ্চিপুর) নামক স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বৌদ্ধদিগের কেন্দ্র ছিল। সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পালবংশীয় রাজগণের সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই বঙ্গদেশের ভিতর গৌড়ে (মালদহে) বিক্রমণিপুরে (বিক্রমপুরে) বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। দীপাঙ্কর প্রভৃতি (অতীশ) বেহারে অবস্থিত বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কত্বে একাদশ শতাব্দীতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেশ বিদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। উহাই তাঁহার তিব্বতে আহুত হইবার কারণ। তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্মণ জেতারি, যিনি ন্যায়ে অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনিও গৌড়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি পালবংশীয় রাজা কর্তৃক বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষকপদে নিয়োজিত হন। এ পদ সে সময়ে বিশেষ সম্মান ও গৌরব সূচনা করিত।

বেহারের ভাগলপুর জেলার নলান্দায় (বারগাও, চৌকী বিয়ার) এবং বিক্রমশীলায় (গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী সুলতানগঞ্জের নিকট) দুইটি সুবিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নলান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সুবৃহৎ আশ্রম (বিহার) সংযুক্ত ছিল এবং দশ সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং অষ্টাদশ বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বৌদ্ধগণ এইখানে থাকিয়া ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও যোগ শাস্ত্র শিক্ষা করিত। বিহার হইতেই বেহার নামের উৎপত্তি। প্রকৃত পক্ষে এই বেহার প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার পরিলক্ষিত হয়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে, বহুল স্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কচ্ছ, মালুয়া, বোম্বাই এর উত্তর-পশ্চিমবিভাগের বল্লভি রাজগণও বৌদ্ধ ছিলেন; কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি বেহারের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-গুরুর নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যে কেবল ঐ ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি বৌদ্ধগণকে বিনষ্ট ও নির্ব্বাসিত করিবার জন্য দক্ষিণ ভারতের জনৈক রাজাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। ক্রমে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। তিনি কুমারিলের শিষ্য। মালাবারে তাঁহার জন্ম। ক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে কনজিভারং নামক স্থানে বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে রামানন্দ ও কবীরের আবির্ভাব হইল। মিথিলায় উদয়নাচার্য্য উঠিলেন। কিছু কাল পরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈতন্যের অভ্যুদয় হইল। এদিকে

যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইতে আরম্ভ হইল; তাহার অব্যবহিত পরেই মুসলমানেরা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ জুড়িয়া দিল। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলিজি বিক্রমশীলা বিনষ্ট করিলেন। বৌদ্ধ-বিহার চূর্ণিত ও বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার স্থানে মসজেদ বিনির্ম্মিত হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করিল। অধুনাতন এতদ্দেশ-প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার-ব্যবহার-পদ্ধতি এই সময় হইতে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। চৈতন্যের নায়কত্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম, রঘুনন্দনের নির্দ্দেশে (শ্রুতি?) স্মৃতি, রঘুনাথ শিরোমণির প্রদর্শিত ন্যায়, কৃষ্ণানন্দের প্রচারিত তন্ত্র এদেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করিল। বলিতে কি, ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এদেশে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সে আজ ৩০০। ৩৫০ বৎসরের কথা। বৌদ্ধধর্ম্ম এক্ষণে এ দেশ হইতে বিলুপ্ত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের লোপ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবির্ভাবের কারণ কি, অনুসন্ধান করিলেই বলিতে হইবে যে, তাহা আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব। সত্যসত্যই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিলাসী লোকের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মত সমুন্নত ধর্ম্ম, জীবনে পালন ও হৃদয়ে ধারণ করা বড় কঠিন।

সমগ্র মানব সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। রাজা অশোকের প্রেরিত বৌদ্ধ-প্রচারকগণের অধ্যবসায় ফলে এই ধর্ম্ম সিংহলে, হিমালয় প্রদেশে ও আফগানিস্থানে প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর ভিতরে এ ধর্ম্ম সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া বসে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধর্ম্ম চীন হইতে জাপানে প্রবেশ করে, এবং এই ধর্ম্মের প্রভাবেই জাপান প্রকৃত সভ্যতাশিখরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। ফলতঃ অনেক শতাব্দী ধরিয়া জাপানের উপরে ভারতবর্ষের প্রভাব এই বৌদ্ধধর্ম্ম ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। চীন ও জাপানের ন্যায় এই ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে শ্যামদেশে, কাম্বোডিয়ায়, ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টে, বর্ম্মায়, ফরমোজায় ও অন্যান্য বিবিধ স্থানে প্রবেশলাভ করে। হল চেম্বারলেন সাহেব তাঁহার পুস্তকে (Things Japanese) বলেন, জাপানের সমুদয় শিক্ষার ভার অনেক শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধগণের হস্তে ছিল। এই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়াই জাপানে শিক্ষা—চিকিৎসা-বিদ্যা, কাব্য-সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রবেশাধিকার লাভ করে। এক কথায়, এই বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার ফলে জাপানজাতি দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। Griff's Japan নামক গ্রন্থে প্রকাশ যে, এই বৌদ্ধধর্ম্মই জাপানী নারীকুলকে সমুন্নত করিয়াছে। বলিতে কি, জাপানী সাহিত্য বৌদ্ধশিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। জাপানের বৌদ্ধ সংস্কারক নিচারণ (Nicheren) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে জীবিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, 'জাপানের সৌভাগ্য বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে; এই জাপান হইতেই আবার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, এবং এমন এক দিন আসিবে, যখন জাপান হইতে প্রচারক বাহির হইয়া এ ধর্ম্ম আবার ভারতে পুনঃ প্রচার করিবে। যদি কখন জাপান শাক্য-মুনির শিক্ষা ভুলিয়া যায়, তবে জাপানের আবার অধোগতি।'

মহীশূরের উত্তর বিভাগে চিত্তল ড্রুগ (Chittaldroog) নামক পার্ব্বত্য দুর্গে অনেকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পালি অক্ষরে গৌতমের নাম মিলে। কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী। কনিংহাম সাহেব বেরাইচ-এর নিকটে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মাটীর ভিতর হইতে অনেকগুলি ভগ্ন অট্টালিকা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উহাতে বৌদ্ধ সময়ের মূর্ত্তি ও মুদ্রা বাহির হইতেছে। পণ্ডিত দয়ারাম, জেতবানের (Jetavana) স্থান অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা জেলায় বাহির করিয়াছেন। ১১২৯ খৃঃ অব্দের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কনৌজের হিন্দু রাজা গোপালচন্দ্র বৌদ্ধগণকে ছয়টি গ্রাম দান করেন।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত-বিজয়ে আসিয়া দেখিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে অশোকের বংশাবলীর উৎসাহে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান রাউলপিণ্ডীর নিকটে Taxila টাক্‌শীলার বিশ্ববিদ্যালয়, যাহা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে গ্রীষীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র পৃথিবীস্থ অধিবাসীর প্রতিশতের ভিতরে এখনও প্রায় চল্লিশ জন বৌদ্ধ। এখনও সমগ্র ভারতের বৌদ্ধ-সংখ্যা একলক্ষ সাতষট্টি হাজার। বর্ম্মার নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশে (চট্টগ্রাম) ও হিমালয়ের পাদবর্ত্তী স্থানে তাহাদের অধিকাংশের বাস।

এই বৌদ্ধধর্ম্মকে আবার সজীব করিবার চেষ্টা চলিতেছে। জাপান, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহল, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সচেষ্ট। চীনে Confucianism ও Shintoism কনফিউসিয়ান ও সিণ্টো মত যাহা আছে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম বলা যায় না। গার্হস্থ্য বিধি ও নৈতিক শিক্ষাই তাহার সর্ব্বস্ব। পাশ্চাত্যভূমিতেও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা চলিতেছে। লণ্ডনে পালি ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। আমেরিকা

হইতেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধিমার্গ ইংরাজিতে প্রকাশিত হইতেছে। অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত ভায়না নগরে পালিগ্রন্থ জর্ম্মণ ভাষায় অনুদিত হইতেছে। জর্ম্মাণির লিপজিগ নগরে জর্ম্মাণ ভাষায় অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। রুসিয়ার সেণ্টপিটার্সবর্গে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ গ্রন্থ Biblothica Buddhica নামে প্রকাশিত হইতেছে। ডেনমার্কদেশেও ঐ ভাবের কার্য্য চলিতেছে। হলাণ্ড দেশেও চীনের সাহায্যে বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহিত হইতেছে। বেলজিয়ম প্রদেশে পালি সংস্কৃত ও তিব্বতীয় গ্রন্থ-সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। ফ্রান্সদেশের পারিস নগরের রাজকীয় গ্রন্থালয়ে (Imperial museum), যাবা কাম্বোডিয়া ও মালব প্রদেশ হইতে বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ সংরক্ষিত হইতেছে। অষ্ট্রীয়া ও সুইডেনদেশে ঠিক এইভাবে কার্য্য চলিতেছে। আমেরিকায় প্রবাসী জাপানী বৌদ্ধেরা মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছে, বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে ও বৌদ্ধমত ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেছে। লণ্ডন ও রেঙ্গুনে বৌদ্ধসভা (Budhistic Society) স্থাপিত হইয়াছে। এই ভারতে মহাবোধি-সভা ১৮৯১ সাল হইতে স্থাপনাবধি বিশেষ কার্য্য করিতেছে। বুধগয়া, বেনারস, মাদ্রাজ, ও কলিকাতায় উহার শাখা সভা আছে। প্রধানসভা সিংহলে প্রতিষ্ঠিত।

পালিভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিত; এই পালিভাষা শিক্ষারও সুব্যবস্থা হইতেছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পালিভাষার পরীক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

বৌদ্ধ-শাস্ত্রে যে রূপ নীতি-শিক্ষা আছে, অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। আমার বিশ্বাস এই যে ভারতের প্রকৃত সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিবে, যেদিন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।"

নানা কথা।

খনিজ পদার্থ। রত্নগর্ভা ভারতভূমির অসংখ্য খনি হইতে যে সকল দ্রব্য উত্তোলিত হয়, তাহার পরিমাণ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে। নূতন নূতন খনিও আবিষ্কৃত হইতেছে। ভারতে সর্ব্বপ্রথমে ১৮২০ সালে পাথুরিয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়। বিগত ২০ বৎসরের ভিতরে অনেকগুলি খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৮৯৬ সালে উত্তোলিত পাথুরিয়া কয়লার পরিমাণ প্রায় ৩৮ লক্ষ টন ছিল; ১৯০৬ সালে উহা ৯৮ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে; স্বর্ণ তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার হইতে পাঁচলক্ষ একাশিহাজার আউন্সে দাঁড়াইয়াছে; কেরোসিন তৈল দেড়কোটী হইতে চৌদ্দ কোটীতে উঠিয়াছে; ম্যাঙ্গনিজ সাতান্ন হাজার হইতে পাঁচ লক্ষ টনে উঠিয়াছে; অভ্র তের হাজার হইতে প্রায় একান্ন হাজার হন্দরে উঠিয়াছে; (Rubies) বিবিধ মণি মাণিক্য এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার হইতে তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ক্যারেটে উঠিয়াছে। লবণ ষোললক্ষ টন হইতে বারলক্ষ টনে অবনতি পাইয়াছে। Indian World.

অনাথ আশ্রম।—ব্রহ্মে অনাথাশ্রমের আবশ্যক হয় না। গ্রামের অন্যান্য লোকেরা অনাথ সন্তান সন্ততিকে নিজ নিজ পুত্র কন্যার ন্যায় লালন-পালন করে। ব্রহ্মদেশে, ধনী ব্যক্তির অন্য কোন উপাধি নাই; তাহাদের মধ্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা, বিহার-প্রতিষ্ঠাতা এইরূপ উপাধি পরিদৃষ্ট হয়। Indian World.

গঙ্গাবারি।—E. H. Hankin হানকিন সাহেব গঙ্গা ও যমুনার জল পরীক্ষা করিয়া স্বরচিত The cause and prevention of cholera নামক গ্রন্থে বলেন যে, ঐ দুই নদীর জলে ওলাউঠার কীটাণু বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। অধিকন্তু ঐ জলে এমন এক anticeptic পদার্থের সন্ধান মিলে, যাহাতে ঐ কীট বিনষ্ট হইয়া যায়। Indian World.

স্ত্রী-যাজক।—The Christian life নামক পত্রে প্রকাশ যে, ইউনাইটেড ষ্টেটে প্রায় তিন সহস্র স্ত্রী-ধর্ম্মযাজক (Women pastor) আছেন।

তুলসী।—হিন্দুজাতির মধ্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ভিতরে তুলসীর সমাদর পরিলক্ষিত হয়, এবং তুলসী দেবোচিত পূজা লাভ করে। তুলসীর অপর নাম Basil plant, or ocynum sanctum. Basil যে শব্দ হইতে উৎপন্ন, গ্রীক ভাষায় তাহার অর্থ kingly অর্থাৎ রাজকীয়। জার্ম্মাণ ও ফ্রান্স ভাষায় ঐ তুলসী বৃক্ষের অর্থও ঐরূপ। ইটালী ও গ্রীষ দেশে লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, তুলসীবৃক্ষে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত occult শক্তি নিহিত আছে। গ্রীষের অতিপ্রাচীন সময়ে (classical Greece) তুলসীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। St. Basil সেণ্ট বেসিলের দিনে স্ত্রীলোকেরা তুলসীর ক্ষুদ্র শাখা লইয়া গির্জ্জাতে গমন করে। বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া তুলসীপত্র গৃহের ভিতর ছড়ায় এবং দুই চারিটি পত্র ভক্ষণও করে এই বিশ্বাসে যে, সম্বৎসর ধরিয়া গৃহে রোগাদি হইবে না, রেশম বস্ত্রাদিতে পোকা বা ইন্দুরের উৎপাত হইবে না। হিন্দুদিগের পদ্মপুরাণে তুলসীর উৎপত্তির বিবরণ আছে।

Times of India 8th May, 1907.

আগ্নেয়-দ্বীপ।—ভারতবর্ষের আরাকান উপকূলে একটি নূতন দ্বীপ যে উঠিতেছে, Vulcan Island বলিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছে। সাগরগর্ভ হইতে যে যে কারণে দ্বীপ জাগিয়া উঠে, অগ্ন্যুৎপাত তাহার অন্যতম কারণ। এই দ্বীপ আকায়াব হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণে। এই দ্বীপ ১৯০৭।৩০এ ডিসেম্বর তারিখে "Investigator" নামক জাহাজের আরোহী কর্ত্তৃক প্রথম পরিলক্ষিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত গজ ও প্রস্থ দুইশত গজ মাত্র। এই দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ ভূমি সমুদ্রবারি হইতে বিশ ফুট উচ্চে। আবিষ্কৃত হইবার পরেও ইহার মৃত্তিকা উষ্ণ ছিল, এবং কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা নরম অবস্থায় ছিল। সর্ব্বোচ্চস্থানের তিনফুট ভূমির নিম্নে উষ্ণতার মাত্রা (ফারেণহিট) তাপমান যন্ত্রের ১৪৮ ডিগ্রী দেখা গিয়াছিল। এই দ্বীপটি প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরি, ৬৬ ফিট জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। ইহার অন্তর্দেশের

বিস্তার লম্বায় একমাইল চৌড়ায় প্রায় অর্দ্ধ মাইল। এই দ্বীপটি কেবলই মৃত্তিকাময় বলিলেই হয়; প্রস্তর ও বালুকার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। The Same paper.

অনুষ্ঠান।—বিগত ২৬এ শ্রাবণ সোমবার আন্দুলনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মতে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব।—বিগত ৯ই আষাঢ় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। স্থানাভাবে গতবারে ইহার উল্লেখ করা হয় নাই।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৭২॥৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭১৭।৶৩
সমষ্টি	...	৩০৯০ ৶৯
ব্যয়	...	৩৫১॥ ৯
স্থিত	...	২৭৩৮॥৶০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত সাড়ে তিন টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১৩৮॥৶০

২৭৩৮॥৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২১৭॥০

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে পারিবারিক দান

১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১ খণ্ড হাফ গিনি

৭॥০

২১৭॥০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২।৶০
পুস্তকালয়	...	৩॥ ৬
যন্ত্রালয়	...	১৩৪৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৫।০
সমষ্টি	...	৩৭২॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৭।৴০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪॥৶৯
পুস্তকালয়	...	৶০
যন্ত্রালয়	...	৯২॥ ৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	২৬৸৯
সমষ্টি	...	৩৫১॥ ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	...	কলিকাতা	৫৲
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী	...	„	২৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	...	„	২৲
শ্রীমতী লীলাবতী দেবী	...	„	১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের পবিত্র আদর্শ দেশ মধ্যে প্রচারের একমাত্র উপায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ইহার গ্রাহকরূপে এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ও সাহায্যকারীরূপে আপনি আমাদের মান্য। অতএব আপনার প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনার নিকট বর্ত্তমান শক পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিসাবে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া অগৌণে ঐ টাকা পাঠাইয়া দেন, ইহাই অনুরোধ। এই পূজার সময়ে এখানকার কর্ম্মচারী ও পাওনাদারদিগকে সকল পাওনা ও অগ্রিম দেয় চুকাইয়া দিতে হইবে। অতএব আমাদের এই প্রার্থনার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম ও উদারতা রক্ষা করুন। ইতি—

১৮৩০ শক ১লা আশ্বিন।
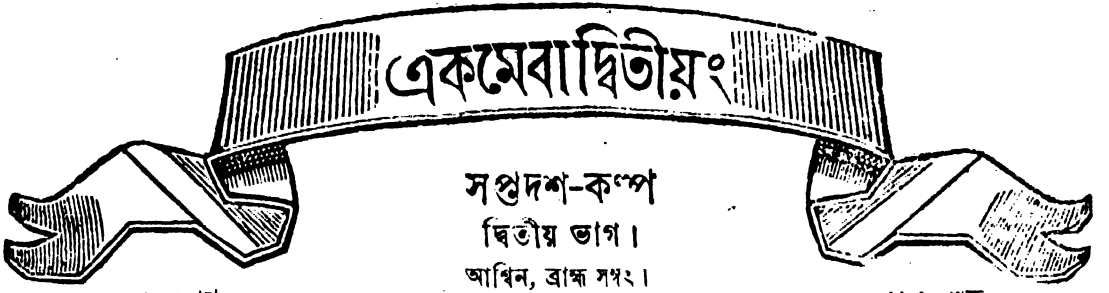
"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

মঙ্গলগ্রহ।

মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্যোতিষিগণ ইহাকে অনেকদিন হইতে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে গ্রহটির গতিবিধি ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। গত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষিগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। নানা দেশের শত শত জ্যোতিষী দূরবীক্ষণ সাহায্যে মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার পর সে প্রকার সুযোগ বহুকাল পাওয়া যায় নাই। আজ কয়েক মাস হইল, আবার সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। দেশ বিদেশের জ্যোতিষিগণ সেই দুর্লভ সময়ে বড় বড় দূরবীক্ষণ দ্বারা আবার নূতন করিয়া মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে যে সকল যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল, এই ১৬ বৎসরে তাহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে; সুতরাং এই সকল উন্নত যন্ত্রাদি সাহায্যে যে পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছে, তাহাদ্বারা মঙ্গললোকের অনেক নূতন খবর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, প্রত্যেক গ্রহ এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ছোট-বড় সকল গ্রহই সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রহগণের ভ্রমণ-পথ ঠিক বৃত্তাকার নয়। এককেন্দ্র (Concentric) বৃত্তদ্বয়ের পরিধির মধ্যেকার ব্যবধান যেমন অপরিবর্ত্তিত থাকে, পথগুলি বৃত্তাকার হইলে প্রত্যেক দুই গ্রহের ভ্রমণপথের মধ্যেকার ব্যবধানকেও ঠিক সেই প্রকার অপরিবর্ত্তিত দেখা যাইত। গ্রহমাত্রেই এক একটি বৃত্তাভাস, অর্থাৎ ডিম্বাকার (Elliptical) পথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং সূর্য্য সেই বৃত্তাভাস ক্ষেত্রেরই একটি অধিশ্রয় (Focus) অবলম্বন করিয়া স্থির থাকে। কাজেই পরিভ্রমণ পথগুলির পরস্পর ব্যবধান কখনই এক দেখা যায় না। মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবী সূর্য্যের নিকটতর। এজন্য পৃথিবী

যে বৃত্তাভাসপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা মঙ্গলের পথের ভিতরে থাকিয়া যায়। তা'ছাড়া পথ দুইটির অবস্থান এরূপ বিচিত্র যে, যখন মঙ্গল সূর্য্যের নিকটতম স্থান অধিকার করে, তখন পৃথিবী সূর্য্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে।

পৃথিবীর ভ্রমণপথ মঙ্গলের ভ্রমণপথের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায়, মঙ্গলের পথের তুলনায় পৃথিবীর পথ কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে, এবং তা'র উপর আবার পৃথিবীর পরিভ্রমণ-বেগ মঙ্গলের বেগের তুলনায় কিঞ্চিৎ দ্রুততর। এই সকল কারণে পৃথিবী যে সময়ে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, মঙ্গলের পূর্ণ প্রদক্ষিণ সে সময়ে শেষ হয় না। কাজেই নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা সাক্ষাৎ করা প্রতি বৎসর ইহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মঙ্গল ও পৃথিবী তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় দুই বৎসরে এক একবার পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী ও মঙ্গলের ভ্রমণপথের ব্যবধান সকলস্থানে সমান নয়; সুতরাং উভয়ের মিলনকালে ব্যবধানটা যদি খুব ছোট না হয়, তবে পর্য্যবেক্ষণের অত্যন্ত অসুবিধা আসিয়া পড়ে। গ্রহদ্বয়ের ভ্রমণপথের যে দুইটি স্থানের দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, ১৮৯২ সালে এবং গত বৎসরে মঙ্গল ও পৃথিবী সেইস্থানে আসিয়া মিলিয়াছিল। জ্যোতির্বিদগণ এই দুই বৎসরে মঙ্গললোকের অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ভ্রমণপথ যে সমতলে অবস্থিত, পৃথিবী তাহার উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া চলা ফেরা করে না। ইহার অক্ষরেখা (Axis) সেই সমতলের সহিত প্রায় ২৩ অংশ পরিমিত কোণ করিয়া হেলিয়া রহিয়াছে। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, অক্ষরেখার এই বক্রতাই ভূপৃষ্ঠে শীতগ্রীষ্মাদি নানা ঋতুকে ডাকিয়া আনে। মঙ্গল পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার অক্ষরেখা পরীক্ষা করিয়া, তাহাতেও ঠিক ঐ পরিমাণ বক্রতা দেখা গিয়াছে, এবং মাঙ্গলিক দিন ও পার্থিব দিনের মধ্যেও একতা ধরা পড়িয়াছে। হিসাব করিলে দেখা যায়, মাঙ্গলিক দিন, পার্থিব দিন অপেক্ষা চল্লিশ মিনিটের অধিক দীর্ঘ নয়; সুতরাং শীতগ্রীষ্মাদি নানা ঋতু যে কেবল পৃথিবীতেই বিরাজ করিতেছে, এখন আর সে কথা বলা যায় না। মঙ্গললোকেও ষড়্ঋতু নিয়মিতভাবে যাওয়া আসা করে।

পৃথিবীর সহিত মঙ্গলগ্রহের ইহাই একমাত্র ঐক্য নয়। পুনঃপুনঃ মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উভয়ের মধ্যে আরো অনেক একতা দেখা গিয়াছে। মঙ্গলের ব্যাস ৪২০০ মাইল। কাজেই আয়তনে মঙ্গল, পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, এবং গুরুত্বেও অনেক লঘু। হিসাব করিলে দেখা যায়, পৃথিবী তাহার পৃষ্ঠস্থ বস্তুগুলিকে যে বলে টানে, মঙ্গল তাহার পাঁচভাগের দুইভাগ মাত্র বলে টানিতে পারে। এক মণ পঁইত্রিশ সের ওজনের মানুষ পৃথিবী হইতে সহসা মঙ্গললোকে নীত হইলে, সেখানে তাহার ওজন আধমণের অধিক হইবে না; সুতরাং পার্থিব মানব মঙ্গললোকে গিয়া মৃত্তিকা হইতে বহু ঊর্দ্ধে লাফাইতে পারিবে, এবং তাহার হস্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পৃথিবীর তুলনায় আড়াইগুণ উচ্চে উঠিয়া, ধীরে ধীরে নামিয়া মাটিতে পড়িবে।

গ্রহের লঘুতা তাহার উপরিস্থিত পদার্থগুলিকে লঘু করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। লঘুতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকর্ষণের পরিমাণ কমিয়া আসে বলিয়া, সকল প্রাকৃতিক

ব্যাপারই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গ্রহাদির গুরুত্বের তুলনায় সূর্য্য ও নক্ষত্র প্রভৃতি বৃহৎ জ্যোতিষ্কগুলির গুরুত্ব অনেক অধিক; সুতরাং ইহাদের আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই শ্রেণীর বড় জ্যোতিষ্কগুলি হাইড্রোজেন ও হেলিয়ম্ প্রভৃতি অতি লঘু বাষ্পগুলিকেও তাহাদের আকাশ হইতে যাইতে দেয় নাই। নক্ষত্রদিগের আকাশ সর্ব্বদাই লঘু-গুরু নানাজাতীয় বাষ্পে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। পৃথিবীর গুরুত্ব মঙ্গলের তুলনায় অধিক হইলেও, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির তুলনায় অতি অল্প। কাজেই পৃথিবী তাহার দুর্ব্বল আকর্ষণে হাইড্রোজেন্ ও হেলিয়ম্ প্রভৃতি লঘু-বাষ্পগুলিকে আকাশে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। এ গুলি বহুকাল পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া মহাকাশে চলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন প্রভৃতি গুরুতর বাষ্পগুলিই আমাদের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রের গুরুত্ব ও আয়তনে উভয়ই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক অল্প। এজন্য ইহার আকাশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ন্যায় গুরু বাষ্পকেও চন্দ্র টানিয়া রাখিতে পারে নাই। কাজেই চন্দ্রের দেশে আকাশ এক-প্রকার শূন্য হইয়াই রহিয়াছে। চন্দ্রগর্ভ হইতে যে জলীয় ও অঙ্গারক বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই ক্ষণকালের জন্য আকাশে বিচরণ করিয়া ক্রমে চিরকালের জন্য মহাকাশে অন্তর্হিত হইয়া যায়। মঙ্গলের গুরুত্ব, চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত অল্প নয়; সুতরাং ইহাতে নাইট্রোজেন্ বা অক্সিজেনের ন্যায় গুরু বাষ্প থাকারই সম্ভাবনা অধিক।

মঙ্গলপৃষ্ঠে যে জলীয় বাষ্প আছে, গত ১৮৯২ সাল এবং তৎপূর্ব্বকার পর্য্যবেক্ষণে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মেরুসন্নিহিত প্রদেশ যেমন শীতকালে বরফে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, মঙ্গলগ্রহে শীতকাল উপস্থিত হইলে, তাহার মেরুপ্রদেশকেও ঠিক সেই প্রকারে তুষারাচ্ছন্ন হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীরই মত সেই মাঙ্গলিক তুষাররাশি গলিয়া মেরুপ্রদেশের শুভ্রতা নষ্ট করিয়া ফেলে।

মেরুপ্রদেশের পূর্ব্বোক্ত শুভ্র মুকুটকে কয়েকজন পণ্ডিত কঠিন অঙ্গারক বাষ্প বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের প্রধান-জ্যোতিষী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত পিকারিঙ্ সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন,—যতই শীতল করা যাউক না কেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের অন্ততঃ পাঁচগুণ চাপ না পাইলে অঙ্গারক বাষ্প জমাট বাঁধিতে পারে না; কিন্তু মঙ্গলের আকাশের চাপ ভু-বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক কম; সুতরাং জলীয় বাষ্পই যে জমাট বাঁধিয়া মঙ্গলে শ্বেতমুকুটের রচনা করে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই; কিন্তু পৃথিবীর মত মঙ্গলে প্রচুর জল নাই, এবং মাঙ্গলিক সমুদ্রগুলিও পৃথিবীর সমুদ্রের ন্যায় গভীর নয়। পৃথিবীর জলাভূমিগুলি যেমন অগভীর, মাঙ্গলিক সমুদ্রগুলিও প্রায় তদ্রূপ। শীতের পর বসন্ত উপস্থিত হইলে মেরুপ্রদেশের তুষাররাশি গলিয়া এই নিম্ন ভূমিগুলিকে জলপ্লাবিত করে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, কাজেই ইহার আকর্ষণের পরিমাণও মঙ্গল অপেক্ষা অনেক অধিক। এই আকর্ষণে পৃথিবী খুব লঘু বাষ্পগুলিকে টানিয়া রাখিতে পারে নাই বটে; কিন্তু জলীয়

বাষ্পকে সে সহজে ছাড়িতেছে না। এই কারণে ইহা নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা ভূপৃষ্ঠে ও আকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু মঙ্গল তাহার দুর্ব্বল টানে জলীয় বাষ্পকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। কাজেই এই বাষ্পগুলি ধীরে ধীরে গ্রহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। পিকারিঙ্ সাহেব বলিতেছেন, গ্রহের গর্ভ হইতে যে সকল জলীয়বাষ্প সদ্য উত্থিত হইতেছে, তাহা জমিয়াই মেরুপ্রদেশের তুষারাবরণ উৎপন্ন করে, এবং বসন্তাগমে গলিয়া জল ও বাষ্পাদির আকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সমস্তই গ্রহত্যাগ করিয়া চলি যায়; সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান অবস্থায় মঙ্গলে জল থাকিলেও, যখন গর্ভস্থ জলভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া যাইবে, তখন আর একবিন্দু জলও মঙ্গলপৃষ্ঠে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ ত্রিশ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভারকে অনায়াসে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মঙ্গলের আকাশের চাপ সাত ইঞ্চির অধিক উচ্চ পারদকে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ কত তরল বায়ুর মধ্যে থাকিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, বায়ুকে তরল করিতে করিতে যখন তাহার চাপ পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভারের অনুরূপ হয়, তখন সেই বায়ুদ্বারা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে না। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় সাত ইঞ্চি পারদের ভারের তুল্য; সুতরাং এই বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া, এবং গ্রহপৃষ্ঠস্থ জল ব্যবহার করিয়া, কোন জীবের প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব নয়; কিন্তু এইপ্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া ঠিক আমাদিগের মত বুদ্ধিমান্ প্রাণী মঙ্গলগ্রহে জন্মিতে পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

দূরবীক্ষণসাহায্যে মঙ্গল পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহার উপরে কতকগুলি সুবিন্যস্ত রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে লইয়া আজ কয়েক বৎসর জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছে। একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এই রেখাগুলি মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ বড় বড় খাল ব্যতীত আর কিছুই নয়। বরফগলা জলকে মেরুপ্রদেশ হইতে দূরদেশে লইয়া আসিবার জন্য মাঙ্গলিক প্রাণিগণ এই খালগুলিকে কাটিয়া রাখিয়াছে। ইঁহারা কোনক্রমে এগুলিকে স্বাভাবিক খাল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। দূরবীক্ষণে এগুলি যে প্রকার সরল ও সুবিন্যস্ত দেখা যায়, কোন নদ নদীরই স্বাভাবিক অবস্থান সেপ্রকার দেখা যায় না। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা বলিতেছেন, মানুষ অপেক্ষা সহস্রগুণে বুদ্ধিমান্ কোন প্রাণী নিশ্চয়ই মঙ্গলে বাস করিতেছে, এবং ইহারাই বুদ্ধিকৌশলে ঐসকল বৃহৎ খাল খনন করিয়া গ্রহের সর্ব্বাংশে জল যোগাইতেছে। মঙ্গলগোলকস্থ কৃষ্ণরেখাগুলি যে সত্যই জলপ্রণালী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; মেরুপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে, ঐ রেখাগুলিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন,—বরফের জলে খালগুলি পূর্ণ হইলে, তাহার উভয় তীরের সিক্ত মৃত্তিকায় যে সকল উদ্ভিদ্ জন্মায়, তাহাই খালগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেয়।

আর একদল পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, মাঙ্গলিক খালের ন্যায় সুবিন্যস্ত ছোট ছোট খাল

চন্দ্রমণ্ডলেরও স্থানে স্থানে দেখা যায়। চন্দ্র যে সম্পূর্ণ নির্জীব, তাহাতে আর এখন মতদ্বৈধ নাই; সুতরাং যে প্রাকৃতিক শক্তিতে চন্দ্রে খালের উৎপত্তি হইয়াছে, মঙ্গলের খালগুলি সেই শক্তিদ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা অযৌক্তিক নয়। তা'ছাড়া মঙ্গলের যে সকল অংশকে জ্যোতিষিগণ সমুদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অনেক খালকে সেই সকল সমুদ্রের উপরেই অবস্থিত দেখা যায়; সুতরাং জল-চালনাই যদি খাল-খননের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐসকল খালের কোনই সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে মাঙ্গলিক জীব সমুদ্রগর্ভে খাল খনন করিতে পারে, তাহাকে কখনই সুবুদ্ধি প্রাণী বলা যাইতে পারে না।

মঙ্গলগ্রহ, বুদ্ধিমান্ প্রাণীদ্বারা অধ্যুষিত কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া যে তর্ককোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আজও নিবৃত্তি হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্মাত্রেই কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রশ্নটির মীমাংসা-চেষ্টায় যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে মঙ্গলসম্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু তথাপি এখনো এসম্বন্ধে অনেক জানিতে বাকি। এগুলি নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত না হইলে, মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সিয়াপারেলি (Schiaparelly) সাহেব বহুপূর্ব্বে মঙ্গলে যে সকল রেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন, গত ১৮৯২ সালের পর্য্যবেক্ষণে সেগুলিকে দেখা যায় নাই; কিন্তু ১৯০৩ সালের পর্য্যবেক্ষণে সেগুলি আবার যথাস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিল। মঙ্গলগ্রহের এইপ্রকার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যানই এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আজ কয়েকমাস হইল মঙ্গলগ্রহ আবার একবার পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানের সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে। দেশবিদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং আশা করা যাইতে পারে, এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির এক অতিক্ষুদ্র অংশ হইতে রহস্য-যবনিকা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্বনাথের সৃষ্টিমহিমাকে আরো প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইব।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

দ্বিতীয়-উপদেশের অনুবৃত্তি।

স্বার্থনীতিবাদের আর একটি পরিণাম এইখানে নির্দ্দেশ করিব।

কোন স্বাধীন জীব,—যে, ন্যায়ের নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জানে,—সে-নিয়ম সে পালন করিতেও পারে, লঙ্ঘন করিতেও পারে—এইরূপ জানিয়া-বুঝিয়াও সে যদি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে ইহাও জানে যে, ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জন্য সে দণ্ডনীয়। দণ্ডের ধারণা একটা কৃত্রিম ধারণা নহে; ব্যবস্থাপকদিগের গভীর ফলাফল-গণনা হইতে উহা ধার-করিয়া পাওয়া নহে; বরং ব্যবস্থাপকেরা দণ্ডের স্বাভাবিক ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই দণ্ডাদি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। স্বাধীনতা ও ন্যায়ের সঙ্গেই এই ধারণার ঘনিষ্ঠ যোগ; সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের অসদ্ভাব, সেখানে দণ্ডসম্বন্ধীয়

ধারণারও অসম্ভাব। যে ব্যক্তি সুখের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, শুধু স্বার্থের প্ররোচনায় অনর্থকরী কোন বাসনার বশবর্ত্তী হয়, অথচ যদি সেই সঙ্গে অন্ততঃ ন্যায়ের বাহ্য নিয়ম সে রক্ষা করিয়া চলে, তাহা হইলে, তাহার ঐরূপ কাজকে কি প্রশংসা করা যাইতে পারে?—কখনই না। ঐ কাজকে তাহার অন্তরাত্মা কখনই ভাল বলিবে না; সেই কাজের জন্য সে কাহারও ধন্যবাদের পাত্র হইবে না, পুরস্কারের পাত্রও হইবে না;—কেন না, ঐ কাজ করিবার সময় সে শুধু আপনার কথাই ভাবিয়াছিল। তা'ছাড়া, আত্মসেবা করিতে গিয়া সে যদি পরের অনিষ্টকরিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সে যদি আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে না করে, তাহা হইলে সে যে দণ্ডার্হ, একথা সে নিজেও বলিতে পারে না—অন্য কেহও বলিতে পারে না। কোন স্বাধীন জীব,—যে আপনার ইচ্ছা-অনুসারে কাজ করে, যে একটা নিয়মের অধীন,—যে নিয়ম সে পালন করিতেও পারে, লঙ্ঘন করিতেও পারে,—সেই জীবই শুধু আপনার কাজের জন্য দায়ী; কিন্তু এই স্বাধীনতা ও ন্যায়-বোধের অসম্ভাবে, তাহার দায়িত্ব কোথায়? যেমন কোন পাথর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকেই নীত হয়, কোন চুম্বক-শলাকা উত্তরাভিমুখেই মুখ ফিরাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক, স্বার্থের নিয়মে, শুধু আত্মসুখের দিকেই ধাবিত হয়। স্বার্থের অনুসরণে, মানুষ যখন বিপথগামী হয়, তখন উপায় কি? তখন অবশ্য তাহাকে ভাল পথে ফিরাইয়া আনা আবশ্যক। কিন্তু তখন আর কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া, তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি দেওয়া হয় কেন?—না, সে ভুল করিয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি সুপরামর্শেরই পাত্র—দণ্ডের পাত্র নহে। স্বার্থতন্ত্রানুসারে, দণ্ড-পুরস্কার ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ব্যক্তিগত হিসাবে সমাজের আত্মরক্ষণই দণ্ডের উদ্দেশ্য; একটা হিতকর ভীতি উৎপাদন করিবার জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যটি ভাল—যদি উহাতে কেবল এই কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হয় যে, এই দণ্ড স্বরূপতঃ ন্যায্য, এই দণ্ড অপরাধেরই ন্যায্য ফল, কোন একটা অপকর্ম্ম করাতেই এই দণ্ড বৈধরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কথাটি উঠাইয়া লইলে, অন্যান্য উদ্দেশ্যের প্রামাণ্য বিনষ্ট হয়; তখন উহা নীতি-বিরহিত হইয়া কেবল পাশব বলেতেই পর্য্যবসিত হয়। তখন আর অপরাধীকে অপরাধী-মনুষ্যের ন্যায় দণ্ড দেওয়া হয় না; যে সকল পশু আমাদের কোন কাজে না আসিয়া আমাদের অনিষ্ট করে, তখন সেই সকল পশুর ন্যায় তাহাকে আঘাত, কিংবা হত্যা করা হয়। তখন সেই অপরাধী, ন্যায়-দণ্ডের নিকট আপনা হইতেই নত-শির হয় না—নতশির হয়, কেবল লৌহ বেড়ীর ভারে, কিংবা খড়্গের আঘাতে। সে দণ্ডের কোন বৈধ সার্থকতা নাই, সে দণ্ড অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নহে;—ইহা সেরূপ দণ্ড নহে, যাহাকে অপরাধী দণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারে,—বুঝিতে পারে যে, এই দণ্ড নিয়মলঙ্ঘনেরই উচিত ফল। তাহার নিকট এই দণ্ড, অনিবার্য্য প্রচণ্ড ঝটিকার মত;—এই দণ্ড বজ্রের মত তাহার মাথার উপর আসিয়া পড়ে; তাহার শক্তি অপেক্ষা এই শক্তি অধিক প্রবল বলিয়াই সে তাহার আঘাতে ধরাশায়ী হয়। রাজ-দণ্ডের প্রকাশ্য আড়ম্বর অবশ্য লোকের কল্পনার উপর কাজ করে; কিন্তু উহা লো-

কের জ্ঞানকে উদ্বোধিত করে না, কিংবা লোকের বিবেক-বুদ্ধি হইতে সায় পায় না। ঐরূপ দণ্ড উহ'দিগকে ভীত করিয়া তোলে;—কিন্তু প্রশান্ত করিতে পারে না। স্বার্থনীতির পুরস্কারও কেবল একটা আকর্ষণ—কেবল একটা প্রলোভন মাত্র। এই পুরস্কারের মধ্যে কোন ধর্ম্মনীতির ভাব নাই—আপনার সুবিধা হইবে বলিয়াই লোকে এইরূপ পুরস্কারের প্রার্থী হয়। এইরূপে, ধর্ম্মের ফল সুখ, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুঃখ—এই যে দণ্ড-পুরস্কারের পারমার্থিক ও লৌকিক ভিত্তি, এই মহতী ভিত্তিটি বিনষ্ট হয়।

অতএব, আমরা নির্ভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিঃ—স্বার্থবাদ, প্রত্যক্ষ-তথ্য-সমূহের বিরোধী, বিশ্বমানবের যাহা ধ্রুব-বিশ্বাস—সেই সকল ধ্রুব-বিশ্বাসের বিরোধী। ইহলোক অপেক্ষা পরলোকে ন্যায়ের নিয়ম অধিকতর বাস্তবতায় পরিণত হইবে—এই যে পারলৌকিক আশা, ইহার সহিতও স্বার্থবাদের মিল হয় না।

বিশ্বজগতের ও বিশ্বমানবের একজন স্রষ্টা অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর আছেন,—ঐন্দ্রিয়িক দর্শন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে কি না,সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। আমাদের ধ্রুব-বিশ্বাস, ঐন্দ্রিয়িক দর্শন ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; কেন না, ইন্দ্রিয়-বোধ, মানব-মনের যে সকল বৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ, সেই সব বৃত্তি হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—কারণের সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব,—যাহার অবিদ্যমানে, কোন কিছুরই কারণ অনুসন্ধানে আমরা প্রয়োজন অনুভব করি না, কিংবা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হই না। আমরা এক্ষণে শুধু এই কথা প্রতিপাদন করিতে চাই যে, মানুষের যদি বাস্তবিকই কোন নৈতিক গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই সকল গুণ ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করায় মানুষের কোন অধিকার থাকে না; কেন না, মানুষ, সেই সকল গুণের কোন চিহ্ন জগতের মধ্যে দেখিতে পায় না—আপনার মধ্যেও দেখিতে পায় না। স্বার্থনীতির ঈশ্বর, ঐ স্বার্থনীতি-পরায়ণ মানুষের অনুরূপই হইবে। কেমন করিয়া তুমি ঈশ্বরকে ন্যায়বান্ ও প্রেমময় বলিবে—(এই প্রেম নিঃস্বার্থ প্রেম বলিয়াই বুঝিতে হইবে) যখন স্বার্থনীতি, এইরূপ ন্যায় ও প্রেমের কোন ধারণাই করিতে পারে না। যে ঈশ্বর আপনাকেই ভাল বাসেন, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসেন না—স্বার্থনীতি শুধু এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে পারে। আমরা যদি ঈশ্বরকে দয়া ও ন্যায়ের মূলাধার বলিয়া না ভাবি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতেও পারি না, ভক্তি করিতেও পারি না। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা আমাদের মনে যে ভয়ের উদ্রেক করে, আমরা শুধু সেই ভয়ের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই;—এ পূজা প্রীতি, কিংবা ভক্তির পূজা নহে—ইহা ভয়-মূলক পূজা।

এইরূপ, ঈশ্বরের উপর আমরা কি কোন পবিত্র আশা স্থাপন করিতে পারি? আমরা যদি কেবল হীন সুখেরই অন্বেষণ করি, কেবল স্বার্থসাধনেই ব্যাপৃত থাকি, আমরা যদি ন্যায়কে সমর্থন করিবার জন্য কখন কষ্টস্বীকার করিয়া না থাকি, আমাদের আত্মার মহত্ত্বরক্ষা ও পরিপুষ্টি করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিয়া না থাকি, তাহা হইলে জগৎ-পিতার দয়ামিশ্র

ন্যায়ের ভাব আমরা কি করিয়া মনে ধারণা করিব? যে নিয়মটি হইতে, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরা, আত্মার-অমরত্বের বিশ্বাসে উপনীত হয়েন—সে নিয়মটিও অপরিহার্য্য পাপ-পুণ্যের নিয়ম। এই ন্যায়ের নিয়মটি এ লোকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় না বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের দোহাই দিই; আমরা মনে করি, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে ন্যায়ের নিয়ম স্থাপন করিয়া, আমাদের সম্বন্ধে এই নিয়মটি কি তিনি নিজেই লঙ্ঘন করিবেন? আমরা দেখাইয়াছি, স্বার্থনীতি—কি ইহলোকসম্বন্ধে, কি পরলোকসম্বন্ধে—এই পাপ-পুণ্যের নিয়মটিকে ধ্বংস করিয়াছে। এই পৃথিবীর পরপারে স্বার্থনীতির দৃষ্টি মোটেই চলে না। অসম্পূর্ণ স্বার্থনীতি, অসম্পূর্ণ মানব-বিচারের বিরুদ্ধে, অদৃষ্টের যদৃচ্ছ অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণন্যায় পূর্ণমঙ্গল বিচারকের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করে না। স্বার্থনীতির মতে,—অন্তঃকরণের স্বাভাবিক সংস্কার যাহাই হউক না কেন, অন্তরাত্মার মধ্যে ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস যাহাই অনুভূত হউক না কেন, এমন কি, প্রজ্ঞার মূল নিয়ম যাহাই হউক না কেন, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষের যাহা কিছু ঘটে, তাহাই মানুষের সব—তাহাতেই মানুষের সমস্ত কাজের পরিসমাপ্তি হয়।

যে সকল ভয় ও আশা, প্রকৃত স্বার্থ হইতে মানুষকে বিমুখ করে, সেই সকল ভয় ও আশা হইতে মানুষকে বিমুক্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া Helvetios-এর শিষ্যগণ হয় ত গৌরব অনুভব করিবেন। মানবজাতি অবশ্য তাঁহাদের এই কাজের মূল্য ও মর্য্যাদার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের সমস্ত অদৃষ্টকে এই পৃথিবীর মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এমন কি সৌভাগ্য তাঁহারা আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সকলেরই ঈর্ষ্যার যোগ্য?—আমাদের সুখের জন্য তাঁহারা কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন? তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি হইতে কিরূপ রাষ্ট্র-নীতি প্রসূত হইয়াছে?

ইহার যা' উত্তর, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ। আমরা দেখাইয়াছি,—ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকারকে স্বীকার করে না। এই দর্শনতন্ত্রের নিকট ইচ্ছাশক্তি আসলে কি?—না, মনের বাসনা চরিতার্থ করিবার শক্তি। এই হিসাবে, মানুষ স্বাধীন নহে, এবং অধিকার, বলেরই নামান্তর মাত্র।

আমরা বলি;—স্বার্থনীতির মতে, বাসনা ছাড়া মানুষের নিজস্ব কিছুই নাই। অভাব-বোধ হইতেই বাসনার উৎপত্তি;—মানুষ এই অভাব-বোধের কর্ত্তা নহে—ভোক্তা। ইচ্ছাকে বাসনায় পরিণত করাও যা', স্বাধীনতার বিনাশ সাধন করাও তা'; তা' অপেক্ষা আরও বেশী—ইহাতে করিয়া বাসনাকে এমন একটা আসনে বসানো হয়, যে আসনটি বাসনার নিজস্ব নহে; উহাতে করিয়া একটা মিথ্যা স্বাধীনতার সৃষ্টি করা হয়, ও সেই স্বাধীনতা, কেবল বদ্‌মাইসি ও দৈন্যাবস্থার একটা অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিলে, কত কত বাসনা মনে উদয় হয়, যাহা পূর্ণ করা অসম্ভব। বাসনা স্বভাবতই অসীম, অথচ আমাদের শক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে আমরা যদি একা থাকিতাম, তা' হইলেও আমাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিতে কত কষ্ট পাইতে হইত। এখন ত অন্যের সহিত আমাদের

ভীষণ সংঘর্ষ;—অসংখ্য লোকের অসংখ্য বাসনা, এবং তাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, বিচিত্র, ও অসমান। যখনই আমাদের ব্যক্তিগত বল—ব্যক্তিগত অধিকার হইয়া দাঁড়ায়, তখনই অধিকারসাম্য অসম্ভব আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়; সকলেরই অধিকার অসমান,—সকলের শক্তিসামর্থ্য অসমান, এবং এই অসমতা কস্মিন্ কালেও ঘুচিবার নহে; সুতরাং স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়; যদি মিথ্যা স্বাধীনতার ন্যায় একটা মিথ্যা সাম্যের সৃষ্টি করা হয়, সে শুধু একটা মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ মাত্র।

এই স্বার্থনীতি, এই সকল সামাজিক উপকরণকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলে। আমি স্পর্দ্ধার সহিত জিজ্ঞাসা করি, স্বার্থনীতি-সম্প্রদায় ও ইন্দ্রিয়বাদ-সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা এই সকল উপকরণ হইতে এক দিনের জন্যও কি মানবজাতির সুখ ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিতে পারেন?

যেহেতু বলই অধিকার—অতএব, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই স্বাভাবিক অবস্থা। একই জিনিস সকলেই চাহে; সুতরাং তাহারা সকলেই পরস্পরের শত্রু; যাহারা দুর্ব্বল,—শারীরিক বিষয়ে দুর্ব্বল, মানসিক বিষয়ে দুর্ব্বল—এই যুদ্ধে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ! যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্—তাহারাই পূর্ণ অধিকারের অধিকারী। যেহেতু বলই অধিকার,—প্রকৃতি সবল করিয়া সৃষ্টি করে নাই বলিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রকৃতির নিকটেই নালিস করিতে পারে; কিন্তু যে বলবান্ ব্যক্তি বল-প্রয়োগ করিয়া তাহাকে উৎপীড়ন করে, তাহার নিকটে সে কখনই নালিস করিতে পারে না। দুর্ব্বল ব্যক্তি তখন ফিকির-ফন্দির সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; তখনই ছলের সহিত বলের যুঝাযুঝি আরম্ভ হয়।

যদি মানুষের মধ্যে,—প্রয়োজন, বাসনা, প্রবৃত্তি, স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তবে রক্তপ্লাবী যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী; কোন প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না; যুদ্ধবিগ্রহকে কিছুকালের জন্য চাপা দিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু আইন-কানুন যতই চাপিবার চেষ্টা করুক না কেন, আইন-কানুনের অবগুণ্ঠন ছিঁড়িয়া উহা এক-একবার বাহির হইবেই হইবে। যাহারা আসলে স্বাধীন নহে, তাহাদের জন্য স্বাধীনতার কল্পনা করা,—যাহারা আসলে বিভিন্ন, তাহাদের মধ্যে সমতার কল্পনা করা,—যাহাদের মধ্যে অধিকারবুদ্ধি নাই, তাহাদের নিকটে অধিকারের সম্মাননা প্রত্যাশা করা, এবং অবিনশ্বর দুষ্প্রবৃত্তির উপর—অন্তরের রিপুসমূহের উপর—ন্যায়কে স্থাপন করা কি বিষম মূঢ়তা! এই বিষম চক্র হইতে বাহির হওয়া কি কষ্টকর ব্যাপার!

এই সাংঘাতিক চক্র হইতে বাহির হইতে হইলে, এমন কতকগুলি মূল সূত্রের আশ্রয় লইতে হয়, যাহা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-বাদ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না—ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র যাহার কোন ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না, অথচ যাহা মানুষের অন্তরেই নিহিত আছে। য়ুরোপে এই সকল নীতি-সূত্র, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ গৃহীত হইয়া য়ুরোপের আধুনিক সমাজকে পরিচালিত করিতেছে। যে প্রখ্যাত "অধিকার ঘোষণা"-পত্র দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার প্রতিপাদিত করিয়া, চিরতরে অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার স্থানে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে

স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে এই সকল মূল সূত্রের কথাই লিখিত হইয়াছিল, এখনও এই সকল মূলসূত্র, আমাদের শাসনপদ্ধতির মধ্যে, আমাদের বিধিব্যবস্থার মধ্যে, আমাদের বিবিধ স্থায়ী অনুষ্ঠানের মধ্যে, আমাদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে, এমন কি, যে বায়ু আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, সেই বায়ুর মধ্যে অবস্থিত। এই সকল মূলসূত্রই আমাদের সমাজের ভিত্তিভূমি এবং যে দর্শনতন্ত্র আমাদের এই অভিনব সমাজের জন্য আবশ্যক, সেই দর্শনতন্ত্রেরও ভিত্তিভূমি।

আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে অষ্টাদশ শতাব্দির এই সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—এই সকল সাধু-প্রকৃতির লোকেরা, কি করিয়া ঐ ঐন্দ্রিয়িক দর্শনের দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন,—যে দর্শনতন্ত্র তাঁহাদের হৃদ্‌গত ভাবের বিরোধী? আমি কেবল তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, ঐ যুগ উল্টা-স্রোতের যুগ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সংকীর্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতা ও তাহার নিত্য সহচর ভণ্ডামির অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই অন্ধ অতি-ভক্তিই স্বেচ্ছাচারিতাকে ডাকিয়া আনিল; এই স্বেচ্ছাচারিতায় সমস্তই আক্রান্ত হইল। রাজকুল হইতে অভিজাতবর্গের মধ্যে, পাদ্রিদের মধ্যে, লোকসাধারণের মধ্যে উহা ক্রমশঃ সংক্রামিত হইল। ভাল ভাল লোক, এমনকি, দুই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিও ঐ আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল; আমাদের উন্নত উদার জাতীয় দর্শনের স্থান, একটা হীনতর দর্শন আসিয়া অধিকার করিল;—লকের শিষ্য কঁদিয়াক্, দেকার্তের স্থান অধিকার করিল। সুখের নীতি, স্বার্থের নীতি ঐ যুগে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বিশ্বাস করিও না যে, সেই সময়কার সকল লোকই সুনীতি-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। রইয়ে-কলার বলেন,—মত যতই খারাপ হোক্ না কেন, সেই মতাবলম্বী লোকেরা তত খারাপ নহে। স্টোয়িক-মতবাদ যতটা কঠোর, স্টোয়িক-মতাবলম্বী লোকেরা ততটা কঠোর নহে; এপিকিউরীয় মতবাদ যতটা চিত্ত-দৌর্ব্বল্যজনক, সেই মতাবলম্বী লোকেরা ততটা দুর্ব্বলচিত্ত নহে। দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত মানুষ, ধর্ম্মের উপদেশ যেমন সম্পূর্ণ-রূপে কাজে প্রয়োগ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন দূষিত মত মানুষকে অপথে লইয়া গেলেও,—ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার অন্তরাত্মা সেই মতকে মনে মনে ধিক্কার করে। এই কারণে, অষ্টাদশ শতাব্দিতে, সুনীতিধ্বংসী ঐন্দ্রিয়িক দর্শন-তন্ত্র ও স্বার্থনীতির প্রাদুর্ভাব হইলেও, খুব উদার নিঃস্বার্থ ভাবেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কখন-কখন দেখা যায়।

আমার এই উপদেশটি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবে; তোমাদের মনে যে সব তত্ত্ব আমি দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিতে চাই, তাহার সহিত স্বার্থনীতির ঐক্য হয় না বলিয়াই এত কথা আমার বলিতে হইল। এই স্বার্থ-নীতি যে একটা মিথ্যা উদার ভাবের ভাণ করে, সেই ভাণটা আমার ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। আমার মতে, এই নীতি দাসদিগের নীতি; এ নীতি এই স্বাধীনতা-যুগের নীতি নহে। স্বার্থনীতি-বাদকে খণ্ডন করিলাম; এক্ষণে, আর যে সকল নীতিবাদ,—সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা দোষে দূষিত, সেই সকল নীতিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই সকল নীতিবাদ খণ্ডন করিয়া, এমন একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব, যাহার

দ্বারা বিশ্বমানবের সহজ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE

(Translated From Bengali,)

The In-dwelling Spirit.

য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ
যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি
এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

"He who dwelleth in and within the soul, whose Image the soul is, who ruleth it from within, and yet it knows Him not, He is the Inner guide (Antaryamin), the Immortal".

What a blessing it is for us that we are able to sanctify our souls by worship of the Holy of holies, in this sacred morning hour.! The holiness, the illumination of the spirit can only come from His worship. He is enthroned for ever in every soul and it is his presence that sanctifies it. Whenever the soul strays away from the Supreme Spirit, it is filled with sorrow ; stricken with grief and decay and consumed by unholy desires. But as we cherish God within our souls, we are purified and sanctified. Where is this Supreme Spirit ? He is not far to seek but is in close contact with every one of us. He is within our souls.

"He who dwelleth in and within the soul and sanctifies it, whose Image the soul is, who ruleth it from within and yet the soul knows Him not, He is the inner guide, the Immortal." This is the saying of one of our ancient Rishis, the inspired utterance of that brave and high-souled Rishi, Yajnavalkya, and we find it in White Yajurveda, Madhyandina Sàkhà. We cannot find God by travelling in distant countries or making arduous pilgrimages Those who seek Him in the external world come away disappointed. Things of the spirit cannot be seen in a visible form in the outer world. He alone sees Him who looks for Him in the inner sanctuary of the soul. If God had fixed His abode in the highest Heaven, far far away from us, how should we have reached Him there ? But it is not necessary to travel far and wide in order to see Him. Whenever we bring our minds under control and turn our eye inward, calm and undistracted, we see Him enshrined in our innermost souls.

We have not to go far to see Him—who dwelleth within our souls. As however the body has to exert itself in order to go a great distance, so in the act of self-introspection, it is necessary that the mind should strive with energy. Training the mind is a far harder task than mortifying the flesh. Whatever else you may do, the one thing necessary in order to realize God within the soul is self-discipline. One must be calm and serene, patient and self-possessed in order to attain the desired end. We may arrive at a certain destination by walking hundreds of miles, but though the soul is nearest to us of all, yet it is extremely difficult to reach it, after overcoming worldly distractions. Our attention varies according to the strength of our desire. God's presence within the soul cannot be realized without the utmost desire and concentration of the mind. But the task, however difficult, must be accomplished. Why come to the house of worship, if you go away empty-hearted, without seeing God ? If we should fail to realize His presence in our souls, and turn to Him with love and reverence, our object in coming here is wholly frustrated.

What are the attributes of this soul, wherein dwells the Supreme Spirit ? Let us consider the question attentively. We have

it in the Vedas "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণং" That which knows 'I smell this,' that is the soul; the nose is but the instrument of smelling. "অথ যো বেদেদং অভিব্যাহরাণীতি স আত্মা অভিব্যাহারায় বাক্" That which knows 'I speak,' that is the soul; the tongue is but the instrument of speech. "অথ যো বেদেদং শৃণ্বানীতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রং" That which knows 'I hear,' that is the soul, the ear is the instrument of hearing. "অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ" that which knows 'I think,' that is the soul, the mind is its divine eye, the internal eye by which it sees. The soul is neither hand nor foot, nor eye nor ear, nor is it the organs of smell or speech. The soul is that which sees with the eye, hears with the ear, grasps with the hand, goes with the foot. When, through meditation, we come to know the soul, we become privileged to see the Supreme Spirit. As we cannot see the master of the house without entering it, so we must go into the chamber of the soul before we can see the Lord, its master. It is from the knowledge of the self, the Ego that we rise to the knowledge of God. Hence it behoves thee, first of all, to know Thyself, the self that sees, feels, hears, thinks, understands. Now on what does this soul rest? To this question the answer is that the soul rests in the eternal, the Supreme Spirit. "স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।" When the human soul, feeling itself to be homeless, seeks its life's refuge and calm, tranquil and chastened by discipline, becomes pure and undefiled, then it sees God within and hears his thrilling living Voice "অহং ব্রহ্মাস্মি" 'I am the Brahman in thy soul—Take refuge in Me and thou shalt be free from sin and anguish.' We can not hear that soul-stirring voice, that sweet consoling message with our bodily ear but it can be heard when we are absorbed in contemplation and inspired by spiritual wisdom.

"জিস-নে তু জানায়া সোহি জন জানে
হরিগুণ সদহি আথ বাখানে"

'O Lord, he alone knows, to whom thou revealest thyself. And knowing Thee, he sings Thy praises for ever.'

The supreme Spirit dwells within light and darkness, within the sun and moon, but the light and darkness, the sun and moon know Him not. He also dwells in the soul of man and the soul knows Him not, though to it has been vouchsafed the privilege of knowing Him. When by purity of life and spiritual culture, the soul attains to a state in which it is filled with a deep yearning after the Lord, so that it cannot do without Him, to such a pure and devout soul doth the Lord reveal Himself. O seek Him, the in-dwelling spirit, within thy soul and not in the empty space. As blood and breath are the life of the body, so the life of the soul is God. Blessed is he who hath entered into holy communion with this Brahman. Such fellowship, commenced here on earth, never ends. Even though the body lies here forsaken, the soul enters into life everlasting and attains all its desires in union with the Eternal. সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা. Such a union is the crown of our desire, our heaven, our salvation.

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।

"This Supreme Spirit cannot be known by fine speech, nor by keen intelligence, nor much learning. He alone knows who seeks Him with fervent prayer and unswerving devotion. To such a seeker the Lord reveals Himself and all his desires are fulfilled. Oh! Arise, awake, hie thee to his door with a humble and sincere heart and thy prayer will be answered. The temptations

and fascinations of the world will come to an end; thou shalt have joy to thy right, and enjoyment to thy left; and thy soul shall sing poems of His love in ecstacy. O! Hearken to His low and solemn voice as dwelling within the finite soul, he utters these words —Aham Brahmàsmi—I AM THE BRAHMAN.

মৃত্যুচিন্তা ও বৈরাগ্য।

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা পাতা বিধাতা। তাঁহার মঙ্গলভাব হইতে আমরা জন্মিয়াছি, তাঁহারই মঙ্গলভাবে আমরা জীবিত রহিয়াছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহারই মঙ্গলভাবে আমরা বিরাম ও বিশ্রাম লাভ করিব। তিনি আমাদের জন্ম-স্থিতি-মৃত্যুর দেবতা। এই জন্ম-স্থিতির ভিতর দিয়া তাঁহার করুণা প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার অবাধ অগাধ প্রীতি বহমান হইতেছে। এতই তাঁহার করুণা, এতই তাঁহার প্রেম— যে, সেই করুণা ও প্রেমের বাহুল্যই আমাদিগকে তাঁহার করুণা ও প্রেম উপলব্ধি করিতে দেয় না। বায়ু-সাগরে আমরা সকলে নিমজ্জিত; আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে বায়ু রহিয়াছে; অথচ একজন নিরক্ষরকে জিজ্ঞাসা কর, সে বহমান স্থির বায়ুর অস্তিত্ব পর্য্যন্তও স্বীকার করিবে না। বায়ুর সত্তা তখনই সে স্বীকার করিবে, যখন প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করিবে, তাহার পর্ণকুটীরকে ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইবে।

ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থের সহিত আমাদের অবিরাম ঘনিষ্ঠতম যোগ, বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটিলে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও মনে প্রতিভাত হয় না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু মাতার সহজ স্নেহে প্রতিপালিত হয়; ক্ষুধা পাইলেই মাতার স্তনদুগ্ধ পান করে; নিদ্রার উপক্রমে মাতার উদার ক্রোড় প্রসারিত দেখে, তাহাকে আয়াস পাইতে হয় না, বাধা ভোগ করিতে হয় না, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার ন্যায় মাতার অপরিমেয় সহিষ্ণুতা সে চারিদিকে নিরীক্ষণ করে; তাই সে মাতার নিঃস্বার্থ প্রেম সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শিশু মনে করে, মাতার পক্ষে স্নেহ দান করাই স্বাভাবিক, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে জড়ের ন্যায় মাতা স্নেহ দান করিতে বাধ্য, এবং সেই স্নেহ লাভ করিবার পক্ষে যেন শিশুর ন্যায়সঙ্গত একটি অধিকার আছে। মাতৃস্তনের দুগ্ধধারার ভিতর দিয়া যে জননীর হৃদয়বিগলিত প্রেমধারা বিনির্গত হইতেছে, সে তাহা প্রতীতি করিতে পারে না; কিন্তু তখনই সে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, যখন কালক্রমে সে জ্ঞানেতে উন্নত হয়, অথবা নিজে বয়সের আধিক্যে সংসারে জনক-জননীর স্থান অধিকার করিয়া বসে।

আমাদের জন্মে ও জীবনে ঈশ্বরের যে অপরিমেয় করুণা ও প্রেম, তাহা সহজে আমাদিগকে ঈশ্বরের অভিমুখীন করে না; কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকা অমৃতের সন্ধানের প্রথম পথিপ্রদর্শক। জগতে ভয় বিপদ্ মৃত্যু না থাকিলে বুঝি সহজে কেহ তাঁহার সন্ধান লইতে প্রয়াসী হইত না। একই ধীর স্থির ও প্রশান্ত ভাবে জীবন কাটিতেছে, কোন ঝটিকা নাই, কোন আবর্ত্ত নাই, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ভাব। পরক্ষণে বিরহ-বিচ্ছেদ-বেদনা মৃত্যুর তরঙ্গ উত্থিত হইল। প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। রক্ষা পাইবার জন্য নিজের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না, নিজেকে দুর্ব্বল জানিয়া বাহিরের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ক্রমে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের দিকে কাতর দৃষ্টি পড়িল। জন্মে ও জীবনে তাঁহার যে অপরিমেয় করুণা ও প্রেম ভোগ করিয়াছি, তাহা সেই করুণাময়ী মাতার হস্তকে প্রদর্শন করাইতে পারিল না বটে। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া—ভয় বিপদ্ আসিয়া আমাদিগকে সচকিত করিল, আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, উপরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে ইঙ্গিত করিল।

আমাদিগকে ত জাগিতে হইবেই; কিন্তু কে আমাদিগকে জাগ্রত করিবে? তাঁহার করুণা তাঁহার অযাচিত প্রেম আমাদিগকে জাগাইতে পারে! তিনি আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া শত শত উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু রোগ যতই কঠিন, রোগ-নাশের ঔষধ ততই বলবত্তর হওয়া চাই। আমরা সংসারে নিমগ্ন, মৃত্যু-চিন্তা ভিন্ন কেহই আমাদিগকে সচকিত করিয়া এত সহজে আমাদের চৈতন্যসম্পাদন করিতে পারে না। জীবন অনিত্য, ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, শত সহস্র উপভোগের বিষয় হইতে একদিন বিদায় গ্রহণ করিতেই হইবে, তোমার সৌন্দর্য্য—অতুল্য বৈভব কিছুই থাকিবে না, তোমার এ দেহ একদিন ভস্মসাৎ—ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে!—এ চিন্তা সত্যসত্যই বৈরাগ্যের বিজলি হৃদয়ে জ্বালাইয়া দেয়, এ চিন্তাতে অভিমান-অহঙ্কার দূরে পলায়ন করে, ষড়্‌রিপুর পরাক্রম অচিরে খর্ব্ব হইয়া যায়।

এ দেশে এক সময়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন অগ্নিতে হব্যকব্য প্রদান করিতেন। সে অগ্নিকে তাঁহারা নির্ব্বাণ হইতে দিতেন না। মৃত্যু হইলে সেই আজন্মপোষিত অগ্নিতেই তাঁহাদের দেহের সংকার হইত। অগ্নির উপাসক না হইলেও আমরা বলিতে পারি, যিনি দেহান্তকারী অগ্নিকে—মৃত্যুকে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার বাসনা কি ঘৃণিত পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

দিল্লীর কোন এক প্রতাপান্বিত মোগল বাদশাহ আপনার চিত্তকে সুশাসিত করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুচিন্তা ভিন্ন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি এক সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুখশয্যা হইতে উঠিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার সময়ে রাজদরবারের প্রবেশ পথেই জনৈক দৌবারিক সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—'জাঁহাপানা, কোথায় আপনার কবর খোলা হইবে; দেখাইয়া দিন।' এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া যাইত। অপরিমেয় ভোগ্য-সামগ্রীর ভিতরে সত্যসত্যই মৃত্যুচিন্তার স্থান নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রাতে এইরূপে যে মৃত্যুর বিভীষিকা বাদশাহের মনে সমুদিত হইত, তাহাতে তাঁহার দেহের প্রতি কেশাগ্র দাঁড়াইয়া উঠিত, শরীর কণ্টকিত হইত; ইহা হইতেই তাঁহার দিবসব্যাপী রাজকার্য্যের প্রতি-আদেশে অহঙ্কার ঔদ্ধত্য গর্ব্ব ও অত্যাচারের লেশমাত্র থাকিত না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি এক সময়ে কাশ্মীরভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত জনৈক মুসলমান সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। ঐ সন্ন্যাসীর সহিত মহর্ষির আলাপ হইলে সন্ন্যাসী মহর্ষিকে সঙ্গে লইয়া অদূরে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্তের নিকটে গিয়া কহিলেন, আমি প্রতিদিন এক কোদাল করিয়া মাটি তুলিয়া এই গহ্বর খুলিতেছি; আমার কবরস্থান নিজেই খনন করিয়া যাইতেছি, এইখানেই আমার মৃতদেহের সমাধি হইবে। নৃশংস

মৃত্যুর সঙ্গে কি আশ্চর্য্য আত্মীয়তা স্থাপন! মহর্ষি তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

আমরা ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য পরমদেবের উপাসক। আমরা কেবল স্রষ্টা পাতা বিধাতা দেবের উপাসক নহি, আমরা মৃত্যুর দেবতার—সংহর্ত্তারও উপাসক। সেই সংহর্ত্তাকে কোন দেশে কোন জাতি প্রীতি-কৃতজ্ঞতার বিমল অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারে নাই; কিন্তু এই আর্য্যজাতিই সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের দেবতার সহিত মৃত্যুর দেবতার একত্ব স্থাপন করিয়া ওঙ্কাররবে তাঁহার সিংহাসন যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে। তাঁহারা জ্ঞানযোগে জানিয়াছিলেন—পরব্রহ্মের আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি, তাঁহার আনন্দেই জগতের স্থিতি, প্রয়াণকালে—মৃত্যুসময়ে তাঁহারই আনন্দে আমাদের গতি।—ইহা অমোঘ ঋষিবাক্য। সত্যসত্যই মৃত্যুতে বিষাদ নাই, ক্রন্দন নাই, নিরাশা নাই, হাহুতাশ নাই, তাঁহারই আনন্দধামে প্রবেশ—তাঁহারই আনন্দরাজ্যে চির-বসতি। এই মৃত্যুই আমাদিগকে অমৃতের সম্বল আনিয়া দিক্, আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুক্, আমাদের ধর্ম্মজীবনকে বিগঠিত করুক, ঈশ্বরের বিমল জ্যোতি দেখাইয়া দিক্। মৃত্যুচিন্তাই আমাদিগকে আশান্বিত করুক্, আমাদের দিব্যচক্ষু ফুটাইয়া দিক্। হে প্রণবের দেবতা! তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও; মৃত্যুর ভাব দেখাইয়া আমাদিগকে অমৃতে আকর্ষণ কর, বৈরাগ্যভাব অন্তরে বিকাশিত কর। ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নানা কথা।

হিন্দুধর্ম্ম।—যিশুখৃষ্টপ্রচারিত ধর্ম্ম-মতই বাইবেলের সর্ব্বস্ব। মোহামদের মতামত হইতেই মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি। খৃষ্ট ও মোহাম্মদ, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মের মূলে; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিভিন্ন সময়ে কত অসংখ্য লোকের উপদেশ লইয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত, সুমার্জ্জিত ও বিগঠিত। প্রকৃতির বৈচিত্র্যে তত্ত্বান্বেষীর বিস্ময়াভিভূত হৃদয়ে এই ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত। প্রকৃতির অন্তরালে যে গুপ্ত-শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার সন্ধানে এধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তন। বৈদিক স্তুতিগুলি তিন হাজার বৎসরের বহুপূর্ব্বে গীয়মান ও রচিত। খৃঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া উপনিষদের প্রভাবকাল; দর্শনের কাল খৃঃপূঃ ৫০০ বৎসর হইতে খৃষ্টাব্দ ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত। তাহার পর বিভিন্ন সংগ্রাহককর্ত্তৃক পৌরাণিক যুগের প্রবর্ত্তন। অষ্টমশতাব্দীতে শৈবদলের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে উদয়ন ও রামানুজের উৎপত্তি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের জন্ম; এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহনরায়ের উৎপত্তি। হিন্দুধর্ম্ম কি, ও তাহার নিকট কি পাওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিতে হইলে এই বিভিন্ন স্তরের মতবাদগুলির আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। Calcutta University magazine July.

বৌদ্ধবিরোধ।—উদয়নাচার্য্য একাদশশতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধগণের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিয়া দেন; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই তাঁহার উদ্দেশ্য; বৌদ্ধমত নির্ব্বাসিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধগণকে প্রায়ই পরাভব করিতেন; কিন্তু তথাপি বৌদ্ধেরা নিজ পরাজয় স্বীকার করিত না। কথিত আছে, একদিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৌদ্ধগণকে ঈশ্বরের অস্তিত্বস্বীকারে পশ্চাৎপদ দেখিয়া তিনি একজন বৌদ্ধ ও আর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন; এবং তাহাদের উভয়কেই পর্ব্বত হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ 'ঈশ্বর আছেন' এই বলিতে বলিতে অক্ষতশরীরে ভূমিতে আসিয়া পড়িল; আর বৌদ্ধ 'ঈশ্বর নাই' বলিতে বলিতে ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল বটে, কিন্তু লোকে নরহন্তা বলিয়া উদয়নাচার্য্যের কুৎসা করিতে লাগিল; ইহাতে উদয়নাচার্য্য বিশেষ সন্তপ্ত হইয়া পুরীধামে গমন করেন এবং তথা হইতে বারাণসীতে আসিয়া তুষানলে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেন।

The same paper.

ভাষা।—পৃথিবীর জনসংখ্যার ভিতরে প্রতি-শতে ২১ জন ইংরাজি-ভাষায় কথোপকথন করে, এবং ১৬ জন জর্ম্মাণ-ভাষায়, চৌদ্দজন চীন-ভাষায়, প্রায় চৌদ্দ জন ফরাসি-ভাষায় কথা-বার্ত্তা করিয়া থাকে। চীনদেশের জনসংখ্যা যথার্থরূপে পরিগৃহীত হইলে, চীন-ভাষা বোধ হয় এইবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

Review of Reviews June. p-599

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৪৩৲
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৩৮॥৵০
সমষ্টি	...	৩১৮১॥৵০
ব্যয়	...	৪১৯।/৩
স্থিত	...	২৭৬২। ৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত

সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১৬২।৯

২৭৬২।৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫০।০
পুস্তকালয়	...	৪/০
যন্ত্রালয়	...	১৮৪৸৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৩৸০
সমষ্টি	...	৪৪৩৲

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৪৯॥০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪০।/৩
পুস্তকালয়	...	৫৫॥৩
যন্ত্রালয়	...	১৬৫৶৯
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৮৸০
সমষ্টি	...	৪১৯।/৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	২৲
শ্রীমতী হেমলতা দেবী	...	২৲
শ্রীমতী সুকেশী দেবী	...	২৲
শ্রীমতী ধীরবালা দেবী	...	২৲
শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	...	২৲

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন।

মুখ্য বেদান্ত উপনিষদ্, তদর্থ-নির্ণায়ক গৌণ বেদান্ত ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থকে আমরা বেদন্তদর্শন বলিয়া ব্যবহার করি। বেদান্তদর্শন সর্ব্বপরিচিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। পূর্ব্বকালে যে সকল মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অভিহিত দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং উক্ত দর্শনকে সুগম করিবার জন্য নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই দর্শনের বিষয়-বিভাগে যে কত গ্রন্থ আছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য এতদ্দর্শনোক্ত পথের প্রধান পথিক। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ব্যাস-মহর্ষির সূত্রভাগ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতমত প্রচার করেন। সেই জন্য তৎসম্বলিত বেদান্তদর্শনকে কেহ কেহ শাঙ্করদর্শন বলিয়াও উল্লেখ করেন, এবং অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায় অদ্বৈতদর্শনও বলিয়া থাকেন।

এই বেদান্তশাস্ত্র—তিন প্রস্থানে, অর্থাৎ তিন মহাবিভাগে বিভক্ত। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়। উপনিষদগুলি শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা প্রভৃতি স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্যাসকৃত শারীরকসূত্র ন্যায়প্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূজ্যপাদ শঙ্কর এই তিন বিভাগেরই ব্রহ্মাদ্বৈত-প্রতিপাদক মহাভাষ্য রচনা করিয়া কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষিবেদব্যাস-কৃত বেদান্তসূত্রগুলি সর্ব্বতোমুখ। উহাকে যিনি যে ভাবে দেখেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেরই অর্থ স্ফুরিত হয়। উহার ব্যাখ্যা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় প্রকারেই প্রকাশ করা যাইতে পারে। সেইজন্য এই দর্শনের অনেকগুলি অবান্তর প্রস্থান প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামানুজ-প্রস্থান এবং মধ্বাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুসারে মাধ্বপ্রস্থান ইত্যাদি।

অধ্যায়বিভাগাদি।

অভিহিত দর্শনের অধ্যায়বিভাগাদি এইরূপ—বেদান্তসূত্রে। গ্রন্থ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে

অস্ফুটার্থ শ্রুতিসমূহের ব্রহ্মবোধকতানিশ্চয়, চতুর্থে সাংখ্যাভিমত প্রধান-পদার্থের (প্রকৃতির) সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব প্রভৃতি বিচারদ্বারা দর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে সন্দিগ্ধার্থ শ্রুতিস্মৃতির ব্রহ্মপরতা নির্ণয়, দ্বিতীয়পাদে শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমত নিরাস, তৃতীয়পাদে সৃষ্টিক্রমপ্রসঙ্গে আকাশের জন্যত্বস্থাপন, এবং চতুর্থপাদে প্রাণতত্ত্ব প্রভৃতি অভিহিত হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে জীবের সংসারগতির ক্রম, দ্বিতীয়পাদে জগতের অবস্থাভেদাদি, তৃতীয়পাদে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারাদি, এবং চতুর্থপাদে বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের মুক্তিপ্রয়োজকতা প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদে সাধনবিচার, দ্বিতীয়পাদে প্রাণনির্গমাদি, অর্থাৎ মৃত্যুবিষয়ক বর্ণনা, তৃতীয়পাদে দেবযান-পিতৃযান প্রভৃতি পারলৌকিক পথের বিচার, এবং চতুর্থপাদে মুচ্যমান জীবের পরজ্যোতিঃপ্রাপ্তিপ্রকারাদি অভিহিত হইয়াছে। এই সকল অধ্যায় ও পাদে প্রসঙ্গাগত অনেক তত্ত্বকথা ও রহস্যবিষয় দর্শিত হইয়াছে।

অধিকারি-নির্ব্বাচন।

বেদা[illegible]র প্রধানপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। এই দর্শনের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ, আর সব মিথ্যা। ব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও দুঃখসম্পর্কের অতীত হওয়া যায়। এইসকল বিষয় বেদান্তদর্শন উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরন্তু মনুষ্যসাধারণ, এই পথের পথিক হইতে পারে না, কোন বিশেষ অবস্থাপন্ন মনুষ্য এই পথের পথিক হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। সেই উপযুক্তপাত্র অধিকারী বলিয়া এতদ্দর্শনে অভিহিত হয়। অধিকারী ব্যক্তি বেদান্তমতের অনুসরণ করিলে মুক্ত হইতে পারে বটে, পরন্তু অনধিকারী ব্যক্তি সহসা এই পথে পদার্পণ করিলে ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া পড়ে। সেই জন্য অগ্রে আপনাতে জ্ঞানলাভোপযোগী সামর্থ্য উৎপাদন করা আবশ্যক। অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র বা অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

বেদান্তাচার্য্যেরা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভ করা সহজসাধ্য নহে। তজ্জন্য অগ্রে অনেক কার্য্য করিতে হয়। অধ্যয়নবিধির বশে থাকিয়া প্রথমতঃ বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়, স্থূলতঃ সে সকলের অর্থ হৃদ্গত করিতে হয়, কামনাপরিত্যাগী হইয়া শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্ম্মে রত থাকিতে হয়, এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত উপনিষদ্শাস্ত্রোক্ত উপাসনানিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হয়। পরে যখন দেখিবেক, চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, রাগদ্বেষাদি মনোমল অপগত হইয়াছে বা উন্মার্জিত হইয়াছে, তখন চারি প্রকার সাধন অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম জানিবার জন্য সচেষ্ট হইবেক। চারি প্রকার সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভে অধিকারী হওয়া যায়, এবং অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিলে, সে ইচ্ছা অচিরাৎ ফলপ্রদা হইয়া থাকে, নচেৎ অনধিকারীর ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা আর দরিদ্রের রাজ্যলাভেচ্ছা সমান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

সাধনচতুষ্টয়।

বলা হইল—চারি প্রকার সাধনে সিদ্ধ, অর্থাৎ অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। তাহা কি কি ? বলা যাইতেছে।

১। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক।

১। ঐহিক পারত্রিক ভোগে বৈরাগ্য।

১। শমদম প্রভৃতি ছয়প্রকার সাধনে অভ্যস্ত হওয়া।

১। মুক্তীচ্ছা, অর্থাৎ সংসারবন্ধন-ছেদনের বলবতী ইচ্ছা।

প্রথম সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহসংসারে কোন্ বস্তু নিত্য ও কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহা চিন্তাসহকৃত বিচারদ্বারা জানা ও স্থিরকরা। অবশেষে ইহাই স্থির করা যে, একমাত্র ব্রহ্ম নিত্য, আর সব অনিত্য। দ্বিতীয় সাধনের কথা এই যে, কি ইহলোকের বৈষয়িক স্থান, কি ভবিষ্যৎ পরলোকের স্বর্গাদিস্থান, কোনও স্থলে আমার প্রয়োজন নাই। সমস্তই নশ্বর, সমস্তই অলীক, সমস্তই কল্পনা মাত্র। তৃতীয় সাধনের বিবরণে ছয় প্রকার অনুষ্ঠান লব্ধ হয়, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। অর্থাৎ ব্রহ্মশাস্ত্রাতিরিক্ত শাস্ত্রশ্রবণে বিরত হওয়া, জ্ঞানানুকূল বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরে ধাবমান মনকে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাবৃত্ত করা, জ্ঞানবিরোধ কার্য্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, মানাপমান সুখদুঃখ ও শীতোষ্ণ প্রভৃতি সহ্য করিবার সামর্থ্য উৎপাদন করা, ও চিত্তকে সদা ব্রহ্মতত্ত্বে ও তদনুকূল বিষয়ে নিবিষ্ট রাখা, গুরুবাক্য ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বস্ত হওয়া ও আমি সংসারে মুক্ত হইবই, তদ্রূপ দৃঢ় ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হওয়া।

উল্লিখিত প্রকার অধিকারী বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম লাভের জন্য উদ্যুক্ত হইলে তাহারই উদ্যোগ সফল হইবেই হইবে, ইহা বেদান্তাচার্য্যদিগের দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

গুরূপসর্পণ।

অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ গুরূপসর্পণ করা কর্ত্তব্য। গুরু তাদৃশ অধিকারী শিষ্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্রধানতঃ অধ্যারোপ-যুক্তি ও অপবাদ-যুক্তি অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন,—এ বিধি, অর্থাৎ এই শাস্ত্রের আদেশ গুরুর প্রতি বিদ্যমান রহিয়াছে। গুরু তাহার অন্যথা করিবেন না।

উপদেশাধিকারী গুরুর কথা।

অনধিকারী শিষ্য যেমন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হয়, তেমনি অনধিকারী গুরুও শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ করিতে অপারগ হন। কিরূপ গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ করিতে পারেন, ব্রহ্ম বুঝাইতে পারেন, তাহাতে বেদান্তশাস্ত্রে 'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদ-বেদান্তাদিশাস্ত্রপারগ ও নিজে ব্রহ্মজ্ঞ এরূপ গুরুই শিষ্যে আপনার ব্রহ্মজ্ঞতা সংক্রামিত করিতে পারেন, অন্য গুরু তাহা পারেন না। শাস্ত্র জানেন না, বুঝাইবার উপযুক্ত বিবিধ উদাহরণ কথা জানেন না, অথচ ব্রহ্মজ্ঞ, এরূপ গুরুর দ্বারা বোধনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না। শাস্ত্র জানেন, অনেক প্রকার দৃষ্টান্ত কথা জানেন, অথচ নিজে ব্রহ্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বা সন্দিহান, এরূপ গুরুর দ্বারাও বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প আছে। গল্পটী এই—

মরুদেশবাসী এক অধ্যাপক এক শিষ্যকে অমরসিংহকৃত কোষগ্রন্থ পড়াইতেছিলেন। অমরকোষের যে স্থানে নারিকেলগাছের নাম লিঙ্গাদি বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানটা পড়ান হইলে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—নারিকেল গাছ কিরূপ?' প্রশ্ন শুনিয়া অধ্যাপক হতজ্ঞান হইলেন, তিনি কখন নারিকেল গাছ দেখেন নাই, কেবল এইমাত্র শুনিয়াছিলেন যে, নারিকেল গাছ পূর্ব্বদেশে জন্মে। আমি কখন নারিকেল গাছ দেখি নাই, নারিকেল গাছ কিরূপ

তাহা জানি না, এ কথা বলিলে শিষ্যের নিকট হতমান হইতে হয়; সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ শিষ্যকে একটা কিছু বলিয়া বুঝান আবশ্যক, ইহা মনে করিয়া বলিলেন, 'স তু প্রাগ্‌দেশীয়লতাবিশেষঃ।' অতএব, শাস্ত্রজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান উভয়জ্ঞান না থাকিলে শিষ্যবোধনকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই বেদান্তের কথা 'তং গুরুমভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' সংসারানলপ্রতপ্ত অধিকারী ব্যক্তি বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া বেদান্তাদিশাস্ত্র পারগ ও ব্রহ্মজ্ঞ এরূপ গুরুর নিকট গিয়া তৎসকাশে ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিবেন। গুরুও অধ্যারোপ ও অপবাদ ও তন্মধ্যের যুক্তির অনুগামী হইয়া শিষ্যকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ করিতে থাকিবেন।

অধ্যারোপ কথার অর্থ—যে ক্রমে এই ভ্রমদৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এবং অপবাদকথার অর্থ—যে ক্রমে এই ভ্রমসৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা। এতদ্ভিন্ন, আরও অনেক যুক্তিযুক্ত উদাহরণাদি ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপাদনার্থ অবলম্বনীয়।

ব্রহ্মলক্ষণ নির্দ্দেশের কথা।

কোন কিছু বুঝাইতে হইলে, তাহার লক্ষণ বলিতে হয়। লক্ষণ বলিলেই শ্রোতা তদনুসারে বস্তু চিনিয়া লইতে পারে। এ নিয়ম ব্রহ্মোপদেশেও অবিচাল্য। অর্থাৎ ব্রহ্মোপদেশ করিতে হইলে, প্রথমে ব্রহ্মের লক্ষণ কি, বলা আবশ্যক। শাস্ত্রে লেখা আছে, ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য দুই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এক প্রকারের নাম স্বরূপলক্ষণ, অন্য প্রকারের নাম তটস্থলক্ষণ, যে সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্ম বুঝান হইবে, সে সকল যদি ব্রহ্মের অনতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে সে লক্ষণ স্বরূপলক্ষণ বলিয়া ধার্য্য। আর বিশেষণ গুলি লক্ষ্যভূত বস্তুর স্বরূপাতিরিক্ত হইলে, সে লক্ষণ তটস্থ বলিয়া ধার্য্য। ইহার বিবরণ পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রকাশ্য।

ক্রমশঃ—

সখা।

যৌবনে দৈহিকপ্রকৃতির ক্রমপুষ্টি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও ক্রমপুষ্টি ও ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে।

বুভুক্ষুব্যক্তি যেমন 'সব খা'ব' বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করে, এবং যেমন যেমন পায়, তেমন তেমন খাইতে থাকে, সেইরূপ যৌবনে প্রথম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বুদ্ধিও 'সব ভোগ করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করে এবং বিষয় যেমন যেমন উপস্থিত হইতে থাকে, তেমন তেমন উপভোগ করিতে থাকে।

যুবক যে সে কর্ম্ম করিতে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে কে যেন নিষেধ করিয়া উঠে—'না, এ কাজ করিতে নাই।' আবার আর একটি কাজ করিবে না বলিয়া ঠিক করিলে, ভিতর হইতে কে যেন বলিতে থাকে—'সে কি! তোমাকে এইটি যে করিতেই হইবে।' এইরূপে যুবক নিজের আত্মা ভিন্ন, অন্তরের আর একজন দেবতার অস্তিত্ববিষয়ে অসন্দিগ্ধ হইয়া উঠে এবং সেই অন্তরের দেবতাকে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক, যুবকের ব্যস্ত হইবার বিশেষ কারণও আছে। যুবক দেখে যে, অন্তরের দেবতা কিছুই খান না ছোঁন না, অথচ সময়মত ভালমন্দ বুঝাইয়া দিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত। সে দেখে সদ্বৃত্তির গুরু-

গম্ভীর প্রেরণা,—সৎ-প্রবৃত্তির উত্তেজনা, মন্দ-প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; তখন যুবকাত্মা মহা একটা দোটানার মধ্যে পড়িয়া যায়,—কি করি, ভাল করি, কি মন্দই করি। এই সময়ে সেই অন্তরের দেবতা সেই দোটানার মধ্যে আসিয়া এবং মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন। সদ্বৃত্তির তীব্র উত্তেজনা অসদ্বৃত্তির উত্তেজনাকে তিরস্কার করিয়া থামাইয়া দেন। যুবকাত্মা সেই অন্তরের দেবতার ইঙ্গিত পাইয়া, সৎ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং ভাবসংগ্রামের শান্তিকারী এই অন্তরের দেবতার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য হয়; এবং সেই অন্তরের দেবতা যে কি উপাদানের বস্তু, তিনি যে কেন অকারণ এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার চরণে বাঁধিয়া রাখিতে চান, কেন যে সেই মঙ্গলভাবের অহৈতুক বিকাশ হয়, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ফলতঃ যুবকাত্মা ব্যস্ত না হইয়া পারে না। যিনি অকারণ বন্ধু, সন্দেহ সময়ে সুনিশ্চিত পথপ্রদর্শক, সাধু কার্য্যের সহায় ও উৎসাহদাতা, যাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, জীবনে শান্তি নাই, সেই অকারণসখার পরিচয় পাইতে যত্ন ও চেষ্টা না করিয়া যুবকাত্মা সুস্থই হইতে পারে না। এই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন;—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

'এক সহযোগী সুপক্ষ দুইটি সখা একটী সমান বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু সেই দুইয়ের মধ্যে অন্যতর একটি পক্ষী স্বাদুফল ভোগ করিতেছে, আর অন্যতর একটি পক্ষী স্বাদুফল ভোগ না করিয়াও (অন্যতর পক্ষীর ভোগের জন্য) অভিব্যঞ্জিত করিতেছে মাত্র।'

জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটিই সুন্দর পক্ষী; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। নাইবা সুন্দর হইবে কেন? উপনিষদ্ (মুণ্ডক) বলেন;—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ,
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ,
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥"

'যেমন সুদীপ্ত বহ্নিমণ্ডল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত স্ফুলিঙ্গ, সুদীপ্ত বহ্নির সমানরূপেই বিচ্ছুরিত হয়; হে সৌম্যদর্শন! সেইরূপে অক্ষর পরমপিতা হইতে সেই পরমপিতারই অনুরূপ নানাপ্রকার ভাব সকল—জীব সকল প্রজাত হয়, এবং তাঁহাতেই যাইয়া বিলীন হয়—মিশিয়া যা' তাই হইয়া যায়।'

সুতরাং সুদীপ্ত বহ্নিমণ্ডলের আভাই ত স্ফুলিঙ্গের আভা; পরমপিতার অনন্তরশোভন ক্ষুদ্রাংশ জীবাত্মাই বা তবে কেন সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত না হইবে? জীবাত্মা-ত তাঁহার অন্তরতম পরমাত্মার—পরমপিতার সহিত বিচ্যুত অবস্থায় নাই, সর্ব্বদাই একই স্থানে একই সঙ্গে অবস্থিত ও যুক্তই আছেন; তাঁহাদিগের মধ্যে আকাশেরও স্বল্প ব্যবধান নাই; তাঁহারা উভয়েই এই শরীরে সখ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, উভয়েই উভয়ের সখা। পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিতভাবে সম্বন্ধ; আশ্রয় হইতেছেন পরমাত্মা পরমপিতা, আশ্রিত হইতেছে জীবাত্মা যুবকাত্মা। পরমাত্মা পরমপিতা আশ্রিতবৎসল, প্রেম দান করিয়া পালন করিতেছেন; জগৎপ্রাণ পরমাত্মা প্রাণরূপে মৃত জগৎকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছেন, বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, জীবাত্মা—সঙ্কীর্ণপ্রাণ—যুবকাত্মা প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে থাকিয়া বাঁচিয়া আছে,

সংসারমণ্ডলে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছে; পরমাত্মা পরমপিতা বাৎসল্যবশতঃ ভোগের যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করিয়া সম্মুখে ধরিয়াছেন—ভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বুভুক্ষু জীবাত্মা অপূর্ণকাম বলিয়া—আত্মম্ভরী বলিয়া কেবল আপনিই ভোগ করে; কর্ম্মের ফল—প্রাপ্তব্য উপকরণসম্ভার পরমপিতার মহনীয় চরণপ্রান্তে রাখিয়া বলিতে পারে না, 'দেব! ইহাতে আমার কোনই অধিকার নাই, এ সকলই তোমার, তুমি প্রীত হও, জগৎ প্রীণিত হইবে; তুমি ইহার অধিকারী পরমপিতা, তুষ্ট হও, জগৎ তুষ্ট হইবে; আমি তোমার ভৃত্য, আজ্ঞা পালন করিয়া যাহা করিয়াছি, তুমি প্রভু, তুমি ঈশ্বর, তুমি স্বামী, তুমি তাহার অধীশ্বর, তুমিই তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা রাজা; তোমার ইচ্ছা—তোমার বাসনা পূর্ণ হউক।' এইরূপ বলিতে পারে না বলিয়াই "পিপ্পলং স্বাদু অত্তি" 'কর্ম্মফলের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া ভোগ করে।' আর পরমাত্মা পরমপিতা "অনশ্নন্ অভিচাকশীতি।" 'প্রতিগ্রহ না করিয়া বা ভোগ না করিয়া—অর্থাৎ আস্বাদন গ্রহণ না করিয়াই অভিব্যঞ্জিত করেন, প্রত্যুপস্থাপিত করেন—'এ তোমারই ভোগ্য উপকরণ সম্ভার'—যেন অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দেন,—এই সব তোমারই ভোগের উপকরণ সামগ্রী, তুমিই ইহার একমাত্র ভোক্তা, ভোগ কর।'

অহো কি মূঢ়তা! জীবাত্মা হেলায় পরমপিতার একমাত্র আশ্রয়িতব্য চরণকমলের অভিমুখী লোচন যুগলকে টানিয়া লইয়া অসম্বদ্ধ পরিত্যাজ্য ও কষ্টপ্রদ ভোগের উপকরণ সাম্ভারের উপরেই স্থাপন করে; স্বর্গ ছাড়িয়া নরকের প্রতিই ভালবাসা জানায়; সুখের উপেক্ষা করিয়া দুঃখকে আহ্বান করে; মঙ্গলে ঘৃণা করিয়া অমঙ্গলকে—আপদ্‌কে—অশান্তিকে আদর জানায়; ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এ স্থানের উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন;—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (২।৪৭)

তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার;

"মা ফলেষু কদাচন।" (২।৪৭)

ফলে কখনই নহে। তুমি ভৃত্য, প্রভুর আজ্ঞা পালন কর; কর্ম্ম করিয়া যাও; কর্ম্মের ফল কি হইবে, সে ফল কে ভোগ করিবে, কেন ভোগ করিবে, কিরূপে ভোগ করিবে, তাহা তোমার জানিবার বা শুনিবার আবশ্যক কি? আজ্ঞা পাইয়াছ, পালন কর, এই তোমার কর্ত্তব্য।

"মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ (২।৪৭

কর্ম্মফলের ভোগের কারণ তুমি হইও না; এ কর্ম্মের ভোগ আমি করিব, আমার ইহা হউক—আমি এই করিলাম বা করিতেছি, এ চিন্তা—এ বাসনা বা এ ইচ্ছা তুমি পোষণ করিও না—তাহাই কর্ম্মের ফলভোগের হেতু; কর্ত্তা তুমি হইও না, কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে তোমার সাহায্য যতটা আবশ্যক, সে সাহায্যটা তুমি করিও না।

"মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।" (২।৪৭)

তাই বলিয়া যে তুমি কর্ম্ম করিবে না—কর্ম্ম না করায় যে তোমার সঙ্গ—আসক্তি বা ভালবাসা, তাহাও যেন তোমার না হয়। কর্ম্ম না-করিতেও তুমি ভাল বাসিও না। তুমি যোগী হও, কর্ম্ম করিতে হইলে যে কৌশল জানা থাকা চাই, সেই কৌশল জানিয়া কর্ম্মকুশল হও—যোগী—হও।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

(গীতা) (৬।১)

কর্ম্মফলকে আশ্রয় না করিয়া, কর্ম্ম-ফলের আশ্রিত না হইয়া—কর্ম্মফলের দাস না হইয়া, যে কার্য্য-কর্ম্ম করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে, প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, কে ভোগ করিবে—ইত্যাদির সংবাদ না রাখিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন আজ্ঞা পালন করে, সে সন্ন্যাসীও বটে, যোগীও বটে, অথচ সে অগ্নির পরিত্যাগী নয়, ক্রিয়ায় বিমুখও নয়। সে সন্ন্যাসী কেন? —না, পরমপিতার চরণকমলেই দৃষ্টি রাখিয়াছে, ফলভোগের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করে নাই, পরমপিতার চরণপ্রান্তে স্বীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনের নিবেদন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছে, কর্ম্মের অধিকার ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, 'এর ফল প্রভো! তোমার' এই বলিয়া কর্ম্মের ফলও সম্যকরূপে ঈশ্বরচরণে ন্যাস করিয়াছে, সুতরাং সে সন্ন্যাসী। সে যোগী কেন?—না, কর্ম্ম করিতে কৌশল জানে, কি করিয়া কাজ করিলে, গায়ে তাপ না লাগে, অথচ কাজটিও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইয়া যায়, তাহার ও কৌশল জানে।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" গীতা (২।৫০)

কর্ম্মেতে কুশলতাই যোগ, কাজ করিবার কৌশলই যোগ, যে সেই কৌশল জানে, সে যোগী; সে যে কর্ম্ম না করে, তা' নয়; করে, অথচ—নিষ্কর্ম্মার ন্যায় কোন ভেজালেও পড়ে না, কাজ করিয়া দায়ী হয় না, ক্ষতিবৃদ্ধির ধার ধারে না, লাভ-লোক্‌সানের খবরই রাখে না, জয়পরাজয়ের দিক্ দিয়াও যায় না; কিন্তু সে কর্ম্মী, সে ব্যবসায়ী, এবং সে যোদ্ধা। যে এই উপদেশ মানিয়া চলে, সে ঐ মূঢ়তার পরিচয় দেয় না; সে এ পরিচয়ও দেয় না যে, পরমপিতার চরণে তা'র আসক্তি কমিয়াছে, তুচ্ছবিষয়ে প্রেম জন্মিয়াছে। সে পরিচয় দেয়—'পরমপিতার চরণপ্রান্তেই বসিয়া আছি, তা'ই ভাল বাসি'—এই মাত্র। সেই ত পিতার নিকট সখ্যভাবে স্থান পায়। সেই ত পরিচয় দেয়—পরমাত্মা ও জীবাত্মা, উভয়ে উভয়ের সখা। সেই ত পরিচয় দেয়—বহ্নিমণ্ডলের সুদীপ্তি ও স্ফুলিঙ্গের আভা সমান—একই;—উভয়েই সুপর্ণ—সুপক্ষ—অনন্তরশোভন—কেবল বাহিরের শোভা, বা কেবল ভিতরের শোভাই যে আছে, তা' নয়, বাহিরেরও শোভা আছে, ভিতরেরও শোভা আছে। সৈন্ধব যেমন ভিতরে বাহিরে লবণময়, ঐ উভয়ও সেইরূপ ভিতরে বাহিরে শোভন, সৈন্ধবঘনবৎ আনন্দঘন, মঙ্গলঘন, প্রেমঘন—সুপর্ণ। সেই পরিচয় দেয়—ঐ উভয়, উভয় বৃক্ষে আরূঢ় নহে, একই সংসার-বৃক্ষে উভয়েই আরূঢ়, কেবল সমান—একই সংসারবৃক্ষে যে আরূঢ়, তা' নয়, উভয়ে উভয়ের সযুক্—সহযোগী; পরমাত্মা-প্রাণরূপে জীবাত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, জীবাত্মা জীবিত বলিয়া যাহা কিছু করে, সব প্রাণেই আহুতি করে; পরমাত্মা এ সকলই সৃষ্টি করিয়া যুবকাত্মার ভোগের জন্য দিয়াছেন, সে সমস্তই যুবকাত্মা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া আবার পরমাত্মার ভোগের জন্য প্রতিদান করে। সে পরিচয় দেয়—

"তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।"
(গীতা ৩।১২)

তাঁহার দেওয়া তাঁহাকে না দিয়া যে ভোগ করে, সেইত চোরই। বাস্তবিকই—'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।' এ জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায়, সে সমস্তই জগৎ-পিতার। জগৎপিতা জগদীশ্বর নিজের লীলার জন্যই এ সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়াছেন।

যে তাঁহার জিনিষ, তাঁহাকে না বলিয়া লয়, সে ত চোরই। অতএব চৌর্য্যাপবাদ দূর করিবার জন্য যুবকাত্মার উচিত, যখন সে কোন দ্রব্য গ্রহণ করে বা ভোগ করে, তখন যেন বুঝিয়াই বলে,—'পিতঃ! তোমারি সব, তুমিই সব, এ যা' করিতেছি, তোমারই মঙ্গল ইচ্ছার সফলতার জন্য।' ইহা দ্বারা দুইটি হয়;—একটি চৌর্য্যাপবাদ দূর, আর একটি নিজের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ। এই হইল—'লোকদ্বয়সাধিনী চতুরতা।' এই চতুরতায় ইহলোক ও পরলোক, এ উভয়ই সাধিত হয়। যে এই চতুরতা জানে না, সে কেবল আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে, পরমপিতার সন্ধানই রাখে না, অথবা সন্ধান রাখিয়াও পরমপিতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে ত কুপুত্র; তাহার ইহলোক ও পরলোক, সাধিত হয় না, হয় কেবল পশুজীবন অতিবাহিত করা, আর চৌর্য্যাপবাদের দুর্ব্বিষহ ভার বহন করা, এবং পশুর ন্যায় না জানিয়া শুনিয়া বৃথা জীবন অতিপাত করা। অতএব যুবকাত্মার উচিত চৌর্য্যাপবাদ বহন না করা, মানুষের মত বিবেচনার সহিত পিতার নিকটবর্ত্তী হওয়া, কুপুত্র বলিয়া পরিচিত না হওয়া, সুপুত্র—প্রিয়সন্তান সখা বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

সে যে পরমপিতার সখা, তাঁহারই যুবকসন্তান,—এ পরিচয় দিবে কে? গুহ্য ব্রহ্মবিদ্যাই পরিচয় দিবে, সত্যই আবরণমুক্ত হইয়া প্রকাশ করিবে, 'পিতা পুত্রের সখা, পুত্র পিতার সখা।' সখ্যভাব কার্য্যাভিব্যঙ্গ্য;—কার্য্য দ্বারা সখ্যভাব প্রকাশ করিতে হয়, কথায় নহে; সুতরাং কাজ করিতে হইবে; কাজ করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, 'পিতা আমার সখা।' কাজ না করিয়া মুখে বলিলে, কপটতাই প্রকাশ হয়। এক সময়ে অর্জ্জুন এইরূপ কপটতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর পরম সখা পরমপিতা, তাহা তিনি কাজে প্রকাশ না করিয়া কথায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণকে 'হে যাদব! 'হে কৃষ্ণ! 'হে সখে! ইত্যাদিরূপে কথায় সখ্য-ভাব প্রকাশ করিতেন; কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে 'বিশ্বরূপ' দেখাইলেন, যখন অর্জ্জুন পরমপিতার অপারকরুণায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া দেখিলেন,—তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন, 'পিতাই সব, পিতারই সব,'—গীতা ১১ অধ্যায়।—'হায়! আমি কতই অপরাধ করিয়াছি। পুত্র, পিতার পূজা করিবে কাজে, স্তব করিবে কাজে'—ইহা বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন।

সখার কাছে এইরূপেই মন খুলিয়া বলিতে হয়, প্রাণ খুলিয়া বেদনা প্রকাশ করিতে হয়, হৃদয়ের চিরবদ্ধ কবাটকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেখাইতে হয়। তাহা হইলে, সখাও প্রেমাপ্লুত করে সখার মনঃপ্রাণ ও হৃদয়ের পাপ-তাপ মুছাইয়া পরমানন্দের বীজ রোপিত করেন, করুণার উৎস খুলিয়া করুণরসের উন্মত্তস্রোত তাহার আত্মাতে প্রবাহিত করেন। যুবকসন্তানের প্রাণ শীতল হয়, মন শান্তিময় হয় এবং হৃদয় আনন্দ ও করুণায় ভাসিয়া যায়। এইরূপেই পিতা-পুত্রের সখ্যভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "প্রবাসী" পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ "জি-দেলাফোঁর, গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ গবেষণা পূর্ণ বলিয়া তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা।

(জি-দে-লাফোঁর ফরাসী হইতে)

শত বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচ্য ভূভাগের পরিচয় যাহা কিছু আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা গ্রীক্ ও ল্যাটিন ইতিহাসের খণ্ডাংশ হইতে, এবং কতকগুলি দেশপর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে। প্রমাণের মধ্যে তখন একটি ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্র ছিল:—সেটি বাইব্‌ল্; সেই বাইব্‌ল্‌অনুসারে প্রাচীনজাতিদিগের মধ্যে শুধু একটি সভ্য জাতি ছিল:—সে-ই ইহুদি জাতি,—"নির্ব্বাচিত জাতি।" খৃষ্টজন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়; বিদিত ব্যবস্থাকর্ত্তাদের মধ্যে মুসাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখন সে কাল আর নাই—কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, পৃথিবী গঠিত হইতে কোটি কোটি বৎসর লাগিয়াছিল; ভূতত্ত্ববেত্তারা বলেন,—লক্ষ বৎসর হইল, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। বহু অনুশীলন ও অনুসন্ধানের ফলে,প্রাচ্য জগৎ এখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত যে সত্য ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সুপ্ত ছিল, সেই দীপ্যমান সত্য অন্ধকার ভেদ করিয়া এখন উদিত হইয়াছে। আমাদের যুগের পূর্ব্বে, বিদ্যা-জননী মিসরে ৫০০০ বৎসরব্যাপী সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। কীর্ত্তিস্তম্ভ, পিরামিড, সমাধিমন্দির, মিসরের ত্রিশটা রাজবংশ—এই সমস্ত, মিসরের ঔপন্যাসিক প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। শঙ্কু-আকৃতি অক্ষরের আবিষ্কার হওয়ায়, ক্যাল্ডিয়া ও অ্যাসিরিয়ারও কতকটা গূঢ় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। জানা গিয়াছে যে, যিশুখৃষ্টের পূর্ব্বে উহাদের সভ্যতা ৪০০০ বৎসরের পুরাতন। চীনসভ্যতার আরম্ভকাল, প্রাগৈতিহাস-কালের মধ্যে এতটা বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, চীনভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা মধ্য-চীন-সাম্রাজ্যের সভ্যতার কাল নির্দ্দেশ করিতে সাহস পান না। পরিশেষে, William Jones, Colebrooke, Burnouf, Lassen, Max Muller, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারত ও পারস্য দেশের প্রধান প্রধান গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা আরও অধিক বিস্মিত হইয়াছেন; কেননা, তুলনা-সিদ্ধ শব্দতত্ত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের দ্বারা দ্বির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসিক জাতি, গ্রীক্ জাতি, ল্যাটিন্ জাতি, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতি, কেল্‌ট্-জাতি —ইহারা সকলেই একই কাণ্ডের বিভিন্ন শাখা। যে সময়ে মুসা (Moses) মিসর হইতে বহির্গত হয়েন (Exodus), সেই সময়ে ভারতের যে সভ্যতা ছিল, তাহার তুলনা নাই; দর্শন ও ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি, ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসের বড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের ঐ সকল মূল-উৎস হইতেই তাঁহাদের চিন্তা-ঘট পূর্ণ করিয়াছেন। Fernon বলিয়াছেন, "এসিয়ার চুল্লি হইতেই আলোক বাহির হইয়া আমাদের দেশগুলাকে আলোকিত করিয়াছে।" এবং Panthier তাঁহার "প্রাচ্যখণ্ডের ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর" ভূমিকায় আরও এই কথা বলিয়াছেন:—"সূর্য্যের উদয়কালের সহিত প্রাচী-র যেমন সংস্রব, জগতের সমস্ত শৈশবস্মৃতির সহিত প্রাচ্য দেশের তেমনি সংস্রব। প্রাচ্য ভূমির সৈকত-সমুদ্রে কত কত জাতি শয়ান; এই প্রাচ্য ভূমি চিরকালই বর্ত্তমান। প্রাচ্যখণ্ড এখনও তাহার বক্ষের উপর মানব-জাতির প্রথম প্রহেলিকা ও আদিম স্মৃতিগুলি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি দার্শনিক তত্ত্ব—সকল বিষয়েই প্রাচ্যখণ্ড পাশ্চাত্যখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব আমাদের নিজেকে জানিতে হইলে, উহাকে জানিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক।"

আমাদের সভ্যতার জন্য আমরা প্রাচ্যখণ্ডের নিকট ঋণী। শিল্পকলার মধ্যে যদি চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাকী আর সমস্ত শিল্পকলা আমরা প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছি মাত্র। দর্শন কিংবা ধর্ম্মঘটিত যে সকল তত্ত্ব এখন আমরা আমাদের নিজস্ব বলিয়া জানি, তাহাদের মধ্যে এমন একটি তত্ত্বও নাই, যাহার মূলসূত্র প্রাচীন জাতিরা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বাস্তুবিদ্যার কথা যদি বল, —তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ কীর্ত্তিমন্দিরের চাপে আমরা নিষ্পেষিত বলিলেও হয়। সে সময় তাহাদের সভ্যতা আমাদেরই মত উন্নতি লাভ করিয়াছিল; তা'ছাড়া, কোন কোন প্রাচীন জাতির আচার-ব্যবহারের মধ্যে যে একটি মাধুর্য্য দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আচার-ব্যবহারের সম্বন্ধে আমরা আর অহঙ্কার করিতে পারি না।

Bournouf-এর কথা-অনুসারে, ব্রাহ্মণিক ভারতের অসাধারণ সভ্যতার শুধু একটা প্রমাণের আমরা উল্লেখ করিব। সে কথাটি সভ্যতার ইতিহাসে অনন্য-সাধারণ। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে এমন কতকগুলি নাটক ছিল, যাহা একেবারেই দার্শনিক; তাহার পাত্রগণ কতকগুলি মানসিক ভাব মাত্র। তাহার একটি দৃষ্টান্ত:—"প্রবোধ চন্দ্রোদয়।" Bournouf উপসংহারে এই কথা বলিয়াছেন:—ইহা হইতে অনুমান করা যায়, ভারতীয় নাটকের এরূপ শ্রোতৃমণ্ডলী ছিল, যাহা—কি প্রাচীন,কি আধুনিক, কোন নাট্যালয়েই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর একটা ব্যাপার,—হিন্দুজাতির মধুর প্রকৃতি ও উচ্চ জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। মেগাস্থিনিস্ বর্ণনা করেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত

ভই পক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে, হিন্দু-কৃষক শান্তভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে দেখিয়া গ্রীকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি বলেন.—"কৃষকের শরীর পবিত্র, কৃষক অবধ্য,—কেননা, কৃষক শত্রু-মিত্র উভয়েরই হিতকারী।"

১৪০০ বৎসরের পুরাতন বাইবেলের 'পুরাতন বিধান গ্রন্থ;' খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান আচার্য্যেরা নব-বিধান গ্রন্থের সহিত পুরাতন-গ্রন্থটি জুড়িয়া দিয়া একটা ভারী ভুল করিয়াছেন;—খৃষ্টধর্ম্মের উপর একটা দুঃসহ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহার ফলে, পরম্পরাক্রমে অনেকগুলি ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে; সমস্ত খৃষ্টীয়মণ্ডলী ইহা স্বীকার করেন। খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল মুখ্য ভ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি এই যে, ইহুদি জাতিই নির্ব্বাচিত জাতি—ঈশ্বরের-নির্ব্বাচিত।

নির্ব্বাচিত জাতি কেন?—খৃষ্টীয় আচার্য্যেরা বলেন, যে হেতু, পুরাকালে শুধু ইহুদিজাতিই একেশ্বরবাদী ছিল, ইহুদিরাই এক অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরকে জানিত।

এরূপ অভিমানের কথা আজিকার দিনে আর গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মিসর, চাল্‌ডিয়া ও বাবিলনের পুরোহিতেরা, তাঁহাদের দীক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের একত্বসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বেদ, মানবধর্ম্মশাস্ত্র, প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ, পারসিকদিগের আবিস্তা—এই সমস্ত হইতে পর্য্যাপ্তরূপে সপ্রমাণ হয় যে, হিন্দু ও পারসিকেরা পরব্রহ্মের একত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিত।

আরিস্‌টটেল তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন:—"যে সকল উপদেশ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহা পুরাণের আকারে ভবিষ্যদ্‌ বংশের নিকট উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, ঈশ্বরই জগতের সর্ব্বাদিম মূলতত্ত্ব এবং ঈশ্বরেরই শক্তি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশ, ইতর-সাধারণকে বুঝাইবার জন্য ও সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, গল্পচ্ছলে সংযোজিত হইয়াছে।"

এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, সমস্ত পুরাকালে, ধর্ম্মের গুহ্য মত কেবল অল্পসংখ্যক দীক্ষিত ব্যক্তির নিকটেই ব্যক্ত করা হইত; প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই, ধর্ম্মের গুহ্যাংশ কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ও ধর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ সাধারণ লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এমন কি, প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেণ্ট-পিটার ও সেণ্ট-পাউলের মধ্যে যে বাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছিল, তাহা হইতেই ইহা সপ্রমাণ হয়: সেণ্টপাউল গুহ্যধর্ম্ম প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেণ্টপিটার তাহাতে স্বীকৃত হন নাই—এই কারণে তাঁহাদের মধ্যে একটা পার্থক্য উপস্থিত হয়। আরও বহুকাল পরে, বিশপ Synesius এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন:—"জনসাধারণ নিতান্তই চাহে যে, তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা হয়। তাহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা ছাড়া আর উপায় নাই। মিসরের পুরাতন পুরোহিতেরা এইরূপ ব্যবহারই করিত; লোক ভুলাইবার জন্যই তাহারা দেবালয়ের মধ্যে আপনাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং সেই খানে থাকিয়া লোকের অগোচরে গুহ্য ব্যাপার সকল প্রস্তুত করিত। এ কথা লোকেরা যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই রুষ্ট হইত। তাই, সাধারণ লোকের সহিত সাধারণ লোকের মতই ব্যবহার করিতে হয়। আমি নিজে চিরকাল তত্ত্বজ্ঞানীর মতই থাকিব; কিন্তু লোকের নিকট আমি কেবলই পুরোহিত।"

পুরাতন মিসরের লোকেরা যে কেবল জীব-জন্তুরই উপাসক ছিল, এই অসঙ্গত কাহিনীটা নিতান্তই অমূলক, সন্দেহ নাই। ইহুদি জাতিকে যে ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত জাতি বলা হয়, আমরা দেখাইব, ইহুদি জাতি সে সম্মানের যোগ্য নহে। যে ঈশ্বরের জন্য ইহুদি জাতি এত গর্ব্বিত, সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কিরূপ ছিল? তাহারা ঈশ্বরকে মানুষের ভাবে দেখিত; তাহাদের ঈশ্বরের কল্পনা মানবসাদৃশ্যমূলক কল্পনা; ইহুদিদের ঈশ্বর শরীরী ঈশ্বর। সৃষ্টি-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে, ঈশ্বর মানুষকে নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ সৃষ্টি করেন; ঈশ্বর পার্থিব স্বর্গে বিচরণ করেন; তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন, তিনি অনুতাপ করেন, বিস্মৃত হয়েন, তিনি স্মরণ করেন। মুসার বহির্গাত্রার (Exodas) প্রকরণে, ঈশ্বর, নিয়মাবলী স্বহস্তে লিখিয়াছেন। কি প্রস্তর খোদিত করিয়া, কি চিত্র কর্ম্মের দ্বারা, তাঁহার মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। এই ঈশ্বর—উচ্ছেদকারী-ঈশ্বর—যিনি পিতা মাতার অপরাধের জন্য, তাহাদের সন্তানের উপর তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত প্রতিশোধ লয়েন, এই ঈশ্বর ইহুদি জাতিরই ঈশ্বর, অন্য জাতির ঈশ্বর নহেন; এবং যখন তিনি ইহুদি জাতির প্রতি রুষ্ট হইলেন, মুসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমাকে নিরস্ত করিও না, আমার প্রজ্বলিত রোষানল ইহুদিজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলুক।" এইত ইহুদিদিগের একেশ্বরবাদের ধারণা; তা'ছাড়া একেশ্বরবাদের ধারণাকে তাহারা বজায় রাখিতে পারে নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা বিদেশী দেবতাদের নিকট বলি দিত, ইহুদিদিগের ভবিষ্যদ্বক্তারা ও ইহুদিদিগের ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ইহুদিদের "মাথাগুলা নিরেট।" ইহুদি জাতি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের ভাব এতই কম বুঝিত যে, ওলড্‌টেষ্টেমেণ্ট খুঁজিয়া আত্মার

অমরত্বসম্বন্ধে একটি কথাও পাওয়া যায় না ; সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইহুদিদের ইতিহাস,—চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, খুন, লোকহত্যা, আরও অন্যান্য জঘন্য আচরণের সুদীর্ঘ বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এক্ষণে ইহুদি জাতির ঈশ্বরের ধারণার সহিত, আর্য্য-জাতির ঈশ্বরের ধারণার তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে ব্রহ্ম, ক্লীবলিঙ্গ, নামহীন, মনের অগম্য, ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। মনুর লক্ষণানুসারে,—"যিনি স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, বহিরিন্দ্রিয়ের অগম্য, নিত্য, বিশ্বের অন্তরাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।" তিনিই পরিপূর্ণ, নির্ব্বিকার, উপাধিহীন, নির্ব্বিশেষ। সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন, জগৎ সৃষ্টি করিয়াই তিনি ব্রহ্মা নামের বাচ্য হইলেন ; পুংলিঙ্গবাচক এই ব্রহ্মা সৃজনশক্তিরূপে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত।

পারস্যদেশীয় আর্য্যদের মধ্যেও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এই একইরূপ ধারণা :—Zervane—Ackerne ইনিও নিষ্ক্রিয়, শান্ত ; আত্মপ্রকাশ করিবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতেই শুভ ও অশুভের মূলতত্ত্ব—অর্মজ্‌দ্ ও আহরিমান নিঃসৃত হইয়াছে। পারসিকদিগের দ্বৈতবাদসম্বন্ধে যে ভ্রম সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই ভ্রমটি প্রসঙ্গক্রমে এই খানে সংশোধন করিয়া দিই। জের্ব্বান—আক্রেরেণ এক অদ্বিতীয় বস্তু ; কিন্তু অর্মজ্‌দ্ আহরিমান এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব, যমজ হইলেও সমান নহে। ফলতঃ মঙ্গলের মূলতত্ত্ব অর্মজ্‌দ্ প্রথমে জন্মগ্রহণ করে ; অর্মজ্‌দ্ আহরিমান অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্ এবং কল্পকালের অন্তে, আহরিমান একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। আর গ্রীক্ আর্য্যদের কথা যদি বল, সকলেই জানে,—পিথাগোরাস, সক্রেটিস্ ও প্লেটো, পরমেশ্বরের একত্ব অবগত ছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে উপদেশও দিতেন। প্লেটো ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন ; অ্যারিষ্টটেল্ বলিয়াছেন, "তিনি সেই চিৎ-যাহা আপনাকে আপনি চিন্তা করে।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্য্যদিগের অতীন্দ্রিয় ধারণা ও ইহুদিদিগের মানবিক ধারণা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উহার মধ্যে একটি যেমন উন্নত ও দার্শনিক, অন্যটি তেমনি স্থূল ও সীমাবদ্ধ।

ভারত প্রভৃতির যখন উন্নত অবস্থা, তখন ইহুদি জাতির অস্তিত্বই ছিল না, এমন কি, উহারা প্রাচীন গ্রীকদিগেরও পরে সমুদ্ভূত হইয়াছে। উহাদের এই স্পর্দ্ধাবাক্যের ভিত্তি কি ?—না, উহারাই কেবল ঈশ্বরকে জানিত। আর সে ঈশ্বর :কিরূপ ঈশ্বর ?—তিনি মহাশক্তিমান্, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ঈশ্বর, সৈন্যসামন্তের ঈশ্বর, সর্ব্বোচ্ছেদক, যথেচ্ছাচারী, বৈরনির্য্যাতক, নিষ্ঠুর ঈশ্বর ; মিসরে মহামারী আনয়ন করিবার উদ্দেশেই এই ঈশ্বর "ফ্যারাও"র হৃদয়কে পাষাণকঠিন করিয়া দিয়াছিলেন ; মনুষ্যের কোন এক বংশকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অনুতাপ হইল এবং সেই বংশকে তিনি প্রলয়বন্যায় ডুবাইয়া মারিলেন। এখন খৃষ্টানেরা তাঁহাদের মধুর-প্রকৃতি মহাপুরুষ যিশু-খৃষ্টকে এই ঈশ্বরেরই পুত্র বলিয়া কি স্বীকার করিতে পারেন ? হায় ! অষ্টাদশশতাব্দী-কালব্যাপী অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে কত ভ্রমই বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে ! কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে ; বিজ্ঞান, খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় জটিলতার নিরাকরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আর্য্যজাতির মতবাদের কিয়দংশ, খৃষ্টধর্ম্ম আলেকজান্দ্রিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে এবং অল্প অংশই সেমিটিক জাতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা প্রাচীনকালের আর্য্য-ধারণার অনেকটা কাছাকাছি ; সেই ঈশ্বর বিশ্বের ঈশ্বর, তিনি শুদ্ধাত্মা ও পরিপূর্ণ। এবং খৃষ্টবাদ ও আর্য্যমতবাদ উহা সেমিটিক্ মতবাদ নহে।

অবতারবাদও আর্য্যমতবাদ—উহা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ায়, Hypostases নামে এই মতবাদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। এই মতবাদ হইতেই "একে তিন, তিনে এক" এই ত্রিত্ববাদের জন্ম হইয়াছে। বাইবেলের পূর্ব্বভাগে, এরূপ কোন মতবাদই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহুদিধর্ম্মের সহিত উহাদের কোন সংস্রব নাই। তা'ছাড়া, Burnouf তাঁহার "ধর্ম্ম বিজ্ঞান" গ্রন্থে কি বলেন শোনো :—"খৃষ্টানদের সমস্ত দার্শনিক মতবাদই জেন্দাবেস্তার মধ্যে আছে :—যথা, এক ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর, অন্তরাত্মা ঈশ্বর, ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, পিতৃজাত পুত্র, শরীরের প্রাণ ও আত্মার পাবন। পতনবাদ, উদ্ধারবাদ, আরম্ভে ঈশ্বরের সহিত অসীম আত্মার সমবায়, যে অবতারবাদ ভারতে প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেই অবতারবাদের কিঞ্চিৎ আভাস, ধর্ম্মসম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, Amschaspand ও Darvend নামক শুভ ও অশুভ দেবদূত, আমাদের অন্তরে যে ঈশ্বরের বাণী অবস্থিত, সেই বাণীর প্রতি অবাধ্যতা, এবং মুক্তির আবশ্যকতা—এই সমস্ত কথাও উহার মধ্যে পাওয়া যায়। আবেস্তা-ধর্ম্মে পশুবলি নাই। ইহুদিরাও খৃষ্টীয় পুনরুত্থান উৎসবে মেষ-বলি উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে মানসিক বলি প্রবর্ত্তিত করে। মতবাদ ছাড়িয়া, যদি খৃষ্ট ধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠান, সাংকেতিক চিহ্ন, ও ধর্ম্মভোজ আদির (sacrament) কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে

পাওয়া যাইবে, ইহুদি ধর্ম অপেক্ষা আর্য্য ধর্ম্মাদি হইতেই উহার অধিকাংশ গৃহীত হইয়াছে :—যথা অগ্নি ও সুরাপাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন, ক্রুসের চিহ্ন, খৃষ্টের পুনরুত্থান উৎসবে ব্যবহার্য্য মোম-বাতি, কোন কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য্য তৈল,—এই সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের সামগ্রী। অবগাহন-সংস্কার (baptism), দোষস্বীকার-প্রথা, আচার্য্য-নিয়োগ-অনুষ্ঠান, মস্তকমুণ্ডন—এ সমস্ত ব্রাহ্মণিক ধর্ম হইতে গৃহীত। সকল আর্য্য-ধর্ম্মের মধ্যেই বিবাহ সংস্কার প্রচলিত ছিল। পুরোহিতদিগের চিরব্রহ্মচর্য্য, দোষস্বীকার, অনুতাপ,—এই সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মঠ, সঙ্ঘ, ধর্ম্মপ্রচার—এই সমস্ত জন্য খৃষ্ট-মণ্ডলী বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ঋণী।

Saint Basile বৌদ্ধ মঠের আদর্শে তাঁহার বৃহৎ ধর্ম্মসমাজ গঠিত করিয়াছিলেন।

আর সন্ন্যাসী-তপস্বী-সম্প্রদায়ের কথা যদি বল, যিশুখৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ সকল সম্প্রদায় ব্রাহ্মণিক ভারতে ছিল।

ক্যাথলিক পাদ্রিদের মধ্যে পুরোহিত-শ্রেণীর যে সোপানপরম্পরা আছে, তাহার অবিকল আদর্শ বৌদ্ধ-তিব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ডালাই-লামা আছে,—লামাদের সভায় সেই ডালাই-লামা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই লামারা তাহাদের পদমর্য্যাদা অনুসারে, ক্রুস ধারণ ও "metre" টুপি, শাদা আলখাল্লা প্রভৃতি পরিধান করিয়া থাকে। চীনের ক্যাথলিক পাদ্রি father Bury চীনের পুরোহিতদিগকে, ক্যাথলিক পাদ্রির মত মুণ্ডিত-মস্তক দেখিয়া, ও জপমালা ব্যবহার করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—"আমাদের মধ্যে এমন একটিও পরিচ্ছদ নাই, পৌরোহিতিক কর্ম্ম নাই, ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই,—সয়তান যাহার নকল এ দেশে করে নাই।" "গৌতম সম্বন্ধে আলোচনা" নামক গ্রন্থে Gerson da Cunha আরও এই কথা বলেন :—"এই সম্প্রদায় (যাহারা "মহা-যান"-মতাবলম্বী), অনেক বিষয়ে রোমানক্যাথলিকদিগের সহিত উহাদের মিল দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মঠ আছে, শুধু তাহা নহে, ধর্ম্মপদবীতে উন্নত ভিক্ষুশ্রেণী আছে, মস্তকমুণ্ডনপ্রথা, চিরব্রহ্মচর্য্য ও স্মারকচিহ্নের পূজা ও পাপস্বীকার পদ্ধতিও উহাদের মধ্যে আছে। উহাদের মোচ্ছব আছে, সমবেত উৎসব-যাত্রা আছে, প্রার্থনা-সংহিতা আছে, ঘণ্টা আছে, জপমালা আছে, শান্তিজল আছে এবং উহারা সিদ্ধমহাপুরুষদের মধ্যবর্ত্তিতায় বিশ্বাস করে।" উৎপত্তির হিসাবে ইহুদিধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মসমূহের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যে অধিক যোগ, তাহা বোধ হয় যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

সেমিটিক্ ধর্ম্মসমূহের সহিত ইহুদিধর্ম্মের একটা তুলনাত্মক সমালোচনা করিলেই ইহুদিধর্ম্মের উৎপত্তি এবং ইহুদিধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। আসীরীয়দিগের ঈশ্বর যেমন জিহোবা, মুসলমানদের ঈশ্বর যেরূপ আল্লা, ইহুদিদের ঈশ্বর সেইরূপ জিহোবা। সমস্ত সেমিটিকজাতির মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-কল্পনা একই প্রকার—ইলু (যাহা হইতে এলোহিম, আল্লা, এল উৎপন্ন) যাহার অর্থ মহাশক্তিমান্,—কি পুরাতন কি আধুনিক, সমস্ত সেমিটিক জাতির ঈশ্বর এই নামেই পরিচিত—এই ঈশ্বর আদেশ-প্রচারক প্রভু; আসীরীয়দিগের মধ্যে ইনিই অসুর, এবং দেশের রাজা ইহঁারই মন্ত্রী; ইহুদিগের মধ্যে ইনিই জিহোবা এবং মুসাই তাঁহার প্রবক্তা; মুসলমানদের মধ্যে ইনিই আল্লা, এবং মহম্মদই আল্লার "নবী" বা প্রবক্তা।

অসুর, জিহোবা ও আল্লা, বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; নরহত্যার দ্বারা তাঁহাদের নাম প্রচারিত হয়, এবং তলোয়ারই তাঁহাদের সাংকেতিক চিহ্ন ছিল। তাঁহাদের লইয়া যে যুদ্ধ, তাহা দিগ্বিজয়ের যুদ্ধ—ধর্ম্ম প্রচারের যুদ্ধ; এইস্থলে দিগ্বিজয় ও ধর্ম্মপ্রচারের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। "লেশমাত্র দয়া প্রদর্শন করিবে না"—ইহাই তাঁহাদের বীজমন্ত্র ছিল। এই সকল ঈশ্বর বিশ্বজনীন ঈশ্বর হইতে পারে নাই; অসুর, চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে; জিহোবার উপাসকেরা পৃথিবীর সর্ব্বাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে মুসলমান ধর্ম্ম কত কত সভ্যতার ভগ্নাবশেষের উপর স্বীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহারও প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়াছে। মধ্যযুগে যে ইস্লাম-ধর্ম্ম য়ুরোপের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই ধর্ম্ম আজ পরাভূত হইয়াছে। কি স্পেন, কি আফ্রিকা, কি ইজিপ্ট, কি তুর্কি, কি ভারতবর্ষ—এই সমস্ত দেশের আর্য্যদের নিকট ঐ ধর্ম্ম হটিয়া গিয়াছে। এইরূপ রোমকগণকর্ত্তৃক ইহুদিরা ও আর্য্য-পারসিকগণ কর্ত্তৃক আসীরীয়েরা বহিষ্কৃত হইয়াছে।—

ইহুদিজাতি হইতে খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। উহাদের সভ্যতা অতীব সীমাবদ্ধ; মিশর দেশ হইতে বাহির হইবার সময়, মিশর দেশ হইতে এবং যে ব্যাবিলোনিয়া ও পারস্যদেশ উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিল,—ঐ দুই দেশ হইতেও উহারা কতকটা সভ্যতা প্রাপ্ত হয়।

উহারা পশ্চাৎশিরস্ক (Occipital) জাতি,—অর্থাৎ ঐ সকল জাতির মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ, পুরোভাগ অপেক্ষা অধিক পরিপুষ্ট। উহাদের দৈহিক বৃদ্ধির দ্রুততা প্রযুক্ত মাথার খুলির অস্থিগুলা, ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই, পরস্প-

ষের সহিত দৃঢ়রূপে যোড়া লাগিয়া যায়; সুতরাং মস্তিকের ধূসর অংশ পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, আর্য্যজাতীয় লোকের করোটীর (মাথার খুলী) অস্থিখণ্ডগুলা বেশী বয়সে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণরূপে যোড়া লাগে এবং এই কারণে উহাদের সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয় না। এই দেহতাত্ত্বিক প্রভেদপ্রযুক্ত, কোন সেমিটিক জাতির পক্ষে, কোন প্রকার সমুন্নত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়।

বিভিন্ন সভ্যতা, একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়; প্রত্যেক সভ্যতা পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি গ্রহণ করিয়া, তাহার নিজের বিশেষ প্রতিভার দ্বারা আবার তাহা হইতে নূতন পরিণাম-পরম্পরা উৎপাদন করে। অতএব, এইরূপ সহসা মনে হইতে পারে যে, প্রাচীনসভ্যতা সমূহের উত্তরাধিকারী পাশ্চাত্য সভ্যতা অবশ্য প্রাচীনসভ্যতাসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট; কিন্তু তথ্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় না। কোন জাতির শ্রেষ্ঠতা তিন জিনিসের উপর নির্ভর করে—দর্শন, ধর্ম্মনীতি, ও শিল্পকলা। বৈষয়িক সভ্যতা, জ্ঞানধর্ম্মের সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। স্পিনোজা, লাইব্‌নিজ, কাণ্ট, দেকার্ত্ত্ হইতে আরম্ভ করিয়া ফিক্‌তে, স্পেন্‌সার, শপেন্‌হৌয়র পর্য্যন্ত, আমাদের মধ্যে এমন একটিও দর্শনতন্ত্র নাই, যাহা আমাদের নিজস্ব রত্নখনি হইতে উৎপন্ন; আমরাও এখনও গ্রীক্ দর্শনসম্প্রদায়ের দর্শনাদির অনুশীলন করিয়া থাকি; আবার এই গ্রীকেরা তাহাদের দার্শনিকতত্ত্বসকল গোড়ায় মিসরদেশীয় পুরোহিত ও ভারতের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আসিয়া, আলেকজান্দ্রীয়সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল; এবং সমস্ত পাশ্চাত্যখণ্ড সেই ভাণ্ডার হইতে আপন আপন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। Saint Jerome, Magnusকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এইরূপ আছে:—"খৃষ্টধর্ম্মের আচার্য্যদের কথা আর কি বলিব, যে প্রাচীনদিগের মত তাঁহারা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত, সেই প্রাচীনদিগের অন্নেই তাঁহারা পরিপুষ্ট।"—যত কিছু উন্নত নীতি-উপদেশ, তাহা ভারত ও চীন হইতেই আসিয়াছে। পীত-জাতির মধ্যে আবার এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যে, উহারা ঈশ্বরের কল্পনা বর্জ্জন করিয়া, শুধু ধর্ম্মনীতির ভিত্তির উপর, উহাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। আমার প্রণীত "মনু ও ভগবদ্গীতা" গ্রন্থে আমি যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে ব্রাহ্মণিক ভারতের অতীব উন্নত ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই মধুর-প্রকৃতি শাক্যমুনির এই সকল নীতি সূত্র—যথা "কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে ক্ষমা করিবে"; "ক্ষুদ্রতম জীবকেও হিংসা করিবে না" "দরিদ্র ও ধনীকে সমভাবে দেখিবে"—এই সকল উপদেশ বাক্য অতিবড় নিষ্ঠুর জাতিদিগকেও সভ্য করিয়া তুলিতে,—কোমল ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। এ কথা সত্য, অবনতিগ্রস্ত ভারত, পারস্য, গ্রীস ও রোমের চিত্র, যাহা আমাদের সম্মুখে এখন রহিয়াছে, তাহা বড় একটা গৌরবজনক নহে; কিন্তু আমি এ কথা বলিতে পারি না, আমাদের সভ্যতার চিত্র উহাদের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে।

ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ, পাষণ্ড-দলনী বিচার-সভা, (Inquisition) দাসত্বপ্রথা—এই সমস্ত পাশ্চাত্যসভ্যতার রক্তময় কলঙ্ক; আরও কাছাকাছি সময়ের কথা যদি ধর,—৮৯র রাষ্ট্রবিপ্লব—স্বাধীনতা ও ন্যায়ের যুগ উদ্ঘাটন করা যাহার উদ্দেশ্য ছিল—সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের রক্তাপ্লুত আতিশয্য ও অত্যাচার, বুদ্ধদেবের শান্তিময় বিপ্লবের কথা মনে করাইয়া আমাদের চিত্তকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে।

লোকে যাহার এত নিন্দা করে, সেই হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথাও আমাদের মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্র,—উহাদের অপব্যবহার সত্ত্বেও,—সভ্যতাকে যে অনেক পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তা'ছাড়া, যে অবিনশ্বর মূলতত্ত্বগুলির উপর বর্ণভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত, সেই বর্ণভেদপ্রথা কি যুরোপেও আজিকার দিনে রহিত হইয়াছে? রহিত যে হয় নাই, তাহার সাক্ষী—যুরোপের সোশ্যালিষ্ট ও অ্যানার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের আন্দোলন। বর্ণভেদপ্রথা যে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু যে মূলতত্ত্ব হইতে বর্ণভেদপ্রথার উৎপত্তি, সেই মূলতত্ত্বটি নিজে ন্যায়ানুমোদিত এবং তাহার পরিণামও মহৎ ও বহুফলপ্রদ। সভ্যতা-সমূহের পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু মানুষ সেই মানুষই থাকিয়া যায়। শব্দের পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রাহ্মণিক ভারতে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু হইলেও, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী; ঊনবিংশশতাব্দীর যুরোপে, ধনপতিই প্রভু,—পণ্ডিত নহে, সন্ন্যাসীও নহে। "ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—" আজিকার দিনে সৈনিকতার (militarism) একশেষ; অনির শাসনতন্ত্র, ন্যায়-ধর্ম্মের উপর বলের প্রাধান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বৈশ্যের স্থান বড় বড় কারখানাওয়ালারা অধিকার করিয়া, তাহাদের মূলধনের চাপে ক্ষুদ্র বণিক্‌দিগকে নিষ্পেষিত করিতেছে। এখনকার শূদ্র-শ্রমজীবী, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া, উত্থান করিয়াছে ও Socialism-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনকার চণ্ডাল, পারিয়া,—সেই দরিদ্রগণ, যাহারা ন্যায়বিচার পায়

না, সেই আইরিশ লোক,—নিজ ভিটা-ভূমির উপর যাহাদের কোন অধিকার নাই—যাহারা একপ্রকার মাষ্টিক বুভুক্ষার গ্রাসে পতিত হইয়াছে, যাহারা তপ্ত-লোহার ছাঁকা দেওয়া দাগী গোলাম! মনুর সমস্ত নীতি-উপদেশ অনুসারে, নিক্তির ওজনে কাজ হইত না সত্য ; কিন্তু একথাও নিশ্চিত, যে জাতি ওরূপ উচ্চরাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধার্ম্মিক আদর্শ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে তাহাদের সেই কল্পনাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার সাক্ষ্য দিতেছে। কোন্ রাজা কিংবা কোন্ পার্লেমেণ্ট আজিকার দিনে ব্যবস্থাসংস্কারের নেতৃত্ব সাহসপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে ? জুয়া খেলা ও কপাল-ঠোকা বাজির খেলা নির্ভীকভাবে নিষেধ করিতে পারে ? মনু কিন্তু তাহা করিয়াছেন। আমাদের ব্যবহার-চরিত্র দূষিত হইয়া পড়িয়াছে ; কাঞ্চনের প্রলোভনে আমাদের রাষ্ট্রশাসক লোকেরা, আমাদের লেখকেরা আমাদের শিল্পীরা আমাদের পাদ্রিরা, আমাদের অভিজাত বর্গ, নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এখন বাকী রহিল শিল্পকলা ; এবিষয়ে একটু তারতম্যের বিশেষত্ব আছে। পুরাকালে, বাস্তশিল্প বিষয়ে,—মিসর, আসীরিয়া, ও গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান আসন ছিল, এখনও উহাদের কেহ প্রতিদ্বন্দী নাই। ছুঁচাল খিলানের শিল্প ছাড়া, পাশ্চাত্য-খণ্ড, এই বিষয়ে কিছুই নূতন উদ্ভাবন করে নাই, কেবলই দাগবং নকল করিয়াছে। ভাস্করকর্ম্মে গ্রীকেরা চিরকালই আমাদের শিক্ষাগুরু ; গ্রীকদের ও এক্রুরিয়া-বাসীদের মৃণ্ময় পাত্রাদি আমাদের নিকট বিশেষ প্রশংসার জিনিস। তবে, আমাদের শ্রেষ্ঠতা (ইহা বড় কম গৌরবের কথা নহে) সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উন্নতিসাধনে ; কেবল এই বিষয়েই নিজত্ব ও নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়া আমারা পুরাতনজগতের সমক্ষে স্পর্দ্ধার সহিত উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের ইহাই তুলনাসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত চিত্র। অবশ্য, ব্যবহারিক বিজ্ঞান-রাজ্যের বড় বড় আধুনিক আবিষ্কার সকল, আমাদের প্রধান সম্বল ও প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক ; কিন্তু আসলে উহাদের মূল কোথায় ? ন্যায়তঃ যাহার যে প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত ; অতএব প্রাচ্যখণ্ডকে ভাল করিয়া বুঝিলে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, প্রাচ্য খণ্ডই সেই সূর্য্য, যেখান হইতে আমরা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন কুলপতির ন্যায় প্রাচ্য-ভূমিকে আমাদের ভক্তি করা উচিত, যেহেতু আমরা তাঁহারই বংশধর। একথাও যেন আমরা বিস্মৃত না হই, যে সময়ে আমরা পশুচর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া, য়ুরোপের বিস্তীর্ণ অরণ্যে, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলাম, সেই সময়ে প্রাচ্যখণ্ড, সভ্যতার দীপ্ত-আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE

(TRANSLATED FROM BENGALI,)

God's Omnipresence.

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কং
দ্বৌসন্নিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ
উতেয়ং ভূমি র্বরুণস্য রাজ্ঞঃ উতাসৌদ্যৌ র্বৃহতী দূরে অন্তা
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ।

অথর্ব্ববেদ ৪অ: ৭প্র: ।

Whoso moves, stands or rests, whoso seeks a hiding place in dark cells and lonely caves, King *Varuna* knows it all. If two sit together and scheme, King *Varuna* is there as the third and perceives it also—রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ। Nothing lies hidden, none can remain concealed from Him. Whosoever hide in dark recess or lurks in secret cell, *Varuna* detects him and spies his movements. If any two men should hold good or evil counsel among themselves, the King is there, a third, and sees it all. Realizing God's perpetual presence in your midst, fear to commit sin and zealously devote yourselves to the performance of good works. Remember that the Father and Mother of us all, is always with us, watching all our movements. No sin that we commit can ever remain hidden from Him. Let His presence deter you from evil deeds and His loving and encouraging eyes impel you to deeds of righteousness. When we do good, His benign countenance is revealed unto us and the fierceness of His wrath alights upon our evil actions. He knows when we are doing wrong and when we are walking in righteousness and metes out his rewards and punishments according to our deserts.

Ekohamasmityatmanam yattvam kalyana manyase—Friend, thou thinkest thou art alone, but it is not so.

Nityamsthitaste hridyesha punya papekshita Munih That all-seeing witness sitteth enthroned in thy heart, looking on at thy good and evil deeds.

This idea is clearly expressed in our Text of the *Atharvaveda*. Whoever moves or stands or rests, who seeks a hiding place in caves and cells, *Varuna* knows it all. Where two persons are closetted together, in secret council, He is there a third. He is the fourth amongst three, the fifth among four, the

sixth among five. If a hundred people are here gathered together, then you must add one more to the number so as to include Him.

Who is this king *Varuna* ? He is described in the following *Mantra*: ইয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞঃ This boundless Earth is king *Varuna*'s. He is the Ruler of the whole universe. How strange it is that men should deem themselves kings by holding sway over petty kingdoms of this Earth. How baseless is their pride ! How empty their title ! *Varuna* is the real king not of this Earth only but also of yonder vast sky, whose bounds are far away. The two oceans of air and water find a place within his body and are supported by Him. He is not only in the deep sea but in this petty drop of water is he also hidden—অস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ।

He who is the Ruler of Heaven and Earth, who permeates all things, great and small, He is the God of our worship. He whos is king of the whole Earth and the Infinite heavens, He who is immanent in the oceans of air and water, smaller than small, greater than great, who is in the endless sky as also in this tiny drop of water, He is the God of our worship. He who is with us always, who encourages and rewards all righteous deeds, who when we succumb to sin delivers us from evil after punishing our transgressions, He is the God of our worship.

Long ages ago our *Rishis* in this *Atharva Veda* gave utterance to truths to which we still give the assent of our whole heart and which arouse feelings of the deepest reverence. In this *Mantra* of *Atharvaveda* how clearly we perceive God as the universal witness. The ancient *Rishis* have given expression to those thoughts that are nearest to our hearts. Truth is by no means confined to any particular period in the world's history but reveals itself at all times. As sparks fly out of the fire, as rays of light radiate from the sun, so Truth ever flows from God, its fountain-head. Holy and devout men cannot fail to attain spiritual truths, whenever, by piety and purity of character, they prepare the ground for their reception. Truth flows from God without ceasing, but alas ! few are the men fit to receive it.

What a blessing it is for us, born as we are in this unfortunate land, that we are able to worship the true God, the Infinite Brahman. What a blessing it is that we should come here to worship Him who is the ruler of the whole universe, Lord of men and *Devas*, to worship Him and be sanctified by His holy presence. This is indeed a blessed hour, a supreme moment of holy communion (*Brahmamuhurta*) As, seated in the heart of the sun, He illumines the whole world by its rays, in the same way, dwelling within our souls, He inspires our understanding and strengthens our conscience. With Him, our worshipful Lord, we are united in bonds of eternal fellowship. Brethern, let us fulfil our life's mission by worshipping Him together with love and reverence.

নানা কথা।

উপাধি লাভ। 'সুপ্রভাত'—সম্পাদিকা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, কাশী পণ্ডিত-সমাজ হইতে 'সরস্বতী' উপাধিতে বিভূষিতা হইয়াছেন। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত জয়রাম বেদান্তবাগীশ উপাধি-দাতাগণের মধ্যে অন্যতম। কুমুদিনীর পিতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী ব্রাহ্ম ও সুপ্রসিদ্ধ সঞ্জীবনী সম্পাদক। মাতৃকুলে ইনি আমাদেরই ভক্তি-ভাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী। ইঁহাতে পিতৃমাতৃ উভয় কুলই ধন্য হইয়াছেন। ইনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া সাহিত্য চর্চ্চায় ও স্বদেশসেবায় আরও যশস্বিনী হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ভজনালয়ের উপাসকের প্রতি দশটি আজ্ঞা।

১। যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভজনালয়ে উপস্থিত হইবে। ২। ভজনালয়ে (বেদীর) সম্মুখস্থ আসন অধিকার করিবে। ৩। প্রতি উপাসনার দিনে অন্ততঃ তিনজন অপরিচিত লোকের সহিত সখ্য-স্থাপন করিবে। ৪। প্রতিবেশীকে স্নেহ ভক্তি করিবে, তাহাদিগকে ভজনালয়ে আনিবার চেষ্টা করিবে; তাহাদের প্রতি তোমার ভালবাসার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়। ৫। আপনাকে ভজনালয়ের সুদৃঢ় স্তম্ভ বলিয়া বিবেচনা করিবে, এ ভাব মনে সর্ব্বদা জাগরুক রাখিবে যে তোমার অভাবে ভজনালয় যেন সত্য সত্যই বিনাশোন্মুখ। ৬। উপাসনার দিনে উপস্থিত থাকিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইবে। ৭। সর্ব্ববিধ মতভেদ বিবাদ বিসম্বাদের ভাব বাহিরে রাখিয়া ভজনালয়ে প্রবেশ করিবে এবং আপনাকে ঈশ্বরের পুণ্য পরিবারভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবে। ৮। উপাসকের কর্ত্তব্য সম্যকরূপে প্রতিপালন করিতে পারিলেই অপরের ত্রুটি বিচার করি-

যার তোমার অধিকার আছে, ইহা স্মরণে রাখিবে। ৯। উপাসনা দিনে উপাসকগণের মধ্যে আপনাকে অগ্রণী বলিয়া মনে করিবে। ১০। এইভাবে জীবন কাটাইবে যাহাতে তোমার জীবন দেখিয়াই লোকে তোমার ভজনালয়ের সমুচ্চ ভাব বুঝিতে পারে। The Christian life, 22nd august.

মোগল বাদশাহের দৈনিক জীবন। বাদশাহ সাজাহান প্রতিদিন প্রত্যূষে ৪ টার সময় শয্যা-ত্যাগ করিয়া বেশবিন্যাসান্তে প্রার্থনা ও কোরাণ পাঠ করিতেন। প্রাতে ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় দুর্গের পূর্ব্বদিকস্থ দর্শন-বাতায়ন হইতে প্রজাবর্গকে দেখা দিতেন। প্রজারা যমুনাতীরভূমিতে থাকিয়া দুর্গের তলদেশ হইতে আবেদন পত্র প্রদান করিত এব বাদশাহ সূতা ঝুলাইয়া দিয়া দিয়া ঐ সমস্ত আবেদন পত্র তুলিয়া লইতেন। অৰ্দ্ধঘণ্টার অধিক কাল এইরূপ ক্ষেপণ হইত। তাহার পর রণহস্তী বাদশাহের সম্মুখে আসিয়া বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করিত। পরে অশ্বনাদী আবিভূত হইত। ৭টা ৪০ মিনিটের সময় বাদশাহ প্রকাশ্য রাজসভায় দেওয়ানি আমে বসিতেন। (১৬২৮ খৃঃ অব্দে কাষ্ঠময় এই সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৬৩৮ অব্দে তাহার স্থানে ৪০টি স্তম্ভের উপর রক্তপ্রস্তরে বর্ত্তমান দেওয়ানি-আম বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার দৈর্ঘ ২০১ ফুট ও বিস্তার ৬৭ ফুট। রজত নির্ম্মিত রেলিং চারিধারে শোভা পাইত)। এইখানে প্রধান বক্সি Paymaster General আসিয়া সামরিক কর্ম্মচারীগণের আবেদন পত্র পেশ করিতেন; বাদশাহ তাহার উপর আদেশ প্রদান করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, তোপখানার অধ্যক্ষ, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং আদেশের সহিত বাদশাহ দত্ত উপদেশ ও বহুমূল্য পারিতোষিক লাভ করিত।

তাহার পরে বাদশাহের নিজস্ব ভূভাগের (crown lands) কর্ম্মচারী আসিয়া হিসাবাদি পেশ করিয়া আদেশ গ্রহণ করিত। তৎপরে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার শাসনবিবরণী ও বাদশাহ-পুত্রগণের আবেদন ও নিবেদন বাদশাহ নিজে কখন বা কর্ম্মচারীর মুখে শ্রবণ করিয়া তাহার উপর আদেশ দিতেন। তৎপরে শিক্ষার্থী, সুপণ্ডিত সেখ ও সায়েদগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ-সাহায্যের আবেদন পেশ হইলে বাদশাহ আবশ্যক মত সাহায্য দানের আদেশ দিতেন। পরে পূর্ব্বদিনের প্রদত্ত হুকুম কর্ম্মচারিগণ লিখিয়া আনিয়া বাদশাহ কর্ত্তৃক মঞ্জুর করিয়া লইত। তৎপরে বাদশাহের অশ্বশালার ভৃত্যেরা হস্তী ও অশ্বের সহিত তাহাদের খাদ্য লইয়া অদূরে দাঁড়াইত। হস্তী ও অশ্ব যাহাতে দুর্ব্বল না হয়, তাহার উপর বাদশাহ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ৯টা ৪০ মিনিটের সময় বাদশাহ দেওয়ানি-খাসে যাইতেন। সেখানে বসিয়া বাদশাহ নিজ হস্তে প্রয়োজনীয় আদেশ লিখিয়া দিতেন, কখন বা তিনি যাহা বলিয়া যাইতেন, উচ্চ কর্ম্মচারী তাহা লিখিয়া লইত। লেখা শেষ হইলে ঐ সমস্ত লিখিত আদেশ বাদশাহ নিজ হস্তে সংশোধন করিয়া দিতেন। পরে ঐ সকল আদেশ-পত্র অন্তঃপুরে যাইত এবং বেগম মমতাজ-মহল আপনার নিকট থাকা বাদশাহী-মোহর (Great seal) তাহার উপর ছাপ দিয়া দিতেন। পরে বাদশাহ নিজে মূল্যবান প্রস্তরের গঠন প্রণালী সন্দর্শন ও তত্ত্বাবধান এবং রাজকীয় প্রাসাদের নক্সা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। মন্ত্রী আসফ খাঁ বাদশাহের মন্তব্য লিখিয়া (architects) শিল্পীর নিকট পাঠাইয়া দিত, কখন বা প্রাসাদ নির্ম্মাণকারা বাদশাহের নিকট আসিয়া বাদশাহের অভিমত জানিয়া যাইত। পরে বাদশাহ শীকারের সহচর সুশিক্ষিত অশ্ব, ব্যাঘ্র ও শ্যেনপক্ষী নিজে সন্দর্শন করিতেন। পরে বাদশাহ সাহাবুরুজে (royal tower) যাইতেন। নিতান্ত গোপনীয় মন্ত্রণা সেখানে চলিত। বাদশাহ-পুত্র ও নিতান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ভিন্ন অন্য কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। বেলা ১২টার সময় বাদশাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন, সেখানে নেমাজ করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে একঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতেন। পরে সম্ভ্রান্ত দরিদ্রা অনাথা স্ত্রীলোক আসিয়া বেগমের প্রধানা পরিচারিকা সাতিউন্নিসা দ্বারা বেগমকে আপনাদের অভাব জানাইত। বাদশাহ প্রধানা বেগমের মুখে সমস্ত অবস্থা শ্রবণে আবশ্যক মত অর্থ-সাহায্য করিতেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় বাদশাহ নেমাজ করিয়া আবার দরবারে আসিয়া বসিতেন ও অবশিষ্ট রাজকার্য্য সমাপন করিতেন। সন্ধ্যাকালে বাদশাহ অন্যান্য প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহিত একত্রে নেমাজ করিতেন। সন্ধ্যার পরে দেওয়ানি খাসে রত্নখচিত আধারের উপর সুগন্ধ দীপালোক জ্বলিয়া উঠিত। এই সময়েও রাজকার্য্যের আলোচনা চলিত। পরিশেষে বিশুদ্ধ আমোদ ও সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিত। বাদশাহ নিজে সুগায়ক ছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সকলে সে আনন্দ উপভোগ করিত। রাত্রি ৮টার সময়ে বাদশাহ আবার সাহাবুরুজে যাইতেন এবং সেখানে রাজকার্য্য সম্বন্ধে গুহ্য আদেশ প্রদত্ত হইত। পরদিনের জন্য বাদশাহ আর কিছুই রাখিতেন না। সাড়ে আটটার সময় বাদশাহ অন্তঃপুরে যাইতেন এবং স্ত্রীকণ্ঠ-সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। পরে ১০টার সময় শয়ন করিতেন। পর্দ্দার বাহিরে থাকিয়া অপরে উচ্চরবে বাদশাহকে উপদেশগ্রন্থ, সাধুজীবনী, পূর্ব্ব রাজগণের ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনাইত। বাদশাহ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। এই কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও বাদশাহ প্রত্যূষে ৪টার সময় উঠিতেন। বলা বাহুল্য মোগল-বাদশাহ-জীবন বিলাসের জীবন ছিল না।

Indian Review. Sep.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

সপ্তদশ-কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯।
৭৮৪ সংখ্যা ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

তৃতীয় উপদেশ।

অন্যান্য অসম্পূর্ণ নীতিবাদ।

উদার-চেতা মনুষ্যমাত্রই স্বার্থনীতিকে পরিহার করিয়া, ভাবের নীতিকে আশ্রয় করে। নিম্নে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতেছি—যাহার উপর ভাবের নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে করিয়া ঐ নীতি প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়।

যখন আমরা কোন ভাল কাজ করি, তখন কি আমরা ঐ কাজের পুরস্কার স্বরূপ অন্তরে একপ্রকার সুখ অনুভব করি না? এই সুখ অবশ্য ইন্দ্রিয়-সুখ নহে: আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর যে সকল বিষয়ের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই সকল ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্বিত বিষয়ের মধ্যে ইহার কোন মূলসূত্র কিংবা ইহার কোন মানদণ্ড নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ হইলে যে সুখানুভব হয়, সে সুখের সহিত ইহার ঐক্য নাই। আমি কোন কাজে সফল হইয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, এবং আমি বরাবর সৎপথে চলিয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাব হয়—এই দুই ভাব এক প্রকার নহে। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যে সাক্ষ্য দেয়, সেই সাক্ষ্যের সহিত যে সুখ জড়িত তাহা বিশুদ্ধ; আর যত প্রকার সুখ—সমস্তই অতীব মিশ্র। এই সুখই স্থায়ী, আর সমস্ত সুখ শীঘ্রই চলিয়া যায়। দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও মানুষ আপনার অন্তরে একটা স্থায়ী সুখের উৎস দেখিতে পায়। কারণ, ভাল কাজ করিবার সামর্থ্য মানুষের সকল সময়েই থাকে; পক্ষান্তরে এরূপ অসংখ্য অবস্থা আছে যাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই, সেই সকল অবস্থা হইতে আমরা যে সুখ পাই তাহা অতি বিরল ও অনিশ্চিত।

যেমন ধর্ম্মের কতকগুলি সুখ আছে, সেইরূপ পাপেরও কতকগুলি দুঃখ আছে। কোন অপকর্ম্ম করিয়া আমাদের ক্ষণিক সুখ হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে আমরা যে কষ্ট পাই উহা সেই সুখের প্রায়শ্চিত্ত-পণ। এইরূপ সুখের নিত্য সহচর দুঃখ। দুঃখ আসিয়া এইরূপ কর্ম্মের কলুষিত সুখ ও

অবৈধ সফলতাকে বিষময় করিয়া তোলে। এই দুঃখ মানুষের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, জর্জ্জরিত করে, দংশন করে। ইহাই অনুতাপের যন্ত্রণা।

আরও কতকগুলি তথ্য, উহারই মত সুনিশ্চিত :—আমি একটি লোককে দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখে দুঃখদুর্দ্দশার চিহ্ন স্পষ্টরূপে প্রকটিত। উহাতে এমন কিছুই নাই যাহা আমার গাত্র স্পর্শ করিতে পারে—আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে; তথাপি কোন চিন্তা না করিয়াই কোন ফলাফল গণনা না করিয়াই, উহার কষ্ট দেখিবা মাত্র আমার কষ্ট হইল। ইহাই অনুকম্পা বা সহানুভূতির ভাব।

মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আমাদের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, মানুষের প্রফুল্ল-মুখ দেখিয়া আমাদের মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অন্যের আনন্দে আমাদের অন্তরে তাহার প্রতিধ্বনি হয়, এবং অন্যের দুঃখকষ্ট,-এমন কি, শারীরিক বেদনাও আমাদের শরীরে সংক্রামিত হয়। মাদাম সেভিঙে তাঁহার পীড়িত কন্যাকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা একটুও অত্যুক্তি নহে:—"তোমার বুকের ব্যথায় আমিও বুকের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছি।"

আমাদের হৃদয়কে, আমরা অন্যের সহিত একসুরে বাঁধিতে চাহি। এই কারণেই বড়-বড় সভায়, হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে বিদ্যুৎ ছুটিতে থাকে; পাশাপাশি লোকের মধ্যে ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকে। যেমন গুণমুগ্ধতা ও জ্বলন্ত উৎসাহ সংক্রামক, সেইরূপ আমোদ-কৌতুক ও বিদ্রূপ-পরিহাসও সংক্রামক। কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেও আমাদের মনে এইরূপ ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতার মনে যে ভাব অনুভূত হয় তাহারই অনুরূপ ভাব আমরাও অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যদি আমরা কোন অসৎ কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই অপকর্ম্মকারীর মনে যে ভাব উত্তেজিত হয়, আমাদের মন সেই ভাবের সহভাগী হইতে কখনই চাহে না; আমরা তাহার প্রতি বিমুখ হই; ইহা সহানুভূতি ও অনুরাগের বিপরীত ভাব—ইহা বিরুদ্ধানুভূতি; ইহাকে বলে বিরাগ।

আর কতকগুলি তথ্য পূর্ব্বোক্ত তথ্যের আনুষঙ্গিক হইলেও, তাহার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতার সহিত আমার যে শুধু সহানুভূতি করি তাহা নহে, আমরা তাঁহার শুভ কামনা করি, আমরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার হিতসাধন করি, আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাকে ভালও বাসি। যদি কোন মহৎকার্য্য, এই অনুরাগের বিষয় হয়, কিংবা কোন বীরপুরুষ এই অনুরাগের পাত্র হন, তবে এই অনুরাগ কখন কখন মত্ততার সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে। ইহাকেই পূজ্যবুদ্ধি বলে। ইহাই সেই পূজাঞ্জলি, যাহা বিশ্বমানব মহাপুরুষদের চরণে অর্পণ করে।

পক্ষান্তরে, যদি আমরা কোন মন্দকার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তবে সেই মন্দকার্য্যের অনুষ্ঠাতার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মে, এবং আরও অধিক—আমরা তাহার অনিষ্ট কামনা করি; আমরা ইচ্ছা করি, সে তাহার অপকর্ম্মের জন্য কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য মহাপরাধীরা আমাদের নিকট এত ঘৃণিত। এই ভাবটি শুধু বিরাগ নহে; ইহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাবও আছে। এই সকল মহাপরাধীরা আমাদের পথের কণ্টক বলিয়া আমরা তাহাদের অনিষ্ট ইচ্ছা করি। কোন ব্যক্তি

সৎ না অসৎ—এ বিষয় সম্বন্ধে বিদ্বেষ-বুদ্ধি কিছুই জানিতে চাহে না, শুধু ইহাই জানিতে চাহে, সে ব্যক্তি আমাদের পথের অন্তরায় কি না, সে আমাদিগকে অতিক্রম করে কি না, সে আমাদের অনিষ্ট করে কি না। কিন্তু আমরা যে ভাবটির কথা বলিতেছি তাহা একপ্রকার বিদ্বেষ যাহার মধ্যে একটু উদারতা আছে; যাহা স্বার্থ হইতে জন্মে না, যাহা শুধু ব্যথিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অন্যের প্রতি আমাদের যেরূপ বিরাগ জন্মে, সেইরূপ আমরা নিজে যদি কোন মন্দ কাজ করি, আমাদের নিজের উপরেও বিরাগ জন্মিয়া থাকে।

খুব সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে, সহানুভূতি যেমন হিতৈষণা নহে, নৈতিক আত্ম-তৃপ্তিও সেইরূপ সহানুভূতি নহে। কিন্তু সহানুভূতি, আত্মতৃপ্তি ও হিতৈষণা—এই তিনটি ব্যাপার, মঙ্গলভাবেরই সাধারণ লক্ষণ। এই তিনটি ব্যাপার হইতে তিনটি বিভিন্ন অথচ অনুরূপ নীতিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, তাহাই সৎকার্য্য যাহা করিলে আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ হয়, এবং তাহাই অসৎ কার্য্য যাহা করিলে অনুতাপ উপস্থিত হয়। কোন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেরূপ মনোভাব হয়, সেই অনুসারে সেই কার্য্যের ভাল মন্দ প্রথমেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পরে, ঐ ভাবটি আমরা অন্যের প্রতিও আরোপ করি। কারণ, কোন কার্য্য করিয়া অন্যের মনে কিরূপ ভাব হয়, তাহা আমরা নিজের ভাব হইতেই বিচার করিয়া থাকি।

আবার কতকগুলি দার্শনিক, সহানুভূতি ও হিতৈষণার একই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ইঁহাদের মতে, মানুষের প্রতি আমরা যে স্নেহ ও দয়াদির ভাব অন্তরে অনুভব করি, সেই সকল ভাবের মধ্যেই মঙ্গলের নিদর্শন ও আদর্শ অবস্থিত। মানুষ কোন বিশেষ প্রকার কাজ করিলে, তাহার শুভ কামনা করিতে,—তাহাকে সুখী করিতে স্বভাবতই আমাদের প্রবৃত্তি হয়; তাহার সেই কাজকে তখনই আমরা ভাল বলিতে পারি। ঐ প্রকারের কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া, যখন আমাদের ঐরূপ মনের ভাব স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন আমরা ঐ ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া বিচার করি। কাহারও কাজ দেখিয়া যখন অন্য প্রকার প্রবৃত্তি, অন্য প্রকার মনোভাব আমাদের মনে উত্তেজিত হয়, তখন আমরা তাহাকে অসৎ কিংবা অসাধু বলিয়া মনে করি।

কাহারও কাহারও মতে, স্বভাবতই যে কাজ আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে, সেই কাজই ভাল। যখন দেখি, দেশের জন্য কোন ব্যক্তি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, তখন সেই বীরত্ব, আমাদের মনেও কিয়ৎপরিমাণে বীরত্বের উদ্রেক করে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি-মূলক কোন কাজ,—নিতান্ত স্বার্থের সংস্রব না থাকিলে—আমাদের অন্তরে এরূপ সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে না। অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব লোকেরও অন্তরে ভালর প্রতি অনুরাগ ও মন্দের প্রতি বিরাগ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে।

এই সকল বিভিন্ন নীতিবাদকে, একটি নীতিবাদে পরিণত করা যাইতে পারে;—ইহাকে বলে ভাবের নীতিবাদ।

এই নীতিবাদের সহিত অহং-নিষ্ঠ নীতিবাদের যে প্রভেদ আছে তাহা সহজেই দেখাইতে পারা যায়। অহংনিষ্ঠা আপনাকে ভাল বাসা বই আর কিছুই নহে।

কিসে আপনার সুখ হয়, আপনার ভাল হয়, অহংপরতা শুধু তাহারই অন্বেষণ করে।

হিতৈষণা যেমন স্বার্থের বিরোধী এমন আর কিছুই নহে। এস্থলে স্বার্থের জন্য আমরা অন্যের শুভ ইচ্ছা করি না; শুধু তাহা নহে—আমরা অন্যের জন্য আপনাকে বিপন্ন করি; যে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, সেই সাধু ব্যক্তির জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিতেও উদ্যত হই। এই আত্মবিসর্জ্জনে যদি কিছু সুখ অনুভূত হয়, তবে সে সুখ ঐ ভাবটিরই ইচ্ছা-নিরপেক্ষ আনুসঙ্গিক ব্যাপার,—উহা তাহার লক্ষ্য নহে।

সে সুখ আমরা বিনা-চেষ্টায় ও বিনা অন্বেষণেই প্রাপ্ত হই। এ সুখের আস্বাদনে আমাদের অধিকার আছে, কেননা স্বয়ং প্রকৃতিদেবী হিতৈষণার সহিত ঐ সুখকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

হিতৈষণার ন্যায় সহানুভূতিরও অন্যের সহিত যোগ। উহাতে অহংএর কোন সংস্রব নাই। আমাদের অন্তঃকরণ এমন ভাবে গঠিত যে আমরা এক জন শত্রুর দুঃখেও দুঃখ অনুভব করিতে পারি। কোন ব্যক্তি একটা মহৎ কাজ করিলে, তাহা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ হইলেও সেই কাজের প্রতি এবং সেই কার্য্যকারী ব্যক্তির প্রতি আমাদের কতকটা সহানুভূতি হইয়া থাকে।

অন্যের দুঃখে আমাদের যে সহানুভূতি হয় সে দুঃখ আমাদেরও কখন না কখন ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কা হইতেই সহানুভূতির উৎপত্তি—কেহ কেহ সহানুভূতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময়, যে দুঃখের জন্য আমরা সহানুভূতি করি, সে দুঃখ আমাদিগের হইতে এতদূরে অবস্থিত এবং সে দুঃখ আমাদের উপর পতিত হইবার সম্ভাবনা এত কম যে, তাহা হইতে আমাদের ভয়ের উদ্রেক হওয়া নিতান্তই অসঙ্গত। এ কথা সত্য, দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কারণ, যে দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই, তাহা আমরা অনুভব করিব কি করিয়া? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সহানুভূতির মুখ্য নিয়ম নহে। উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে আমাদের নিজের দুঃখ স্মরণ করিয়া কিংবা নিজ দুঃখের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া তবে আমরা অন্যের দুঃখে সহানুভূতি করি।

কোন প্রকার স্বার্থের ভাব দিয়া সহানুভূতির ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথমত, বিরাগের ন্যায়, সহানুভূতিও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। তাহার পর, একথাও কেহ মনে করিতে পারে না, কোন ব্যক্তির হিতৈষণা আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা তাহার দুঃখে সহানুভূতি করি। কারণ, অনেকসময়েই, যাহাদের জন্য আমরা সহানুভূতি করি, তাহারা আমাদের সহানুভূতি জানিতেও পারে না। যাহাদিগকে আমরা কখন দেখি নাই, যাহাদিগকে দেখিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই, যাহারা জীবিত নাই—এইরূপ লোকের জন্য যখন আমরা সহানুভূতি করি, তখন কি তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা কোন উপকার প্রত্যাশা করি?

অহংপরতা সকলপ্রকার সুখকেই প্রশ্রয় দেয়; কোন সুখকেই বহিষ্কৃত করে না; তবে কিনা, এমন কতকগুলি ভাবের সুখ আছে যাহা ইতর সুখ অপেক্ষা অধিক-স্থায়ী, ও ততটা মিশ্র বা অবিশুদ্ধ নহে, এবং যাহাকে মার্জ্জিত আত্মানুরাগ সেবনীয় বলিয়া মনে করে। ভাবের নীতিবাদ যদি শুধু হীন সুখের জন্যই ভাবের পক্ষপাতী হয়

তবে অহংনিষ্ঠ মূলক নীতিবাদের সহিত ভাবের নীতিবাদের কোন পার্থক্য থাকে না—ভাবের নীতিবাদের মধ্যে কোন প্রকার নিঃস্বার্থভাব থাকে না। তাহা হইলে "আমিই" আমাদের সকল কার্য্যের কেন্দ্র ও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে! কিন্তু আসলে তাহা নহে। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য কোন কাজ করিলে যে সুখ অনুভূত হয়, ঠিক সেই আত্মবিস্মৃতিটুকুতেই সেই সুখের যাহা কিছু মনোহারিত্ব। প্রকৃতি-দেবী সহানুভূতি ও হিতৈষণার সহিত যদি কোন প্রকৃত সুখ সংযোজিত করিয়া থাকেন, তবে সে এইজন্য যে ঐ দুই বৃত্তির বিশুদ্ধতা ও নিঃস্বার্থপরতা যাহাতে সংরক্ষিত হয়—উহাদের আসল ভাবটি যাহাতে অবিকৃত থাকে। তোমার সহানুভূতি ও হিতৈষণার পুরস্কার স্বরূপ কোন সুখের প্রত্যাশা না করিয়া, শুধু সেই সহানুভূতি ও দয়ার পাত্রের কথাই তোমার ভাবা উচিত। নচেৎ, সেই সুখের মূলোচ্ছেদ হইবে,—যে সুখের অন্বেষণ করিতেছ সেই সুখই অন্তর্হিত হইবে। যে সুখ নিঃস্বার্থভাবের সহিত চিরসংযুক্ত—স্বার্থপরতা, যে-কোন আকারেই আসুক না, সে সুখকে কখনই ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না।

অহংনিষ্ঠ নীতিবাদ কিংবা অহমিকার নীতিবাদটা নিতান্তই অলীক—উহা একটা মিথ্যা কথা। উহা নীতির অনুমোদিত পবিত্র নামগুলি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নীতি-কেই অপসারিত করিয়াছে; বিশ্বমানবের ভাষা প্রয়োগ করিয়া বিশ্বমানবকে প্রতারিত করিয়াছে; এই ধার-করা ভাষার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, সমগ্র মানবজাতির যাহা রত্নভাণ্ডার—সেইসব স্বাভাবিক সংস্কার ও স্বাভাবিক ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে স্বকীয় মত প্রচার করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, ভাব স্বয়ং মঙ্গল না হইলেও উহা মঙ্গলের বিশ্বস্ত সহচর ও নিতান্ত আবশ্যক সহকারী। উহা মঙ্গলের বিদ্যমানতার নিদর্শন এবং উহারদ্বারা সহজেই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, মিথ্যা তর্ক ও জল্পনা হইতে মনকে কোন-এক প্রকারে রক্ষা করে। অতএব মনোমধ্যে কতকগুলি মহৎভাব উত্তেজিত ও সংরক্ষিত করা মনের পক্ষে যেরূপ স্বাস্থ্যকর এমন আর কিছুই নহে; এইসকল মহৎভাব, ব্যক্তিগত স্বার্থের দাসত্ব হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত করে। সাধু ব্যক্তিগণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে, তাঁহাদের মত কাজ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে। আমাদের অন্তরে হিতৈষণা ও সহানুভূতির সাধনা করিলে, বদান্যতা ও প্রেমের উৎস আপনা হইতেই শতধারে উৎসারিত হয় এবং উদারতা ও আত্মোৎসর্গের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

তাই, ভাবের নীতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। ইহা প্রকৃত নীতি; কেবল, ইহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে, উহার এমন একটি মূলতত্ত্ব চাই, যাহা উহার প্রামাণিকতা স্থাপন করিতে পারে।

ভাল কাজ করিলে, অন্তরে একটা সন্তোষ অনুভব করা যায়, এবং মন্দ কাজ করিলে অনুতাপ উপস্থিত হয়। ভাল মন্দ আমরা যে কাজ করি, এই দুইটি ভাব তাহাদের গুণ নহে; কারণ, ঐ দুইটি ভাব, কাজ করিবার পরে অনুভূত হয়। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া না বুঝিলে কি আমরা অন্তরে সন্তোষ অনুভব করিতে পারি? সেইরূপ, মন্দ কাজ করিয়াছি বলিয়া না বুঝিলে কি আমাদের অনুতাপ হয়?—কখনই নহে। কোন কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে আমা-

দের মনের মধ্যে একটা বিচার-ক্রিয়াও হইয়া থাকে; এই বিচার ক্রিয়ার পরে আমাদের হৃদয়ের কাজ আরম্ভ হয়। উত্তর-বর্ত্তী হৃদয়ের ভাবটি গোড়ার বিচার ক্রিয়া নহে; মঙ্গলের ধারণা হৃদয়-ভাবের উপর স্থাপিত নহে—পরন্তু হৃদয়ের ভাব হইতে মঙ্গল অনুমিত হইয়া থাকে। যাহা মঙ্গলের জ্ঞান ভিন্ন হইতে পারে না, তাহা মঙ্গল ভাব হইতে উৎপন্ন—এইরূপ বলিলে 'চক্র-ন্যায়ের' ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

কোন কাজ ভাল বলিয়াই কি আমরা সেই কাজের সহিত সহানুভূতি করি না? কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি ন্যায়-বুদ্ধির অনুগত বলিয়াই কি আমরা সেই প্রবৃত্তির অনু-মোদন করি না? তাছাড়া, সহানুভূতি যদি মঙ্গলের প্রকৃত মানদণ্ড হয়, তবে যাহা কিছুর জন্য আমরা সহানুভূতি করি তা-হাই কি ভাল নহে? কিন্তু শুধু নৈতিক বিষয়েরই সহিত আমাদের সহানুভূতির সম্বন্ধ নহে। আমরা এরূপ দুঃখ ও এরূপ আনন্দের সহিতও সহানুভূতি করি, যাহার সহিত ধর্ম্ম অধর্ম্মের কোন যোগ নাই। এমন কি, আমরা শারীরিক দুঃখ যন্ত্রণারও সহিত সহানুভূতি করি। নৈতিক সহানুভূতি, সাধারণ সহানুভূতিরই একটা বিশেষ অবস্থা। কোন্ সহানুভূতি নৈতিক তাহা জ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের সহিত সহানুভূতির মিল হয় না। কখন কখন যে সকল ভাবকে আমরা ভাল বলি না তাহাদিগের সহিতও আমরা সহানুভূতি করি।

হিতৈষণা সকল সময়ে, একমাত্র মঙ্গল-ভাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। তাছাড়া, যখন কোন সাধুব্যক্তির প্রতি আমরা এই বৃত্তির প্রয়োগ করি, তখনও তাহা বিচারবুদ্ধির অপেক্ষা করে এইরূপ বুঝায়; কারণ, কোন ব্যক্তি সাধু কি না, তাহা বিচার-বুদ্ধির দ্বারাইআমরা নির্দ্ধারিত করি। কোন কার্য্যকারী ব্যক্তির শুভ কামনা করি বলিয়াই যে তাহার সেই কাজকেও আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি—এরূপ নহে; পরন্তু সেই কাজটা ভাল বলিয়াই সেই কাজের কর্ত্তাকে আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। আর এক কথা। হিতৈষণার মধ্যে একটা অভিনব বিচার-ক্রিয়া আছে, যাহা সহানুভূতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বিচার ক্রিয়াটা এইরূপ;—ভাল কাজের কর্ত্তা সুখী হইবার যোগ্য; এবং মন্দ কাজের কর্ত্তা সেই কাজের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কষ্ট ভোগ করিবে—ইহাই সমু-চিত। এই জন্যই আমরা শুভকারীর সুখ কামনা করি এবং অশুভকারীর সং-শোধন কল্পে দণ্ডভোগ প্রার্থনীয় মনে করি। হিতৈষণা এই বিচারক্রিয়ারই একটা শাব্দিক রূপ মাত্র।

অতএব, এই সকল ভাবস্ফূর্ত্তির গো-ড়ায় একটা বিচার ক্রিয়া হইয়া থাকে এইরূপ বুঝায়। এই বিষয়ে চক্র-ন্যায়ের ভ্রম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই ভাবগুলি নৈতিক লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি, ঐ ভাবগুলিই আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধীয় ধারণা; কিন্তু আসলে আমা-দের মঙ্গলের ধারণা হইতেই ভাবগুলি ঐ সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ

বৈদিক ধর্ম্ম।

(জি-দে লাফোঁর ফরাসী হইতে)

বৈদিক যুগ—দিগ্বিজয়ের যুগ; এই যুগে, আর্য্যেরা সিন্ধুনদের প্রদেশে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত যাত্রা করে।

আর্য্য বংশের প্রথম দলেরা, স্বকীয় জন্মভূমি বাক্‌ত্রিয়ানা (বাহ্লিক) ছাড়িয়া, সিন্ধুনদ পার হইয়া, যখন এই বিশাল ভারত-প্রায়দ্বীপ জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা এই দেশের ভূম্যধিকারী অধিবাসীদিগের সংস্রবে আইসে। এই আদিম অধিবাসীদিগের নাম দস্যু। ঋগ্বেদের মন্ত্রে, এই দস্যুগণ,—বৃষ-মুখ, নাসিকাহীন, হ্রস্ববাহু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আর্য্যেরা উহাদিগকে ক্রব্যাদ নামে অভিহিত করিত; ক্রব্যাদের অর্থ—মাংসভোজী রাক্ষস। আর্য্যেরা মাংস স্পর্শ করিত না। এই সকল বর্ব্বরেরা কোন দেবতা মানিত না, তাহাদের কোন ধর্ম্ম ছিল না। বেদে উহাদের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে পীতজাতির সহিত অনেকটা মিল হয়। এই অনুমানের ভিত্তি—উহাদের দৈহিক প্রকৃতি। দস্যুদের রং ছিল কালো; উহাদের চর্ম্ম রোমশ ছিল না—যাহা আর্য্যদের একটা বিশেষ লক্ষণ; উহাদের নাক ছিল চ্যাপ্টা।

বেদে দেখা যায়,—দস্যুদের মধ্যে কতকটা ভৌতিক সভ্যতাও বিদ্যমান ছিল। প্রথম প্রথম আর্য্যেরা, যাহাদেরই সংস্রবে আসিত, তাহাদের সকলকেই নির্ব্বিশেষে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিত। পরে তাহারা জানিতে পারিল যে, দুই প্রকার দস্যু আছে; এক—পার্ব্বত্য দস্যু, আর এক মধ্য-দেশের দস্যু; প্রথমোক্ত দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ, ও দ্বিতীয়োক্ত দস্যুরা পীতবর্ণ।

"দস্যুগণ কৃষ্ণবর্ণ, বন্য, ভীষণ হিংস্র, পর্ব্বতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করে, মানুষ অপেক্ষা বানরেরই সহিত উহাদের বেশী সাদৃশ্য, উহাঁরা সমস্ত দাক্ষিণাত্যে পরিব্যাপ্ত—বিন্ধ্যাচলে উহারা 'পিল পিল্' করিতেছে বলিলেও হয়।"—Marians Fontane তাঁহার "বৈদিক ভারত" গ্রন্থে উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

Burnouf তাঁহার প্রখ্যাত বেদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলেন:—"আর্য্য শব্দ, চিরকালই ভারতবর্ষে, "শ্রেষ্ঠ" —এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জর্ম্মান শব্দ Ehre, যাহা পুরাতন জর্ম্মান ভাষায় Ere—এইরূপ লিখিত হইত, উহা বোধ হয় এই আর্য্য শব্দেরই রূপান্তর। আদিম জর্ম্মান শব্দ Ermann—জর্ম্মান বীরের নাম—যাহাকে রূপান্তর করিয়া রোমকেরা Arminius বলিত, তাহাও বোধ হয় আর্য্য শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। পাশ্চাত্য এসিয়ায় যে সকল শ্বেতবর্ণের লোক সেমিটিক্ নহে, তাহাদেরই জাতিবাচক সাধারণ নাম—আর্য্য।

যে জাতি, সগর্ব্বে আপনাদিগকে "আর্য্য" বলিত, "বিশুদ্ধ" বলিত, "আলোকের শুভ্রবর্ণ দুহিতার" বংশধর বলিত, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ দৈহিক লক্ষণ ছিল:—তাহাদের ফর্সা রং, তাহাদের কেশ ও শ্মশ্রু সূক্ষ্ম, তাহাদের গাত্র কোমল রোমে আচ্ছন্ন, তাহাদের নাসিকা সরল (সুশিপ্র), তাহাদের দেহযষ্টি পাতলা। পামিরের উচ্চ ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের সম্বলের মধ্যে ছিল কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ সাংকেতিক সামগ্রী। এই স্বল্প পুঁজি লইয়াই তাহারা চতুর্দ্দিকে সভ্যতা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেরূপ উন্নত সভ্যতা আর কোন জাতি কর্ত্তৃক কোনও কালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে,—ভারতবর্ষে, এই আর্য্যেরাই ব্রাহ্মণিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। উহাদের বিপুল দার্শনিক ও সাহিত্যিক কীর্ত্তি; এই দর্শন ও সাহিত্যের সৃষ্টি গ্রীশ ছাড়া আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্ব্বাঞ্চলে, ইরানী আর্য্যেরাই পারস্য-রাজ্যের সংস্থাপক। দক্ষিণে, গ্রীশ ও ইটালী দেশের আদিম আর্য্যেরা (Pelasges) গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করে; এবং আর্য্যদের শেষ শাখাগুলি, উত্তরে গিয়া—পাশ্চাত্যখণ্ডে গিয়া—সপ্তসিন্ধুর আর্য্যদের প্রায় দুই তিন সহস্র কিংবা ততোধিক বৎসর পরে, আবার আপনাদের মধ্যে একটা নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

অতএব সপ্তসিন্ধুর দেশেই, আমাদের আর্য্যশাখায় প্রবর্ত্তিত সভ্যতা সর্ব্বপ্রথমে বিকশিত হইয়া উঠে; যে মহতী কীর্ত্তির উপর এই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তাহা—বেদ। এই বেদ—বৈদিক ভাষায় লিখিত ধর্ম্মস্তোত্র সমূহের সংগ্রহ মাত্র।

ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য; আর তিনটি উহা হইতেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমাদের আর্য্যশাখার উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কীর্ত্তি। বুর্নুফ্ (Burnouf) অনুমান করেন, ন্যূনকল্পে খৃষ্টাব্দের ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হয়, কিন্তু কিংবদন্তী উহাকে আরও পুরাতন বলিয়া প্রতিপন্ন করে।

সম্ভবত এই বেদগ্রন্থ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সংকলিত হয়, তাই দ্বৈপায়নের নাম ব্যাস অর্থাৎ সংগ্রহকর্ত্তা।

কোলব্রুক্ বৈদিক জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—"যৎকালে বেদ-ব্যবহৃত পঞ্জিকার নিয়ম সকল স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তখন প্রথম-অয়নান্ত, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আরম্ভভাগে ও দ্বিতীয়-অয়নান্ত অশ্লেষা নক্ষত্রের আরম্ভভাগে অবস্থিত ছিল এইরূপ গণনা করা হয়; অতএব খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে দিগ্‌বিভাগের এইরূপ অবস্থান ছিল।

ইতঃপূর্ব্বে বেদের একটা বচন হইতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে, মাস-পর্য্যায়ের সহিত ঋতুপর্য্যায়ের সম্পূর্ণ মিল আছে এবং জ্যোতিষ হইতে উদ্ধৃত একটা বচন হইতেও দেখা যায়, দিগ্-বিভাগের সহিতও উহার মিল আছে।" সাহিত্যিক দৃষ্টিতে দেখিলে,—ঋগ্বেদের কবিতাগুলি, বাহ্য প্রকৃতি কিংবা আর্য্যদিগের দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত। কিন্তু ঐ সকল বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে, বাস্তব বিষয়ের পাশা-পাশি, যেন একটা রূপক-কল্পনার জগৎ অধিষ্ঠিত। মন্ত্রগুলি যেখানে গীত হইত সেই সকল স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা, নৈসর্গিক ঘটনা, শত্রু-লোকের মধ্য-দিয়া আর্য্যদের যাত্রা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ও গোর দিবার কথা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি—এই সমস্ত বিষয় ঋগ্বেদের মধ্যে আছে। ঋগ্বেদ হইতে আমরা আরও জানিতে পাই,—আর্য্যেরা তখন পিতৃশাসনতন্ত্রের নিয়মানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত,—তাহারা পৃথক্ ভাবে এক একটা পরিবারের মধ্যে বাস করিত; তাহারা কোন নগর নির্ম্মাণ করিত না; যখন বিপদ-আপদ উপস্থিত হইত তখন তাহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। পিতাই তাহাদের গৃহ-কর্ত্তা, ও মাতাই তাহাদের গৃহ-কর্ত্রী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল না বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে একটা গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাব ছিল। বর্ণভেদ প্রথা আদৌ ছিল না! পুরোহিত-সম্প্রদায় মোটেই ছিল না; তখন পুরোহিতের আধিপত্য ও পিতার প্রভুত্ব একত্র মিশ্রিত ছিল, পিতাই নিজসন্তানের উপদেষ্টা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

তখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও খুব সাদাসিধা ছিল: কোন দেবালয় ছিল না, কোন অনাবৃত স্থানে, শুধু এক-একটা ঘাসের চাপড়ায় যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হইত, দুই কাষ্ঠ খণ্ডের সংঘর্ষণে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করা হইত, উহাতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইত; পুরোহিত দেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্যস্বরূপ মোদক-আদি মিষ্টান্ন ও সোমলতা অর্পণ করিত এবং পুরোহিতের সহকারীরা বেদমন্ত্র গান করিত। এই সাদাসিধা অনুষ্ঠান, দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া হইত: উষাকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সূর্য্যাস্তকালে। অনেক দিন পর্য্যন্ত, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্রের মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মমত ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই; তাঁহারা বলিতেন,—প্রাকৃতিক শক্তিদিগকে আহ্বান করাই ঐ সকল মন্ত্রের একমাত্র কাজ; এক কথায়, উহা বহুদেব-বাদাত্মক ধর্ম্ম; বৈদিক ধর্ম্মের আদি-যুগে, খুব সম্ভব, আর্য্যেরা বহুদেববাদী ছিল; যাই হোক্, বহুদেব বাদ ও মহাভূতের উপাসনা—এই দুয়ের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আছে। Burnouf বলেন:—"মনে হয়, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল তাঁহাদের যে সকল প্রার্থনা মন্ত্রাকারে হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, উহা যে শুধু পরিবর্ত্তনশীল বায়ু ও বৃষ্টির উপর প্রভাব প্রকটিত করে তাহা নহে, পরন্তু উহা অধিকতর সুব্যবস্থিত ও অধিকতর স্থায়ী প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহেরও অনুষঙ্গী ও সেই সকল ব্যাপারকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।"

বামদেবের রচিত মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই:—"কর্ম্মকার যেমন লৌহকে গড়িয়া তোলে, সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবতাদের গড়িয়া তুলিয়াছেন।" অতএব বৈদিক মন্ত্রকারেরা স্পষ্টই বলিতেছেন যে তাঁহারা নিজেই দেবতাদের স্রষ্টা, সুতরাং মন্ত্র ব্যতীত দেবতাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে, তাঁহারা দেবতাদিগকে বিশ্বাস করেন না। অতএব, বহুদেব-বাদের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য; এবং শব্দবাদ কিংবা বাণীবাদ (Logos) হইতে ইহার এক-পাদ মাত্র ব্যবধান।

কিন্তু 'অসুর'-বাদ সম্বন্ধেই অর্থাৎ প্রাণের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেই বৈদিক ধর্ম্ম, কূট দার্শনিকতার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত 'অসু'-শব্দের অর্থ প্রাণ এবং র'-অক্ষর যোগে "প্রাণের উৎপাদক" এইরূপ বুঝায়—ইহাই অসুর-শব্দের মূল-অর্থ। আর্য্যেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি। তাঁহারা বলিতেন, প্রাণই প্রাণকে পোষণ করে। প্রাণীরা অন্য প্রাণীকে আত্মসাৎ করে; সেই সব প্রাণী আবার, বৃক্ষ লতাদি খাইয়া জীবনধারণ করে; বৃক্ষ লতারা আবার উদ্ভিজ্জ ও জীবশরীরের পরিত্যক্ত অংশের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাকেই বলে "চক্র,"—অর্থাৎ প্রাণের চক্রগতি। প্রকৃতি-রাজ্যে, প্রাণ ও গতিশক্তি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ফলত, যাহার গতি-নাশ হয়—তাহারই প্রাণনাশ হইয়া থাকে। যুক্তির সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই, আর্য্যেরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, অসুরেরা গতিমান্, তাহাদের শরীর দীপ্তিমান্—সুতরাং তাহারা সর্ব্বব্যাপী ও অমর।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই মতবাদটি, বহুদেববাদাত্মক; কিন্তু আর্য্যগণের যে স্বাভাবিক প্রবণতা পরম-মূলতত্ত্বরূপ দার্শনিক একতার দিকে,—সেই প্রবণতাই উহাদিগকে একেশ্বরবাদে শীঘ্র উপনীত করিল। অগ্নিদেবের ধারণা হইতেই উহারা একেশ্বরবাদে আসিয়া পৌঁছিল। —"সমস্ত জগতের সত্তা তোমা হইতেই; কি হোম পাত্রে, কি মানব-হৃদয়ে, কি জলে, কি অগ্নি-

কুঞ্জে, সমস্ত প্রাণের মধ্যে তোমার মহিমার মধুর লহরী প্রবাহিত হইতেছে।" —এইরূপ বামদেব বলিয়াছেন। অতএব অমূর্ত্তভাবাপন্ন (idealised) অগ্নিই এই বহুদেববাদের পত্তনভূমি। ভরদ্বাজের বেদমন্ত্র শ্রবণ কর: "সমস্ত জীবের মধ্যেই তাঁহার কর্তৃ-শক্তি বিদ্যমান; সমস্ত দেবতারা মিলিয়া এই শক্তিমান পুরুষকে বেষ্টন করিয়া আছেন। যখন ভাবি, এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার অন্তরে রহিয়াছেন, তখন আমার কর্ণ ব্যথিত হয়, আমার চক্ষু কাঁপিতে থাকে, আমার মন সন্দেহে বিক্ষিপ্ত হয়। আমি কি বলিব? আমি কি চিন্তা করিব?" তবেই দেখ, ভৌতিক অগ্নি অমূর্ত্তভাবাপন্ন হইয়া, তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ধারণার খুবই কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে এই অগ্নির আর বিশেষ অস্তিত্ব রহিল না; পুংলিঙ্গ-বাচক পরম পুরুষ ব্রহ্মা ইহাকে অধিকার করিলেন।

দীর্ঘতম ঋষির মহামন্ত্রটি ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে: "যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নি শরীর বিধান করিতেছেন—ইহা কি জন্মকালে কেহ দেখিয়াছে? পৃথিবীর মন, রক্ত, আত্মা কোথায় ছিল? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই ঋষির কাছে কে আসিয়াছিল? আমি দুর্ব্বল ও অজ্ঞ—আমি এই সকল রহস্য উদ্‌ভেদ করিতে চাহিতেছি · আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর আরম্ভ কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ফলবান অশ্বের মূলবীজটি কি? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বাক্যের আদিম আশ্রয় কে? এই পবিত্র বেদীটিই পৃথিবীর আরম্ভ এবং এই যজ্ঞ হোমই জগতের কেন্দ্র। এই সোমই ফলপ্রসূ অশ্বের বীজ। এই পুরোহিতই বাক্যের আদিম আশ্রয়। আমি জানি না, কাহার সহিত এই জগতের সাদৃশ্য আছে। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, এবং আমি চিন্তাশৃঙ্খলে জড়াইয়া পড়িয়াছি···মৃত্যুর মধ্যেই অমৃত অবস্থিত; এই দুই নিত্য বস্তু সর্ব্বত্রই গমনাগমন করে; কেবল লোকে একটি না জানিয়া অন্যটিকে জানে··· যে ব্যক্তি পরমপুরুষকে জানে না, সে এ মন্ত্রের কিছুই বুঝিতে পারিবে না; যে তাঁহাকে জানে, সে মৃত্যু ও অমৃতের সম্মিলনও অবগত আছে"···"যে দেবতা সমস্ত আকাশে পরিভ্রমন করেন, লোকে তাঁহাকে মিত্র বলে, বরুণ বলে, অগ্নি বলে; সদ্‌বিপ্রেরা এই অদ্বিতীয় পুরুষকে,—অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্—এইরূপ বহুনামে ব্যক্ত করেন।"

অবশেষে প্রজাপতি জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন: তখন কিছুই ছিল না, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। ভূও ছিল না, ভুবও ছিল না। এই আচ্ছাদনটি কোথায় ছিল?—কোন্ জলগর্ভের মধ্যে নিহিত ছিল? এই আকাশের গভীরতম প্রদেশ-সকল কোথায় ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিবা ও রাত্রির সূচনা করে এমন কিছুই ছিল না। একমাত্র তিনিই আপনার মধ্যে লীন থাকিয়া, বায়ুহীন নিঃশ্বাস নিঃশ্বসিত করিতেছিলেন। তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন। সেই আদিকালে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল; জলের কোন বেগ ছিল না; সমস্তই একাকার ছিল। এই বিশৃঙ্খল একাকারের মধ্যে পরমপুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাঁহার করুণাতেই এই মহাবিশ্বের জন্ম হইল। আদিতে তাঁহার প্রেম আপনার মধ্যেই ছিল, পরে তাঁহার জ্ঞান হইতেই আদি-বীজ ছুটিয়া বাহির হইল। ঋষিরা তপস্যার বলে সৎ-এর সহিত অসৎ-এর যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন—এ সকল বিষয়ের জ্ঞাতাই বা কে? বক্তাই বা কে? এই সকল সত্তা কোথা হইতে আসিল? এই উৎপত্তি-ব্যাপারটা কি? দেবতারাও তাঁহা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সত্তা কিরূপে হইল? যিনি এই জগতের আদি-স্রষ্টা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন ইহা আর কে করিতে পারে? দ্যুলোক হইতে যাঁহার চক্ষু জগতের উপর নিপতিত রহিয়াছে তিনিই ইহা জানেন। তিনি ব্যতীত এ বিজ্ঞান আর কাহার হইতে পারে?"

একজন ঋষি, আর এক মন্ত্রে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছেন দেখিতে পাই:

"যিনি আত্মদা, বলদা, যাঁহার শাসনে বিশ্বসংসার চলিতেছে, দেবতারা যাঁহার শাসন অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন, যাঁহার ছায়া অমৃত, যাঁহার ছায়া মৃত্যু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? এই হিমবন্ত পর্ব্বত সকল যাঁহার মহিমা, সকল নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহিমা, এই দিক্ সকল যাঁহার বাহু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেতার অর্চ্চনা করি? যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক প্রদীপ্ত, পৃথিবী সুদৃঢ়, যাঁহার দ্বারা স্বর্গলোক, যাঁহার দ্বারা সুরলোক প্রতিষ্ঠিত, যিনি অন্তরীক্ষে মেঘের নির্ম্মাতা, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? যাঁহার পালনীশক্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীপ্যমান এই দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহাকে দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে, যাঁহাতে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, তিনি আমাদিগকে বিনাশ না করুন। যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দদায়িনী বৃহৎ জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি?"

পরব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াই বৈদিক যুগের শেষ হইল; তাহার পরেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আরম্ভ। বেদের ভাষ্য যে উপনিষদ্—সেই সকল উপনিষদে পরব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

আমি কেবল উপনিষদ্ হইতে—যজুর্ব্বেদের উপনিষদ্ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিব; "এই জগৎ এবং এই জগতে যাহা কিছু অবস্থিতি করিতেছে, সমস্তই বিধাতা-পুরুষের শক্তি দ্বারা পূর্ণ; অতএব, পার্থিব বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে অর্চ্চনা কর।·· মানুষ স্বকায় কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে; হে মনুষ্য! এই সকল কর্ম্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা কলুষিত না হয়। যাহারা পার্থিব সুখে আসক্ত হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহারা অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্যলোকে গমন করে। এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ চলেন না, অথচ তিনি মন হইতে বেগবান, তাঁহাকে দেবতারাও

ধরিতে পারে না। তিনি বাহ্যইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তিনি অন্তরিন্দ্রিয়দিগকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করেন। তিনি সমস্ত আকাশে অচলভাবে অবস্থিত হইয়া এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন! তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে! যিনি পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। বিশ্বাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত সর্ব্বজীব অবস্থিত—ইহা যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার অবিদিত কি আছে? তিনি সর্ব্বগত, শুভ্র নির্ম্মল, আকার শিরা ও ব্রণহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি কবি, তিনি মনীষী, তিনি পরিভূ, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথাযথ অর্থসকল বিধান করেন। যাহারা অবিদ্যাকে অর্চনা করে তাহারা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে গমন করে, এবং যাহারা বিদ্যালাভ করিয়াছে তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। ঋষিরা বলেন, বিজ্ঞানের ফল একরূপ, অজ্ঞানের ফল অন্যরূপ; এই উপদেশ আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋষিদের হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা একসঙ্গে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা প্রথমে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন,তাহার পর বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করেন। যাহারা সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে, যাহারা নশ্বর সৃষ্ট পদার্থে আসক্ত হয় তাহারা গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। ঋষিরা বলিয়াছেন, নশ্বর পদার্থের ফল একরূপ, অবিনশ্বর পদার্থের ফল অন্যরূপ। পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋষিদিগের নিকট হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি নশ্বর পদার্থ ও লয়তত্ত্ব—এই উভয় জিনিষ একসঙ্গে শিক্ষা করেন, তিনি প্রলয়ের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পরে অকৃত পদার্থের দ্বারা অমৃত লাভ করেন। গৌরবান্বিত হিরন্ময় অবগুণ্ঠনে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। জগৎ-পোষণ হে সূর্য্য! আমার সমক্ষে সত্যকে প্রকাশ কর—যাহাতে আমি তোমার চিরভক্ত হইতে পারি,—ন্যায়ের সূর্য্য ও সত্যের সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারি। হে লোক-পোষণ সূর্য্য! হে নিঃসঙ্গ তাপস! পরম প্রভু পরম নিয়ন্তা! প্রজাপতির পুত্র! তোমার দীপ্ত কিরণ বিকীর্ণ কর; তোমার প্রখর তেজ সংহরণ কর, যাহাতে আমি তোমার মোহন রূপ ধ্যান করিতে পারি, তোমার মধ্যে যে দিব্য পুরুষ বিচরণ করেন, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতে পারি! আমার প্রাণবায়ু যেন আকাশের বিশ্বাত্মা ও ভূতাত্মার মধ্যে বিলীন হয়! আমার এই ভৌতিক ও নশ্বর দেহ যেন ভস্মে পরিণত হয়! হে দেব! আমার প্রদত্ত হবি তুমি স্মরণ করিও, আমার যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিও। হে অগ্নি! সরল পথ দিয়া, আমাদের সমস্ত পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গন্তব্য স্থানে আমাদিগকে উপনীত কর। হে দেব! তুমি আমাদের সমস্ত কর্ম্মই অবগত আছ, আমাদের পাপ সকল অপনীত কর। আমরা তোমাকে প্রণিপাত করি।”

বৈদিক ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে উত্তীর্ণ হইবার পথে এই মহান উপনিষদই সন্ধিস্থান। এই উপনিষদই বৈদিক মত ও বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার, এবং এই উপনিষদের মধ্যেই সেই সকল মতবাদের বীজ নিহিত ছিল যাহা পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট দর্শনশাস্ত্রের উদ্যমে বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে।

বেদ যে ব্রাহ্মণ্য ভারতের চক্ষে এত পবিত্র; তাহার কারণ, বেদই সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের, দার্শনিকতত্ত্বের, সামাজিক ও রাষ্ট্রিকতত্ত্বের সূত্রস্থান; বেদ আসলে বিশুদ্ধ আর্য্য জাতির নিজস্বসামগ্রী, উহার মধ্যে কোন বিদেশী ‘ভেজাল’ প্রবেশ করে নাই, অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক হইয়া, সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে যে আর্য্যজাতি আবদ্ধ ছিল, বেদ তাহাদেরই জ্ঞানোন্নতির ফল; একমাত্র নিজ সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যজাতি কিরূপে জ্ঞানসভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছিল—বেদ তাহারই নিদর্শন। অতএব, আর্য্যধর্ম্ম-সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সব ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, যে সব সাঙ্কেতিক সামগ্রী আছে, যে সব মতবাদ আছে—সে সমস্তের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, বেদের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই, আর্য্যবংশীয় পুরাণাদির ভিতরকার ভাব অনেকটা বুঝা যায়—তাহাদের মূল মর্ম্ম অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এবং একমাত্র বেদই,—গ্রীক্, ল্যাটিন, শ্ল্যাভ, জর্ম্মন ও সেল্টজাতির পুরাণাদির প্রকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

এখন দেখা যাক,ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিরূপে বেদ হইতে জন্মগ্রহণ করিল। দেশজয় করিতে করিতে,আর্য্যেরা যে পরিমাণে অগ্রসর হইতে লাগিল, বিজিত দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল, এবং সেই সব স্থানে স্থায়ী ভাবে বসতি করিতে লাগিল,—সেই পরিমাণে তাহাদের জীবন নির্ব্বাহের প্রণালীও একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

প্রথমে তাহারা এক এক পরিবার পৃথকভাবে বাস করিত, তাহার পর তাহাদের এক একটা মণ্ডলী হইল। প্রথমে পরিবারের অন্তর্গত পিতাই পুরোহিত ছিলেন, তিনিই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পৌরোহিত্য কাজ নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্য, কতকগুলি বিশেষ পরিবারের হস্তে গিয়া পড়িল।

ফলতঃ, বৈদিকযুগের আরম্ভকালে, যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য একজন পুরোহিত আবশ্যক হইত, পরে তাহার জন্য সাত জন পুরোহিতের আবশ্যক হইল; তা ছাড়া, দস্যুদের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিতে হইত বলিয়া, কতকগুলি রণদক্ষ নেতার প্রয়োজন হইল। এই দুই প্রয়োজন হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি।

আর্য্যদিগের মনে কতকগুলি দার্শনিক সমস্যা উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা ভাবিল,—ঐ সকল সমস্যা, যে সকল ব্যক্তির জীবনের বিশেষ আলোচ্য বিষয়, কেবল তাহারাই ঐ সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ। তা ছাড়া আর্য্যেরা দেখিল, তাহারা স্বল্প লোক—পীত কৃষ্ণবর্ণের অসংখ্য লোকের মধ্যে বাস করিতেছে, যদি তাহারা ঐ সকল লোক হইতে পৃথক্ হইয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য, বিজেতারা যাহাতে বিজিত জাতির মধ্যে একেবারে মিশিয়া না যায়, যাহাকে আর্য্যেরা সগর্ব্বে

বলিত "অসুর-গর্ভজাত উৎকৃষ্ট জাতির নির্ব্বাচিত বীজ"—সেই বীজের বিশুদ্ধতা যাহাতে সংরক্ষিত হয়—এই উদ্দেশ্যে তাহারা উদ্যমের সহিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই উপায়ে, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের অনার্য্য জাতিদিগের সহিত আর্য্যজাতির বিবাহ নিবারিত হইল, আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে, আপনাদের ধর্ম্মমত হইতে দূরে রাখিল, তাহাদের জন্য কেবল কতকগুলা নীচবিশ্বাস ও স্থূল উপধর্ম্ম রাখিয়া দিল। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের বর্ণভেদ-প্রথার উৎপত্তি। সকলের শীর্ষস্থানে দুই শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইহারা বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয়; তারপর বণিক ও কারিগরশ্রেণী—বৈশ্য ও শূদ্র,— ইহারা বিজিত লোক লইয়া গঠিত।

যে বর্ণভেদ-প্রথা পরে এত নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহাই হিন্দু সভ্যতার শৈশব-দোলা বলিলেও হয়, এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে,—যাহা হইতে সমস্ত ধর্ম্মসিদ্ধান্ত, সমস্ত দার্শনিকসিদ্ধান্ত নিঃসৃত—সেই পরমাশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ্য-যুগের আবির্ভাবই হইত না; যাহার অনুপম সৌন্দর্য্য, যাহার বিচিত্র আকার—সেই সংস্কৃত সাহিত্যের উদয়ই হইত না। এক কথায় এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে আর্য্যজাতির অস্তিত্বই থাকিত না; বহুকাল পরে, সমস্ত মানব-ব্যাপারে যাহা স্বভাবত ঘটিয়া থাকে—যখন প্রভুত্বের অপব্যবহার হইতে নানাপ্রকার অন্যায় অত্যাচার উৎপন্ন হইল তখনই শাক্যমুনি বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি সর্ব্বজীবে দয়া ও অহিংসার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শান্ত-ভাবে একটা সমাজবিপ্লব সংঘটিত করিলেন;—অনার্য্য-জাতির কিয়দংশ লোককে আর্য্যজাতির নৈতিক মর্য্যাদার পদবীতে উত্তোলন করিলেন।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NÁTH TAGORE

(TRANSLATED FROM BENGALI,)

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে হর্থাৎ যউপ্রেয়ো বৃণীতে।

"The Good and the Plcasant solicit men; the wise ponder over and distinguish between them. Blessed is he who clings to the good; he who chooses the pleasant misses life's highest end"

To let the flowers of love and reverence for God bloom in our hearts, to establish a deep, inalienable union between our soul and the supreme Soul, to follow His path and to do His work, this is *Sreyas*—the Good—Righteousness. To be led away by the impulses of an unregulated will, to be absorbed in the pleasures of this world, renouncing God and Religion, this is *Preyo*—the Pleasant—Worldliness. If we accept as our guide Righteousness that carries with it all that is good, it brings us to the presence of God, but if we follow Worldliness in the quest of sensual enjoyment we reach only the degrading depths of the Worldling.

অন্য চ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।

"The Good is one thing, the Pleasant another. These two attract the heart of man towards two different paths." Righteousness maketh us walk in the path of virtue which is narrow as the sharp-edged razor but in the end brings us to the Eternal, the Supreme Spirit; while Worldliness lures us on through a path not of God's unto the world and flings us into its boiling cauldron. There is the path that brings you sensual pleasure, wealth and renown, rank and power and absolute license; and there is also the path that guides you to a mine of inestimable treasures—self-respect, holiness, God and liberty; of these two paths which would you choose to follow? If you desire to invigorate and elevate your soul to meet the trials and troubles of life, if you wish to be blessed with the smiles of a clear conscinence, if your heart be fixed upon the Lord and pants after Him, then follow the path of Righteousness; Righteousness shall liberate you from the tangled knots that bind your heart to the world and bring you to the all-embracing Love, the infinite Holiness and Beauty of the Supreme Spirit. The path of Righteousness is the path for man, the path of Righteousness is the path for the *Devas*, the path we have to tread through Eternity; let us then give to Righteousness a place in our heart and shun Worldliness from afar. O my young freinds, put yourselves on your guard, and learn to tread the path of life with caution from the very dawn of your youth. You are in the period of life when the eyes of intelligence are keen and bright, when the body and mind are full of energy and enthusiasm; take heed that, notwithstanding these safe-guards at your command, you fall not into the dark pit of Worldliness which lies hidden, covered with green grass, beneath your feet.

Hark! the voice of Righteousness calleth, "Come unto me. I will lead thee to the all resplendent world of *Brahman*, the supreme Spirit."

In our heart rages the fierce contest between Good and Pleasure, between Righteousness and Worldliness. We live on the confines of these two contending elements. On one side is the Siren of Worldly pleasure, using all her bewitching arts to drag us down into the slough of the world, on the other is the Angel of Righteousness who, filled with a mother's love, clasps our hands and is eager to lead us to the land of Immortality. The Siren of Worldliness, with poison in her heart but honey on her lips, comes to us and tempts us saying:—

শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি হিরণ্যমশ্বান্ ।

Accept from me sons and grandsons who shall live a hundred years, here are gold, herds of cattle, elephants, horses and equipages, all ready for thee. Follow me, and fragrant breezes shall cool thy body, in thy palace song and dance, laughter and merriment shall pereniально scatter gladness and joy, sweet perfumes shall thrill thy senses, charming damsels shall serve and attend on thee, men shall prostrate themselves at thy feet, thou shalt be the master of all, thou shalt be the ruler over extensive kingdoms and thy fame shall spread through all lands. Accept me and I will fill the cup of thy desires." The pure-hearted resolute youth heard these words of evil counsel but remained unmoved and calm as the solemn ocean and answered thus:—

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ জরয়ন্তি তেজঃ ।

The temptations thou wouldst lead me into would wear out the vigour of all my senses; our longest life is brief; death is lurking behind me and on the slightest pretence it will rob me of my life and all my possessions, so keep thou thy horses and equipages, keep thy songs and dances for thyself. Nothing whatever that thou canst give me will ever satisfy me.

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ ।

No man can be made happy by wealth. My heart cannot rest on transient mortal things. I look back upon my past life and can find no trace of true happiness, nothing but sorrow and grief and anguish, and prying into the future I can discern that the world will never give me the joy that is born of peace; I shall not, therefore, be any more deceived by thy tempting promises and be whirled along the tortuous paths of the world. But if thou hast anything in thy gift so lovely and beautiful that by loving it I can love all the world besides and all the love of my heart may find the fullest satisfaction, yet never become exhausted; if thou hast any boon so precious, then place it in my hands, I pray thee, that my restless soul may be soothed and comforted. Oh grant this my earnest prayer, and I shall remain thy devoted slave for ever." Puzzled by these words, the Enchantress glided away in gloomy silence. Left to himself, that noble youth found his mental horizon dark and dismal and was overpowered by its depressing aspect. True, the temptations of the world had departed but the cravings of his soul were not yet satisfied. He was plunged into an ocean of misery, for neither the pleasures of the world nor the joys of heaven were his. Life seemed to wear to him the grim, sombre appearance of the graveyard. How dreadful is this state in a man's life when he has no appetite for the pleasures of the world neither does he enjoy the fellowship of God. Then we experience a deep craving for God but fail to discern the means of satisfying that inner craving. Then we become restless like the panting hart and pass through the direst tribulations of life. With a heart sore distressed, we eagerly ask of all whom we meet the way to save ourselves from the torments of this fiery ordeal but no answer do we get that can afford solace to the mind, that can cheer up the panting heart. When fallen into such a plight the forlorn and miserable youth wept and bewailed, when being without a refuge he sought the refuge of life, then the white-robed Angel of Righteousness appeared before him and soothed him with these words:—"Why dost thou mourn? Why, consumed with grief and bereft of peace, dost thou roam in the wilderness? Behold the image of love and goodness of Him whose love keeps the universe alive, and turn your

tears of grief into tears of love and joy. Secure peace of soul by wholly giving thyself up to him who is worthy of our highest devotion and love, the treasure of whose love, once possessed, endureth for ever. Awake ! Arise from the sleep of infatuation. I will take thee to the heavenly mansion of the all-loving Lord." The heart of that virtuous youth melted at these loving, life-giving words of the sweet spirit and anxiously did he interrogate him thus: "Who art thou ? Whence comest thou ? Where shall I go and what shall I do to assuage this tormenting agitation of my soul ? Where is the water of life that will moisten my parched "soul ?" In comforting tones the Angel replied. Behold that all pervading infinite spirit ; in thine inmost being is He present in all His glory, in thy finite soul is that infinite, Eternal Being firmly enthroned. Pray with all thy heart that He may reveal Himself to thy spiritual vision and anon will he manifest His ineffable light before thee and reveal to thee the straight path of virtue. The *Rishis* of old declare that path to be as the sharp edge of a razor, hard to tread; take refuge in the Almighty and thou shalt find that path easy to follow. In the pursuit of virtue one must be regardless of material comfort or discomfort. Follow it for its own sake, whether in prosperity or adversity. Remember that this world is not the goal of human existence; man's present state of living is a state of trial, a state of training and discipline. It is through sorrow and suffering, through dangers and perils and self-sacrifice that he advances in the path of virtue ; nay, at certain critical junctures, he may even be called upon to lay down his life cheerfully that God's will may be done. I do not tempt thee with vain promises of pleasure. Pleasure or enjoyment is not the end and aim of virtue. Can the transient pleasures of the world—enjoyment that depends on filthy lucre, on flesh and blood and can be obtained even by foul means, can this be the reward of Virtue which receives the homage of angels ? The reward of Virtue is Virtue itself, and the silent approbation of conscience,—its reward is God Himself. Therefore rouse thy drooping spirit and setting aside all the littleness that is thine, let thy whole heart be suffused with the light of Divine love. Keep nothing for thyself, give up thine all to Him and thou shalt instantly attain thy heart's desire of seeing the Lord face to face."

Laying to heart these profound, ennobling words of the gracious spirit, the pure-souled youth placed himself under the protection of the Almighty Lord and was infinitely blessed by beholding Him in his own soul. The world assumed in his eyes a newer and more gracious aspect and what had hitherto been to him an aching void now appeared to be full of a blessed reality. He surrendered his life to the Lord who is the source of life and, liberated from death, was blessed with life ever-lasting. Whosoever, like this youth, will follow Righteousness and consecrate his life and mind to God shall obtain Immortality as surely as he.

নানা কথা।

উত্তর মেরুর কর্ম্মবীর। উত্তর মেরু প্রদেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ধর্ম্মপ্রচারক গ্রেন্‌ফেলের জীবন বাস্তবিকই অদ্ভুত। তিনি এস্কুইমো এবং লাব্রাডোরবাসীদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই দুই জাতি গভীর সমুদ্রের জেলে, তিনি তাহাদের চিকিৎসক, গুরু ও বন্ধু। গ্রেন্‌ফেল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি পৃথিবীতে কিছু ভাল কাজ করিতে পারিবেন মনে করিয়া, উত্তর আমেরিকার এই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুর্ব্বর প্রদেশকে নিজের বাসভূমি মনোনীত করিয়াছেন এবং লাব্রাডোরে ব্যাটল্ হার্ব্বর (রণ-বন্দর) নামক স্থানে তিনি প্রধান বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই খানেই তাঁহার ভাণ্ডার থাকে। এই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনমত চিকিৎসার অস্ত্র ঔষধাদি, বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক, ফুটবল্ আর তাঁর প্রাণভরা সদ্ভাব ও প্রসন্নতা সঙ্গে লইয়া তিনি শত শত ক্রোশ দূরে তুষারকঠিন অভ্যন্তর-দেশে যাইয়া থাকেন। ডাক্তার গ্রেন্‌ফেল্ সেখানে যাইবার পূর্ব্বে, সে দেশের নরনারীরা ডাক্তারের কোন ধারই ধারিত না; এমন কি ডাক্তার জিনিসটা কি তাহারা কখনও চক্ষেও দেখে নাই। তিনি অনেকবার অনেকানেক দুঃসাহসের কাজ করিয়া শেষবারে ভয়ানক বিপদে পতিত হয়েন। তিনি বলেন "পাঁচ ক্রোশ দূরে, ভাসমান তুষার-

স্তূপের পরপারে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশে কতকগুলি রোগী দেখিবার জন্য আমি ব্যাট্‌ল হার্বর হইতে বাহির হইলাম। শীত বড়ই তীব্র, তাপমান যন্ত্র জিরোরও দশ ডিগ্রী নীচে। আমি কুকুরের পাল সঙ্গে লইয়া বরফের উপর দিয়া চলিতেছিলাম। দেখি বরফস্তূপ ক্রমে তীর ছাড়িয়া ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। অবস্থাটা ভাল করিয়া বোধগম্য হইতে না হইতেই দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বরফের টুক্‌রা পদভরে জলমগ্ন হইতেছে। কুকুরগুলিকে থামাইয়া রাখিবার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া একেবারে হিমসাগরের ভিতরে পড়িলাম।

কুকুরেরা ত আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্ত কোন নিয়ম জানে না; তাহারা সকলেই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমার কাঁধের উপর চড়িবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। তাহাদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত। সংগ্রাম করিয়া কুকুরদের তাড়াইয়া দিয়া পরে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে অবকাশ পাইলাম এবং একটা নিরেট বরফস্তূপের উপর চড়িলাম। কুকুরেরা নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। তাহারা আঁচড় পাঁচড় করিয়া ঐ স্তূপে উঠিয়া আমার কাছে আসিল।

সমস্ত কাপড়, এবং আমার ও কুকুরদের খাবার সবই হারাইয়াছি, কিছুই নাই। ঠিক সেই সময়ে উত্তর পশ্চিম হইতে একটা প্রবল বাতাস উঠিয়া আমাদের স্তূপটাকে খোলা সমুদ্রের দিকে বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মনে হইতে লাগিল এবার আর কোন আশা নাই। দেখি তাপমান যন্ত্র দ্রুত নামিতেছে। আমার গায়ের সব কাপড় একেবারে ভিজে। আমার চামড়ার বুট জুতা খুলিয়া একখণ্ড বুকে ও একখণ্ড পিঠে জড়াইলাম। বাতাস ও শীত বাড়িতে লাগিল, রাত্রি হইয়া আসিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম কুকুরেরা ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। কুকুরদের যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখন তাহারা ঠিক নেকড়ে বাঘের সমান হইয়া উঠে। তাহারা খাদ্যের জন্য ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল; আর অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যে আমাকে খাইয়া ফেলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

আমার মনে হইল আর রক্ষা নাই। কি করি, আর কোন উপায় না দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় তিনটি কুকুরকে মারিয়া ফেলিলাম। যখন মৃত কুকুরদের ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলাম, তখন কুকুরের পাল দূরে সরিয়া যাইয়া রাগে গোঁ গোঁ ও ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। শেষে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী কয়টা কুকুর আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের সহিত লড়ালড়ি করিয়া, তাহাদিগকে দূরে হটাইয়া দিয়া ছাল ছাড়ান কাজ শেষ করিতে সক্ষম হইলাম। সমস্ত মাংস কুকুরের পালকে দিলাম এবং নিজের গা ঢাকিবার জন্যে চামড়াগুলা রাখিলাম। সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিল।

সকাল হইলে দেখি তুষার-স্তূপ তীরবেগে কূল হইতে সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া এমন কোন দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড বা অন্য কিছু দেখিতে পাইলাম না, যাহার উপর নিশান উড়াইয়া দূরস্থিত লোকদিগের নিকট আমার সঙ্কট জ্ঞাপন করিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে মৃত কুকুরদের পায়ের লম্বা লম্বা হাড়গুলার কথা মনে পড়িল। সেই হাড়গুলা জুড়িয়া দণ্ড প্রস্তুত করিলাম, তাহার উপর আমার কামিজের এক টুক্‌রা কাপড় বাঁধিয়া দিলাম। লক্‌স্ কোব নামক স্থান হইতে জর্জ রিড এবং অন্যান্য গুটিকতক লোক এই নিশান দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা বোটে করিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন।”

বিগত সতের বৎসর হইতে ডাক্তার গ্রেন্‌ফেল এই জেলে-জাতির মধ্যে বাস করিয়া সকলকেই আবশ্যক—মত তিনি সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার দুখানি হাঁসপাতাল জাহাজ চোরা-বরফের ভিতর হারাইয়া গিয়াছে; এক্ষণে আর একখানি করিয়াছেন। অনেক সময় ক্রোশ ক্রোশ দূরে এমন সব স্থানে তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে যাইতে হয়, যেখানে রোগীদের নিকটে হাঁসপাতাল জাহাজ কোন রূপেই পৌঁছিতে পারে না। সে সব স্থানে তিনি তাঁর কুকুরের পাল সঙ্গে লইয়া, বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইয়া থাকেন।

এই কয় বৎসরের মধ্যে, ডাক্তার গ্রেন্‌ফেল্ লাব্রাডোরে তিনটি হাঁসপাতাল, একটি শ্রম-শিক্ষা বিদ্যালয়, ছয়টি সহভোগী-সহভাগী (co-operative) ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ডাঙ্গা এবং জালিয়া নৌকার মধ্যে তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সকল স্থানের রোগীরা সত্বর তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হয়।

ডাক্তার গ্রেন্‌ফেল্ বলেন তুষারাবৃত উত্তরের এস্কিমো ও ইণ্ডিয়ান্ জাতিরা ক্রমে লোপ পাইয়া আসিতেছে। বন জঙ্গল ধ্বংস হওয়াতে করিবুরা (এক প্রকার জীব) আশ্রয়স্থান পায় না। করিবু অভাবে ইণ্ডিয়ন্ জাতি অনাহারে কষ্ট পাইতেছে।

সাদা মানুষদের রোগবিষপ্রবল শরীরের নিকট যে সকল রোগ অগ্রসর হইতে পারে না, সে সমস্ত রোগ এস্কিমোজাতির রোগবর্জ্জিত বিশুদ্ধ শোণিত পান করিয়া বিষম পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। একবার এক,

জন সাদা নাবিক, সমাজ সর্দ্দিগ্রস্ত অবস্থায়, এক এক্সিমো গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। সে গ্রামের জন সংখ্যা তিন-শত। কাঁচা সর্দ্দি সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিতে না উঠিতেই এক চল্লিশ জন এক্সিমো পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

বহুদিন পূর্ব্বে, লর্ড ষ্ট্রাথকোণ বলিয়াছিলেন যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, উত্তর আমেরিকা-প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ লোক কে এবং কোন্ মহাপুরুষ আদর্শ-বীরের সমধিক সামীপ্য লাভ করিয়াছেন? আমি উত্তরে বলিব, ডাক্তার গ্রেণ্‌ফেল্। তিনি অতি সুদক্ষ খেলোয়ারের সহিত ফুটবল খেলিতে পারেন, হিমে রোগীর অসাড় অঙ্গ কাটিয়া দিতে সক্ষম, ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাইয়া দিতে বিশেষ পারগ, গুরুতর নিউমোনিয়ারোগের যথোচিত চিকিৎসা করিতে বিশেষ দক্ষ এবং দুষ্ট লোকের উচিৎ শাস্তি দিতেও তৎপর; ডাক্তার গ্রেণ্‌ফেলের দ্বারা না হয় এমন অল্প কাজই আছে। উত্তর আমেরিকার মধ্যে তিনি একজন যথার্থ বীরপুরুষ।

শ্রীসত্যব্রতা দেবী।

Popular Science Siftings.

পদ্মার পুল। সারাঘাটের নিকটে রায়তা Raita নামকস্থানে পদ্মাবক্ষে লৌহ সেতু নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। তাহার উপর দিয়া রেল চলিবে। কেবলমাত্র সেতু নির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় দুই কোটী টাকা পড়িবে; সময়ও প্রায় ৫ বৎসর লাগিবে।

সাহায্য-লাভ। Salvation army মুক্তি-সেনা নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিবৎসর সাহায্য স্বরূপ সাধারণের নিকট ৩৪৫০০০ পাউণ্ড পাইয়া থাকেন। উহার প্রতি ১২ পাউণ্ডের ভিতরে ১১ পাউণ্ড ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে, ১ পাউণ্ড মাত্র সামাজিক হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়। দানের মাত্রা দেখিয়া দাতা ও গৃহিতা উভয়েরই হৃদয়ের বিশালতা ও কার্য-কুশলতা বুঝা যায়। এত টাকা আহরণ ও বণ্টন উভয়ই বিস্ময়াবহ। হায়! কত শত হিতকর কার্য্য অর্থাভাবে এদেশে অনুষ্ঠিত হইতে পায় না। The christian life-5 th. sep.

কাচ। ভারতের সমতল ভূমি কাচ নির্ম্মাণ পক্ষে উপযোগী নহে। হিমালয় প্রদেশে কাচের কারখানা স্থাপনের উদ্‌যোগ হইতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে উৎপন্ন কাচ নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। ভারতে যে সকল কাচের সামগ্রী বিদেশ হইতে আইসে, তাহার মূল্য প্রায় এককোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ বিশেষ ভাবে সমাকৃষ্ট হওয়া উচিত। The Indian world august. 1907,

রবার। রবারচাষের দিকে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ রূপে লক্ষ্য রহিয়াছে। সিংহল দেশ উক্ত চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ১৯০৬ সাল আসাম-জাত রবারের পরিমাণ প্রায় চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু সিংহল-জাত রবারের পরিমাণ ১৯০৫ সালের প্রায় এক লক্ষ ৭৮ হাজার পাউণ্ড হইতে ১৯০৬ সালে ৩ লক্ষ সাতাইশ হাজার পাউণ্ডে উঠিয়াছিল।

শিক্ষা ব্যয়। ভারতে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে ইংরাজরাজ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জাপানের তুলনায় তাহা কিছুই নহে বলিতেও অত্যুক্তি হয়না। প্রতি সহস্র অধিবাসীর শিক্ষার জন্য জাপানের ব্যয়ের পরিমাণ ১৬৯৫৲ টাকা, কিন্তু ভারতীয় রাজকোষে ১৬৭৲ টাকা দিয়াই ক্ষান্ত।

The Indian world

ধর্ম্মযাজকের আয়। Times পত্রিকায় প্রকাশ স্পেন দেশে (parochial clergy) যাজকের সাপ্তাহিক আয় পাঁচ সিলিং এর অধিক নহে। আয়ের অল্পতা হেতু প্রতিসপ্তাহে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। অবশ্য যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের যথেষ্ট আয় আছে। হায়! আমাদের দেশেও পুরোহিতগণের আয় দিন দিন খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। টোলের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। শাস্ত্রজীবীর সংখ্যার অল্পতা দেশের প্রকৃত দৈন্যের পরিচায়ক।

মূর্ত্তিপূজা। মূর্ত্তিপূজার দিকে মনুষ্যের দুর্ব্বলতা সকল দেশেই পরিলক্ষিত হয়। Times বলেন বিশেষ বিশেষ স্থানের Virgin কুমারী মেরীর মূর্ত্তির উপরে স্পেনের সমধিক শ্রদ্ধা। ঈশ্বরের উপরে যেন তত নহে। Barcelona বারসিলোনার নিকট সেণ্ট জোসেফের এক মূর্ত্তি আছে। প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র আবেদন তাঁহার মন্দিরে প্রেরিত হয়। বিশেষ দিনে শ্রদ্ধার সহিত ঐ আবেদন পত্রগুলি ঐ মূর্ত্তির সমক্ষে অগ্নিসাৎ করা হয়। প্রেরকগণের বিশ্বাস তাঁহাদের আবেদনপত্রে লিখিত পাপ হইতে পরিত্রাণের নিবেদন উক্ত Saint এর নিকট এইভাবে পৌছায়। Christian life. 12 th. sep.

নদী।—মিশর দেশস্থ (Nile) নাইল নদীতে বারশত মাইলের ভিতরে অন্য কোন নদী আসিয়া মিশে নাই। জর্দন নদী সর্ব্বাপেক্ষা বক্র এবং ইহার গতি সর্পের ন্যায়। ষাট মাইল পৌছিতে এই নদী দুইশত তের

মাইল পথ প্রদক্ষিণ করিয়াছে। গঙ্গার জলস্রোত রাইনের (Rhine) মত তিনটি নদী-প্রবাহের সমান। মিশিসিপির জলস্রোত তিনটি গঙ্গাস্রোতের সমান। আমেজনের জলস্রোত তুইটি মিশিসিপির সমান।

The Same paper.

আদি ব্রাহ্মসমাজের ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত মহারাজা	টিপারা	১০০৲
শ্রীমতী মহারাণী	কুচবেহার	৫০৲
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	২৫৲
„ আর, এন, মুখোপাধ্যায়	„	২৫৲
„ মহারাজাধিরাজ	বৰ্দ্ধমান	২৫৲
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১০৲
„ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	১০৲
„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	„	১০৲
„ বি, এল্ চৌধুরী	„	১০৲
„ মহারাজা	মৈমনসিং	১০৲
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১০৲
„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	„	১০৲
„ নরনাথ মুখোপাধ্যায়	„	৫৲
„ বিহারীলাল মল্লিক	„	৫৲
„ রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	„	৫৲
„ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী	„	৫৲
„ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	„	৫৲
„ এস, কে, লাহিড়ী	„	৫৲
„ অক্ষয়কুমার ঠাকুর	„	৩৲
„ হরিশচন্দ্র ঘোষ	„	৪৲
		৩৩২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী,	জীবনপুর	৩৶০
শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন মিশ্র	দ্বারকাপুর	১৶০
„ ডাক্তার ডি, এন, চাটার্জ্জি	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু রাধা গোবিন্দ রায়সাহেব বাহাদুর	দিনাজপুর	৩৶০
„ „ রসিকলাল রায়	কলিকাতা	১৷০
„ „ বিপীনবিহারী ঘোষাল	হরা	২০৲
„ „ কালিকা দাস দত্ত	কুচবেহার	১৬৸৶০
„ মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	মুরশিদাবাদ	১২৷৶০
„ বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায়	কলিকাতা	১৲
„ „ গৌরীশঙ্কর রায়	কটক	৩৶০
„ „ মহেশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকুড়া	৩৸০
„ „ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
„ সম্পাদক হরিসেনা মণ্ডলী	„	৩৲
„ বাবু প্যারীমোহন রায়	„	৮৲
„ „ অক্ষয়কুমার ঠাকুর	„	৬৲
„ „ লালবিহারী বসাক	„	৩৲
„ „ বিহারীলাল মানক	„	৩৲
„ „ রামকৃষ্ণ মিশ্র	সম্বলপুর	৩৷০
„ „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
„ „ রামচন্দ্র মিত্র	„	৩৲
„ „ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	রায়গঞ্জ	১৬৸৶০
„ „ প্রসাদদাস মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
„ „ সতীশচন্দ্র মল্লিক	„	৬৲
„ „ কেদারনাথ রায়	„	৩৲
„ „ রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	„	৩৲
„ বাবু বনমালী চন্দ্র	„	৩৲
„ „ অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	১৷০
„ „ চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩৶০
„ কুমার হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী	ভবানীপুর	১৷০
„ „ গোবিন্দলাল দাস	কলিকাতা	৩৲
„ „ শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য	„	৩৲
„ „ কানাইলাল শেঠ	„	৩৲
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	বিরহামপুর	৩৶০
„ „ গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ এস, কে লাহিড়ী	„	৩৲
„ „ লালবিহারী বসাক	„	৩৲
„ „ গণেশপ্রসাদ লালা	দারভাঙ্গা	৩৶০
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	দেবানন্দপুর	৩৶০
„ „ শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	আন্দুল	৪৷০
„ „ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
„ „ ললিতমোহন রায়	„	১৷০
„ „ রজনীকান্ত পাট্টাদার	ডিব্রুগড়	৩৶০

সপ্তদশ-কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
পৌষ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯।
৭৮৫ সংখ্যা ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা।

"আসুপ্তে রামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তবার্ত্তয়া।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুরু বা আচার্য্য বিবেক বৈরাগ্যাদিযুক্ত ব্রহ্মবুভুৎসু শিষ্যকে 'অধ্যারোপ' ও 'অপবাদ' এই দুই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝান। 'অধ্যারোপ' ও 'অপবাদ' এতন্নামক যুক্তিদ্বয় ব্যতীত আরও অনেক যুক্তি বুঝাইবার উপযুক্ত সুপথ আছে, পরন্তু সে সকল উপরোক্ত যুক্তিদ্বয়ের পোষক বা সহায়। অধ্যারোপ শব্দের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ—

অধি+আ+রূপধাতুনিষ্পন্ন রোপ, অধ্যারোপ। অধি—অধিকরণ অর্থাৎ আধার। আ—মিথ্যা। রূপ—আকার। মিলনে এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় যে, কোন এক আধারে অন্য এক মিথ্যা আশয় প্রতীত হওয়া। আধারটি সত্য, পরন্তু তাহাতে যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা মিথ্যা। রজ্জুরূপ আধারে সর্পের আকার প্রতীতি হয়, এস্থলে প্রতীয়মান সর্প মিথ্যা, পরন্তু তাহার অধিকরণ রজ্জু সত্য। এতাবতা ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অধ্যারোপ, আরোপ, ভ্রম, এ সকল কথার অর্থ এক বা অভিন্ন। বেদান্তোক্ত উক্ত পরিভাষার আরও বিশিষ্টার্থ এই যে, কোন এক সত্য বস্তুতে অন্য এক প্রকার আগন্তুক মিথ্যা জ্ঞান। আচার্য্য এবম্বিধ অধ্যারোপ বর্ণনা করিয়া শিষ্যকে এই বলিয়া বুঝান যে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি, যৎপরোনাস্তি মহান্ পরব্রহ্মে এই বিস্তীর্ণ বিশ্বের ভ্রম জন্মিয়া রহিয়াছে। অপিচ, যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পজ্ঞানের মিথ্যাত্ব অবধারণ করা হয়, তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও পশ্চাৎ এই দৃশ্যমান্ বিশ্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। এই বিশ্ববিভ্রম প্রাপ্তি, বদর মুষ্টির ন্যায় যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, অর্থাৎ ইহার মধ্যে ক্রম সন্নিবিষ্ট আছে। অর্থাৎ একটীর পর আর একটি, তাহা হইতে অন্য একটি, এতদ্রূপক্রমে পরম্পরা নিয়মে উৎপন্ন হইয়াছে। তাদৃশ ক্রমপরম্পরার অন্য নাম সৃষ্টি। বেদান্ত মতের এই সৃষ্টিক্রম অতি বিস্তীর্ণ ও নিতান্ত দুষ্প্রতর্ক্য। সেজন্য কেবল তাহাই অন্যূন ২টি প্রবন্ধে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণন করা উচিত বোধ করিলাম। এবং 'অপবাদ' যুক্তি

কিরূপ? তাহা সৃষ্টিক্রম বর্ণনার পরে বলা সঙ্গত বোধ করিলাম। এ প্রবন্ধে, কেবল সেই বিশাল বিশ্ব-বিভ্রমের অন্তর্গত আত্ম-বিভ্রমের দুই চারটি কথা আলোচিত হইল। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, বেদান্তীরা শিষ্যের নিকট নিম্ন প্রকার আত্মবিভ্রম বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ স্বমতের আত্মতত্ত্ব শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়া থাকেন। তদ্ যথা—

সকলেরই একটা সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে। তাহা অহং—আমি—এইরূপ ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। এ জ্ঞান সংসারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ নহে; পরন্তু সংসার দৃঢ় হওয়ার পক্ষে কারণ। এই শরীরের মধ্যে "প্রকৃত বা বাস্তব আমি" কি?—তাহা নিশ্চিত রূপে জানা আবশ্যক, নচেৎ সামান্যতঃ আত্মজ্ঞানে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। তাদৃশ বিশেষ-নিশ্চয় ব্যতীত মোক্ষপথের পথিক হওয়া যায় না। আমি কি? আত্মা কি? কিম্বিধ পদার্থ আত্মা,—জানিবার জন্য সেই সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত শত শত লোক অনুসন্ধানতৎপর হইয়া রহিয়াছে, অথচ তাহাদের ভাগ্যে প্রকৃত বা বাস্তব আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। কেবল এক একটা সম্প্রদায়ের অর্থাৎ দলের সংগঠন হইয়াছে ও হইতেছে মাত্র।

এক দলের ধারণা, এই দেহই আত্মা। ইহাতে যে জ্ঞান-নামক গুণ আছে, তাহা ইহারই ধর্ম্ম অথবা দেহোপাদান ভূত-সংঘের সংযোগবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন। যেমন তণ্ডুল ও গুড় প্রভৃতি মদ্যোৎপাদন-দ্রব্য পরিমাণ-অনুসারে পচাইলে তাহাতে মাদকতা শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ, দৈহিক উপাদানের সমবায়ে দেহেও চৈতন্য নামক গুণের আবির্ভাব হয়। এই চেতনা গুণ যাবদ্দেহ তাবৎ বিদ্যমান থাকে, দেহের বিনাশে তাহারও বিনাশ হয়। অপিচ, প্রত্যেক মনুষ্যই দেহকে লক্ষ্য করিয়া "আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি রুগ্ন" ইত্যাদি প্রকার অনুভব ও তৎপ্রকাশক ভাষা উচ্চারণ করিয়া থাকে, ইহাদের সেই অনুভবই দেহাত্মতাবাদের প্রমাণ।

অন্য এক সম্প্রদায়ের ধারণা—এই শরীরস্থ ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টিই আত্মা, শরীর আত্মা নহে। কেন না, ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর নিশ্চেষ্ট হয়, এবং বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অপিচ, আমি কাণা, আমি বধির, এইরূপ অনুভূতি ইন্দ্রিয় সমষ্টির আত্মত্ব প্রমাণ।

আবার অন্য দলের মত—প্রাণই আত্মা; অন্য কোন আত্মা নাই। কারণ এই যে, প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয় সকল নিঃপাতিত হইয়া থাকে। প্রাণের আত্মত্বে আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি তৃষ্ণার্ত্ত, এইরূপ সমানাধিকরণ্য অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণা এ সকল প্রাণধর্ম্ম, তৎসমানাধিকরণ্যে, "আমি" এতদ্রূপ অনুভব হওয়ায় সুতরাং প্রাণেরই আত্মত্ব নিশ্চয় হয়।

অপর এক দলের মত—প্রাণও আত্মা নহে। যখন দেখা যায়, মনের অভাবে প্রাণাদিরও অভাব সংঘটন হয়, তখন মনকেই আত্মা বলা উচিত। কেননা ইচ্ছা, দ্বেষ, ও কামনা, প্রভৃতি মনোধর্ম্মের সহিত আত্মার অর্থাৎ আমার একধর্ম্মিতা দৃষ্ট হয়। যথা—আমি ইচ্ছা করি, আমি কল্পনা করি, ইত্যাদি।

অন্য এক দল বলেন, মনও আত্মা নহে, বিজ্ঞান নামধেয় বুদ্ধিই আত্মা, এই বিষয়ে যুক্তি ও অনুভব এই যে, মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কারণ। কর্ত্তা যাহার ব্যাপারে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তা-

হার নাম করণ। যেমন ছেদন-ক্রিয়ার করণ অস্ত্র, সেইরূপ। অপিচ, কর্ত্তা না থাকিলে করণ কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং বুঝা উচিত যে যাহা মনের প্রেরক তাহাই আত্মা। মনের প্রেরক বুদ্ধি, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

এইরূপে কেহ আত্মাকে জ্ঞানগুণশূন্য ও জড়পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা আত্মাকে খদ্যোতিকার ন্যায় জড় অজড় প্রকাশ অপ্রকাশ দ্বিরূপবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন। কেহ বা আত্মাকে শূন্য পদার্থ বলিয়া মনে করিতে লজ্জিত হন না।

শ্রুতি, যুক্তি, আত্মবিৎগণের অনুভব, —এই প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, ঐ সকল আত্মা নহে। আত্মা ঐ সকলের উপরে, ঐ সকলের প্রকাশক, ঐ সকলের সত্তা-স্ফূর্ত্তিপ্রদ বিশুদ্ধ চৈতন্য। যাহাকে জ্ঞান বলা যায়, সে সকল অর্থাৎ ঘটাকার জ্ঞান পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদি প্রকারে যে বিবিধ জ্ঞান অনবরত উত্থিত ও লুক্কাইত হইতেছে, বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ আত্মা সে সকলকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমরা "আমি বুঝিয়াছি, আমি জানিয়াছি" ইত্যাদি প্রকারে উল্লেখ করিয়া থাকি। বাহিরের দৃশ্যসমূহ হইতে শরীরবর্ত্তী বুদ্ধি পর্য্যন্ত পদার্থ জড়, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য। চৈতন্যরূপই আত্মার প্রকাশ্য। এই স্থানে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহা যাহা চৈতন্যের প্রকাশ্য, তাহা তাহাই জড় ও নশ্বর; আত্মজ্ঞ ঋষি তপস্বিগণ এইরূপে অনুভব করেন যে, আমি ব্রহ্ম। তাহার কারণ এই যে, "আমি" এই উল্লেখ অর্থাৎ এই কথাটি মুখ্যতঃ সাক্ষাৎ চেতনাকে লক্ষ্য করে এবং সাক্ষাৎ চেতনার অন্য নাম ব্রহ্ম। তাহাই দেহে দেহে—প্রত্যেক দেহের মনোরূপ উপাধিতে, দর্পণে মুখবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন একই চন্দ্র নানা জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অজ্ঞান বালকেরা নানা চন্দ্র মনে করে তেমনি সেই আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী একই আত্মা নানা আধারে প্রতিফলিত হওয়ায় অজ্ঞ জীব নানা আত্মার অস্তিত্ব মনে করিয়া থাকে। এই আত্মা যেমন প্রত্যেক দেহে প্রোক্ত প্রকারে বিরাজিত, তেমনি দেহের বাহিরেও প্রত্যেক জড়পদার্থেও বিরাজিত। আত্মজ্ঞগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্যবহারিক পদার্থের মধ্যে যে নাম ব্যবহার হয় ও সে সকলের যে একএকটা রূপ দেখা যায়, সে সমস্তই অজ্ঞানের প্রভাব বৈ অন্য কিছুতে নহে। তবে, সেই সঙ্গে সে যে সকলের সত্তা, প্রকাশ, ও প্রিয়াপ্রিয় ভাব প্রকাশ করে, তাহাই ব্রহ্মের রূপ।

"অস্তি, ভাতি, প্রিয়ং, রূপং. নাম চেত্যর্থ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥"

অস্তি—আছে। ভাতি—প্রকাশ। প্রিয়—ভাল ভাব। রূপ—আকৃতি।' এই পাঁচ লইয়া জগৎ। জগতে এই পাঁচের অতিরিক্ত অন্য কোনও ভাব নাই, ঐ পাঁচের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন ভাব ব্রহ্মের নিদর্শন বা ব্রহ্মেরই রূপ বলিয়া বিবেচ্য এবং পশ্চাদুক্ত দুটিভাব অর্থাৎ নাম ও রূপ এই দুই ভাব জগৎ বলিয়া গণ্য।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১। তংব্রহ্ম আত্মবিৎ পশ্যতি জ্ঞানযোগাৎ ন কর্ম্মযোগেন।

২। জ্ঞানেন বিদ্বান্‌স্তেজ অভ্যেতি নিত্যং
ন বিদ্যতে হ্যন্যথা তস্য পন্থা।

"তুমি সত্যরূপা সর্ব্বাদিম অথবা অ-

নাদি ও অসত্য জগৎ প্রপঞ্চের অতীত ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ। তাহা ধীর ও ব্রহ্মচর্য্যাদিসম্পন্ন সাধু সজ্জনেরই প্রাপ্য। তাহা পাইলে মর্ত্ত্যলোক অতিক্রম করা যায়। (ব্রহ্মব্যতীত) প্রকাশ আর কাহারও নাই। যিনি আত্মবিৎ, আপনাকে জানিয়াছেন, তিনি জ্ঞানযোগে তাদৃশ তাঁহাকে দেখিতে পান, এই সমুদয় জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। যে তাঁহাকে অভিহিত প্রকারে জানে সে অমৃত অর্থাৎ অজ্ঞান-পরিমুক্ত বা সংসার-পরিমুক্ত হয়।"

মৃত্যু এবং অমৃত, এই দুইটিই হইতেছে জীবের বন্ধন এবং স্থিতি লাভের হেতু। "অশনায়াহি মৃত্যুঃ" শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, অশিতুমিচ্ছা অশনায়া সৈব মৃত্যুঃ সাহি মৃত্যোর্লক্ষণং। সর্ব্বদা খাই খাই করিয়া বেড়ানটাই মৃত্যুর লক্ষণ। উদর পূর্ণ করিয়া বেড়ানটাই মৃত্যুর লক্ষণ। কেবল খাওয়া নহে। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহাই খাওয়া। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সমূহে আমরা অহরহ বিচরণ করিতেছি—সুন্দর দেখিয়া চক্ষু বিচার করে ও বাছিয়া লয়, সুশ্রাব্য দেখিয়া কর্ণ বিচার করে ও বাছিয়া লয়, সুগন্ধ দেখিয়া নাসিকা বিচার করে ও বাছিয়া লয়। এই রূপ বিচার ও গ্রহণ কার্য্যেই আমাদের জীবন ও বিচার বুদ্ধি অহরহ নিযুক্ত, ইহাতেই আমাদের কর্ম্মশালা, পণ্যশালা, শিক্ষা ও সাহিত্য পূর্ণ। ইহাই আমাদের বন্ধন-পাশ। যদি ইহাতেই আমরা সমস্ত জীবন ক্ষেপন করি, তবেই মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু এই মৃত্যু-লক্ষণ কর্ম্মজালের মধ্যেই সেই অমৃত বিদ্যমান। সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে শুক্তি আহরণের ন্যায় এই মৃত্যু-সাগর পার হইয়া অমৃত গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরকে পাইয়াছিলেন, তাঁহাতে যুক্ত হইয়া তাঁহার অমৃতরস পান করিয়া অমর হইয়াছিলেন, সেই প্রাচীন কালের ঋষিরাই বলিয়াছেন যে,

"ইহৈব সন্তোঽথবিদ্মস্তদ্বয়ং।
নচেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।"

আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি। যদি তাঁহাকে না জানিতাম তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। ঈশ্বরই একমাত্র শাশ্বত অমৃতানন্দ ও সুখ-আধার।

যেমন একটি শকট-চক্রের নাভি নামক মধ্য বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া তাহার নেমি ও অর সকল নিয়মিত হয়, সেইরূপ একটি নিরবলম্ব সুখ-স্থানকে অবলম্বন করিয়া সংসারে কর্ম্ম-চক্র নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে, "যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি" ইহাতে সুখ আছে মনে করিয়া মানুষ সেই কর্ম্ম করে "না সুখং লব্ধা করোতি" যাহাতে সুখ নাই এরূপ কর্ম্ম করে না, "সুখমেব লব্ধা করোতি" সুখ যাহাতে পায় সেই কার্য্যই করে, "সুখংত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি" অতএব প্রকৃত সুখেরই অনুসন্ধান করিবে। এইরূপ উপদেশ দিয়া আদি ঋষি সনৎকুমার ব্রহ্মপ্রাণ নারদের নিকট সেই নিরবদ্য সুখের স্বরূপ-লক্ষণ এই রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"যোবৈ ভূমা তৎসুখং" যিনি ভূমা অনন্ত মহান্ তিনিই সুখ। "নাল্পে সুখমস্তি" এই অল্পে সংসারে সুখ নাই। অতএব হে নারদ, তুমি সেই ভূমা মহান্ পুরুষের অনুসন্ধান কর। কিন্তু হায়! নেমি ও অরজাল বেষ্টিত ঘূর্ণায়মান শকটচক্রের সঞ্চারে নিবদ্ধ-চক্ষু কে তাহার নাভিস্থানের প্রতি প্রণিধান করে? নিয়ত উত্থান পতনশীল সংসারের কর্ম্ম-চক্রে নিবদ্ধ-মনশ্চক্ষু কয় জন মনুষ্য তাহার নাভিস্বরূপ সেই নিরবলম্ব সুখ স্থানের

প্রতি প্রণিধান করে? যেমন মৃগতৃষ্ণিকাতে জলভ্রম হয় এবং তাহাতে নির্ব্বোধ হরিণ-শিশু তৃষ্ণা নিবারণ মানসে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া নিষ্ফল পরিশ্রমে কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই ঘোর সংসারে সেই নিরবদ্য সুখ-ভ্রমে এক প্রচণ্ড বিষয়-তৃষ্ণার উদ্ভব হইয়াছে। সুখ তৃষ্ণাতুর অবোধ মনুষ্যেরা সুখ ভ্রমে সেই বিষয়-তৃষ্ণায় পতিত হইয়া নিষ্ফল পরিশ্রমে কাতর ও অবসন্ন হইয়া অবশেষে অসুখের গভীর জলধিগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। যাহা প্রকৃত সুখ তাহাই জীবন, তাহার বিপরীত যাহা তাহাই মৃত্যু। শিখ গুরু নানক বলিয়াছেন—

"আখা জীবা, বিসরে মর যাই। আওখন আখা সাচা নাও, সাচা নামকী লাগে ভুক্, ও খাবে সো তরিয়াবে দুখ।"

ঈশ্বরের নামের আখ্যাই জীবন, আর তাহার বিস্মৃতিই মৃত্যু। সত্য নামের আখ্যাই প্রকৃত আখ্যা। যাহার এই সত্য নামের ক্ষুধা লাগে, সে যদি তাহা খায়, তবে সে সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

দেখিতে পাই যে এখানে মৃত্যুই অমৃতের দ্বারপাল হইয়া রহিয়াছে, সংসারের যে দিক হইতে যাত্রা করি, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই মৃত্যুর কটাক্ষ দর্শন করি। সংসারে যত প্রকার অশান্তি আমরা ভোগ করি, তাহার সকলেরই মূলে এক মাত্র মৃত্যুই জাগিয়া রহিয়াছে। গভীর রজনীর নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে ঝিল্লিকারা ঝিঁ ঝিঁ শব্দে যেমন জাগিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের এই মোহ-নিদ্রিত প্রাণের মধ্যে—অজ্ঞান-সুষুপ্তির গভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে এক মাত্র মৃত্যুই তদ্বৎ জাগিয়া রহিয়াছে। তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব, যদি মৃত্যুভয় না থাকিত তবে সে অভাবের প্রতি তুমি কি কখন ভ্রূক্ষেপ করিতে? তুমি রোগশয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছ, যদি মৃত্যুভয় না থাকিত তবে তাহা কি তোমার এত যন্ত্রণা-দায়ক হইত? স্ত্রী পুত্রের বিয়োগভয়, তস্করের উপদ্রব, হন্তার শাণিত ছুরিকা, উগ্রদংষ্ট্রা পশুগণের মুখব্যাদান প্রভৃতি যে কিছু ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমার মনে সতত আশঙ্কার সঞ্চার করে, একমাত্র মৃত্যুভয়ই তাহার মূল কারণ।

যেমন সূর্য্যের অভ্যুদয়ে অন্ধকার চলিয়া যায়, অথবা অন্ধকার চলিয়া গেলে যেমন জ্যোতির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ মনুষ্য ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা হইলে তাহার অন্তঃকরণ হইতে মৃত্যুভয় চলিয়া যায়। অথবা, প্রথমে মৃত্যুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহার আশঙ্কা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারিলে বিষয়-বৈরাগ্য রূপ অরুণোদয়ের পশ্চাতেই মানবের ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মার আনন্দচ্ছটা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তখন সে তাহার সেই চিরাভিলষিত অনন্ত সুখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। মহর্ষি সনৎসুজাত ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। ইনি মহাজ্ঞানী এবং নারদাদি মহর্ষিগণের উপদেষ্টা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে স্বীয় পুত্রগণের মৃত্যু নিশ্চয় কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা লাভের জন্য সেই মনীষী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

সনৎসুজাত! যদিদং শৃণোমি
মৃত্যুর্হি নাস্তীতি তবোপদিষ্টং
দেবাসুরা আচরন ব্রহ্মচর্য্য
অমৃত্যবে তৎকতরন্নু সত্যম্।

হে সনৎসুজাত! শুনিতে পাই, আপনি বলেন, মৃত্যু নাই, কিন্তু দেবাসুরেরা মৃত্যু না হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিয়াছিলেন। অতএব মৃত্যু নাই

এবং আছে এই দুইপক্ষের মধ্যে কোনটি সত্য। ইহা শুনিয়া সনৎসুজাত বলিলেন, হে ক্ষত্রিয়, মৃত্যু আছে এবং নাই, জীবের অবস্থাভেদে এই দুইটিই সত্য। মোহাধীনের মৃত্যু হয়, ইহা জ্ঞানীগণের মত, অতএব আমি প্রমাদ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান শূন্যতাকেই মৃত্যু, অপ্রমাদকে অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত্যু-হেতু বলিয়া থাকি। প্রমাদ বশতই অসুরেরা পরাভূত অর্থাৎ মৃত্যুর বশায়ত্ব হইয়াছে এবং অপ্রমাদপ্রযুক্তই দেবগণ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ মৃত্যু কিছু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তু সকলকে ভক্ষণ করে না, কেননা, মৃত্যুর রূপই উপলব্ধি হইতে পারে না। কেহ কেহ উক্ত প্রমাদ-মৃত্যু ভিন্ন যম নামক মৃত্যুদেবতাকে কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন এই যম দেবতা শিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে শিব হইয়া এবং অশিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে অশিব হইয়া পিতৃলোকে রাজ্যশাসন করিতেছেন। কিন্তু ইহা আত্মার অবসাদ দশাতেই কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ যখন, মনুষ্যগণ কেবল অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ আর আত্মযোগ অর্থাৎ স্বরূপানুসন্ধান করে না এবং স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। তখন ক্রোধ, লোভ, ও প্রমাদ ভিন্ন মৃত্যুর আর অন্য রূপ কোথায়? যাহারা আত্মযোগে বঞ্চিত তাহারা মোহপ্রযুক্ত ঐ ক্রোধাদিরূপ মৃত্যুর বশীভূত হইয়াই দেহত্যাগ করে। তখন ক্রীড়াকর ইন্দ্রিয় সকলও তাহাদিগের সহগামী হইয়া থাকে। কর্ম্মফলানুরক্ত মানুষেরা কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি সময়ে দেহত্যাগ পূর্ব্বক ভোগসাধন স্বর্গাদিস্থলে গমন করে, সুতরাং মৃত্যুকে আর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। দেহাভিমানী জীব, ব্রহ্ম প্রাপ্তি-সাধন যমনিয়মাদিযোগ প্রাপ্ত না হইয়া কেবল ভোগ-যোগ অর্থাৎ ভোগ লাভের বাসনাতেই সংসার চক্রেই ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরুষের মিথ্যা-বিষয়াসঙ্গে স্বাভাবিকী যে প্রবৃত্তি, তাহাই ইহার ইন্দ্রিয় বর্গের মহামোহজক। সঙ্কল্প কৃত মিথ্যা-বিষয় যোগ দ্বারা অন্তরাত্মা নিয়ত অভিহত হওয়ায় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে অনুস্মরণ পূর্ব্বক কেবল বিষয় সকলেরই উপাসনা করে। বিষয়-চিন্তাই প্রথমে লোক সকলকে নিহত করিয়া ফেলে, পরে কাম ও ক্রোধ ক্রমে ক্রমে তাহার অনুগামী হয়। বিষয়-চিন্তা, কাম ও ক্রোধ এই তিনে সমবেত হইয়া অবোধ মনুষ্যদিগকে মৃত্যু সন্নিধানে লইয়া যায়; এই নিমিত্তই অজ্ঞান মরণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু জিতচিত্ত নিষ্কাম পুরুষেরা অধ্যাত্মযোগাভ্যাসরূপ ধর্ম্মের সাহায্যে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। ধৈর্য্যসম্পন্ন অধ্যাত্মযোগযুক্ত পুরুষ উৎপতিত বাসনাপুঞ্জ দ্বারা প্রতিবোধিত না হইয়া পরমাত্মানুধ্যান করত জ্ঞানবলেই তৎসমুদয় নিহত করেন। যে বিদ্বান্ মানব এইরূপে কাম সমস্ত নিহত করেন, যমের ন্যায় হইয়া অজ্ঞান আর তাঁহাকে ভক্ষণ করে না। পুরুষ কামনানুসারী হইলে কামের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; পরন্তু কামনা সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলে দুঃখরূপ যে কিছু রজোগুণ থাকে, সকলই দূর করিয়া দেয়। কামই প্রাণীবর্গের অজ্ঞান ও দুঃখরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু ইহাতে বিষয়-বিবেক-শূন্য হইয়া তাহারা অজ্ঞানের কার্য্য করত হা হুতাশ করিতে থাকে। কামদ্বারা যাঁহার চিত্ত অভিভূত হয় না, সেই অমূঢ়-বৃত্তি পুরুষের নিকটে মৃত্যু কি করিবে? তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণনির্ম্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হয়। অতএব কামের আয়ু অর্থাৎ হেতুভূত মূল

অজ্ঞান অপনোদন করিতে হইলে কোন প্রকার কামনারই অনুসরণ বা তাহাতে আসক্ত হইবে না। জীবাত্মা পরমাত্মারই ছায়া ও পুত্র। তাহাকে অর্থাৎ আপনার আত্মত্বকে ক্রোধ লোভ সম্বলিত ও মোহবান্ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানই মৃত্যু। এইরূপে মৃত্যুর উৎপত্তি হয় জানিয়া মনুষ্য জ্ঞানে নিষ্ঠা করত মৃত্যু হইতে আর ভয় পায় না। কেননা মৃত্যুর গোচর প্রাপ্ত হইয়া দেহ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের গোচর হইলে মৃত্যু স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়।

"এবং মৃত্যুং জায়মানং বিদিত্বা
জ্ঞানেন তিষ্ঠেন্ন বিভেতি মৃত্যোঃ।
বিনশ্যতে বিষয়ে তস্য মৃত্যুঃ
মৃত্যোর্যথা বিষয়ং প্রাপ্য মর্ত্যঃ।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে কতকগুলি অর্থহীন প্রলাপ বাক্য লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অভ্যুদিত হন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি প্রবৃত্তিসঞ্জাত উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মভার স্কন্ধে লইয়া পিতৃসমাজের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। অথচ তাঁহার ইহাও উদ্দেশ্য নহে যে, কূপমণ্ডুকের স্বল্প কূপোদককেই অপার সমুদ্র জ্ঞানের ন্যায় যাঁহারা আপনার ক্ষুদ্র সমাজ-গণ্ডীর বাহিরে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের আর কোন চিহ্ন দেখিতে পান না, তাঁহাদের সেই সংস্কারকে আরও তমসাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদের রসাতল গমনের গতি প্রশস্ত করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে, বৈদিক ব্রহ্মতত্ত্ব মানবসমাজে ব্যাপ্তি লাভ করুক, ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে সংস্কার-শরীরের যে যে অঙ্গ বাত-ব্যাধিতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্জীবনী-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে সবল ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে ব্রহ্মজ্ঞান-শলাকা দ্বারা উন্মীলিতচক্ষু হও এবং তোমার সংস্কারের ছিদ্র ভেদ করিয়া একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত কর এবং দেখ যে তোমার জাতির বাহিরেও তোমার দেশের বাহিরে বিদেশেও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জাগ্রত, ঈশ্বরের জ্ঞান-জ্যোতি কেমন প্রখর, তাঁহার প্রেম কেমন সুন্দর ও বিশদ। সূর্য্য কিরণ যেমন সকল দেশেই এক, সকলের পক্ষেই সমান, সেই রূপ অনন্ত ঈশ্বরের জ্ঞানপ্রেম অনন্ত বিশ্বে এক, সর্ব্বত্রই সমান। এই জ্ঞান লাভ হইলে এবং পর্য্যটন দ্বারা তাবৎ ভূভাগে ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমা দর্শন করিলে আমাদের ব্যক্তিগত অন্তঃকরণ হইতে অন্যের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ অধোবদন হইয়া পলায়ন করে ও আমরা পবিত্র হইয়া এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে উদারতা ও মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতীয় শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্যামৃতকে লাভ করিতে চাহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে বহু শাস্ত্র-জল্পনা দ্বারা ও অজ্ঞানকৃত বিতর্ক দ্বারা আমরা যে সংস্কারান্ধ হইয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞান রূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাহা ছেদন করিয়া আমরা পাশ মুক্ত হই ও অপার অনন্ত প্রেম জলধিতে ভাসমান হইয়া শাশ্বত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করি। পুনরায় সনৎকুমারের কথাতেই বলি—

ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি
বেদ্যেন বেদং ন বিদুর্ন বেদ্যম্।
যো বেদ বেদং স চ বেদ বেদ্যম্
যো বেদ বেদ্যং ন স বেদ সত্যম্।
যো বেদ বেদান্ স চ বেদ বেদ্যম্
ন তং বিদুর্বেদবিদো ন বেদাঃ।
তথাপি বেদেন বিদন্তি বেদম্
যে ব্রাহ্মণা বেদ বিদো ভবন্তি।

চারি বেদের কোন বেদই বাক্যের অগোচর সম্বিদ্ রূপ পরমাত্মার জ্ঞাতা নহে। কারণ

যাহা যাহা বেদের অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশ তাহা তাহাই জড়, মৃত। মৃতের পরমাত্মা জানা দূরে থাকুক, সে প্রপঞ্চ জানিতেও পারে না। জড় পদার্থের অস্তিত্ব চেতনের অধীন—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'। সুতরাং যিনি তথাবিধ মুখ্যবেদ অর্থাৎ সম্বিদ্রূপ পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সর্ব্ববিৎ হন অর্থাৎ সমস্তই জানেন। যিনি প্রপঞ্চরূপ বিদিত হন, বেদরূপ অবিদিত থাকেন, তিনি সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণ পরমাত্মা বিদিত নহেন। যিনি কেবল ঋক, যজু, সাম এই সকল জানেন তিনি বেদ্য অর্থাৎ অনাত্ম প্রপঞ্চই জানেন। তিনি যে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারা সে সকল জানেন সে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জানেন না। সুতরাং সে প্রকার বেদজ্ঞ অনাত্মবিৎ। কেননা তাহারা বাক্য মনের অতীত পরমাত্মা বিদিত নহেন। কেবল তাঁহারাই অনাত্মবিৎ তাহা নহে, ঋক্ প্রভৃতি বেদও অনাত্মবিৎ, অর্থাৎ ঋগাদি বেদও তাঁহাকে সুব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। ঋগাদি বেদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ তদ্বাচক শব্দের দ্বারা সম্বিদ্রূপ পরমাত্মাকে বুঝাইতে অক্ষম বটে, পরন্তু ঐ সকল বেদ তাঁহাকে কথঞ্চিৎ লক্ষণাদির দ্বারা—ভাবভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করিতে, বুঝাইতে সক্ষম। শঙ্করাচার্য্য সনৎকুমারের বাক্যার্থ এই রূপে বুঝাইয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মও আমাদিগকে এই একই সত্যকে বুঝাইবার জন্য এবং তদ্রূপ আচরণ করিবার জন্য উপনিষদের মহাপ্রাণকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

(তৃতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি)

আর একটা কথা;—হৃদয়ের ভাবগুলা অনুভব-শক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে, এবং উহারা অনুভবশক্তির আপেক্ষিক ও পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিও কতকটা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাব উপভোগের শক্তি সকল লোকের সমান নহে; কাহারও বা স্থূল প্রকৃতি, কাহারও বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি। তোমার কামনাগুলা যদি উগ্র ও প্রচণ্ড হয়, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখের উপর তোমার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুখই সহজে জয়ী হইবে। তোমার প্রকৃতি যদি শান্ত হয়, তাহা হইলে সেরূপ কখনই হইবে না। বায়ুর অবস্থা, স্বাস্থ্য, রুগ্নতা,—আমাদের নৈতিক বোধশক্তিকে হয় নিস্তেজ নয় সতেজ করিয়া তোলে। বিজন বাসে যখন মানুষ আপনাকে লইয়াই থাকে, তখন অনুতাপের বল পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়;—মৃত্যুর সন্নিধানে দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু জনতা, সংসারের কোলাহল, বিষয়াকর্ষণ, অভ্যাস, উহাকে একেবারে নির্ব্বাপিত করিতে না পারিলেও কতকটা নিস্তেজ করিয়া রাখে। সময় বিশেষে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন বিষয়ে উৎসাহ সকলদিন সমান থাকে না। সাহসেরও ক্ষণিক বিরাম আছে। "অমুক দিন সে সাহস দেখাইয়াছিল"—একথা ত সর্ব্বদাই শোনা যায়। আমাদের অন্তরতম হৃদয়ের ভাবও অনেক সময়ে আমাদের মেজাজের উপর নির্ভর করে। আমাদের যে ভাব পরম বিশুদ্ধ, অতীব উচ্চ আদর্শের—তাহাও কতকটা আমাদের দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কবির ভাবস্ফূর্ত্তিতে, প্রেমিকের অনু-

রাগে, ধর্ম্মবীরের জ্বলন্ত উৎসাহতেও মধ্যে মধ্যে অবসাদ উপস্থিত হয়—এই সমস্ত অনেক সময়ে নিতান্ত হেয় ভৌতিক কারণের উপর নির্ভর করে। যখন ভাবের স্রোতে এরূপ জোয়ার ভাটা নিত্য উপস্থিত হয়, তখন এই ভাবকে আদর্শ করিয়া সকল মানুষের জন্য কি একই বিধিব্যবস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে?

সহানুভূতি ও হিতৈষণাও এই ঐন্দ্রিয়িক অনুভবশীলতার হাত এড়াইতে পারে না। অন্যের অনুভব করিবার শক্তি সকলের সমান নহে। যাহারা অতিশয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছে—অন্যের দুঃখ কষ্ট তাহারাই বেশী বুঝিতে পারে; সুতরাং অন্যের দুঃখকষ্টে তাহাদেরই বেশী অনুকম্পা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাদের কল্পনাশক্তি বেশী, তাহারা অন্যের অনুভূত মনোভাব আপনার মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া, অন্যের দুঃখ বেশী অনুভব করিতে পারে। কেহ বা দৈহিক সুখ দুঃখের জন্য, কেহবা মানসিক সুখ দুঃখের জন্য সহানুভূতি করিতে পারে। এই প্রকার সহানুভূতির মধ্যেও আবার অনেক প্রকার-ভেদ আছে। শুধু প্রকার-ভেদ নহে—এমন কি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধও উপস্থিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যথিত হইলে আমাদের অন্তরে যে ধিক্কার উপস্থিত হয়, গুণীর গুণপনার উপরে অত্যধিক সহানুভূতি থাকিলে, সেই ধিক্কারের ভাব অনেকটা কমিয়া আসে। এই জন্যই ভল্‌টেয়ার রুসো ও মিরাবোর দোষ আমরা দেখিয়াও দেখি না, তাঁহাদের শতাব্দির কলুষরাশিকে আমারা ক্ষমার চক্ষে দর্শন করি। কোন দণ্ডার্হ ব্যক্তির মহাপরাধে আমাদের অন্তরে যতটা ঘৃণা উৎপন্ন হওয়া উচিত, তাহার কষ্টে সহানুভূতির উদ্রেক হওয়ায়, সে ঘৃণা কতকটা মন্দীভূত হইয়া আসে। যাহাকে মঙ্গলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ডরূপে খাড়া করা হয়, সেই সহানুভূতির ত এইরূপ চঞ্চল ও টলমান্ অবস্থা। সহানুভূতির ন্যায় হিতৈষণাতেও এইরূপ তারতম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। স্নেহ ও প্রেমের ভাব কাহারও কম, কাহারও বেশী। তাহার পর, সহানুভূতির ন্যায়, হিতৈষণাতেও নানা প্রবৃত্তি মিশ্রিত হইয়া তাহাকে বাধা দেয়। বন্ধুতার স্থলে, আমরা ন্যায়কে অতিক্রম করিয়াও, একটু বেশী দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।

ভাবের খামখেয়ালী উচ্ছ্বাসের প্রতি বেশী কর্ণপাত না করাই কি সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না? বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও পরিশাসিত হইলে, এই হৃদয়ের ভাবই, বুদ্ধির বেশ একটি সহায় হইতে পারে; কিন্তু আপনার হাতে উহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে, উহা অচিরাৎ উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালী আবেগে পরিণত হয়। ইহাতে করিয়া মন, কার্য্য করিবার একটা উত্তেজনা ও শক্তি লাভ করে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ও অব্যবস্থিত হইয়া উঠে; গোড়ায় উদার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, অবশেষে অহংপরতার নিকটবর্ত্তী অথবা একেবারেই অহংপরতায় উপনীত হয়; মঙ্গলের ধ্রুব আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া, অনুভবশীলতার অদৃঢ় ভূমিতে কখনই স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে না; ভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আবেগের আবর্ত্তে আসিয়া পড়ে; উদারতা হইতে অহংপরতায় উপনীত হয়; আজ হয়ত আত্মহারা ঔদার্য্যের শিখরে আরোহণ করিবে; কাল ব্যক্তিত্বের হীনতার মধ্যে নিপতিত হইবে।

এইরূপে ভাবের নীতি, স্বার্থের নীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, অসম্পূর্ণঃ—১ম

উহা মঙ্গলের ধারণাকে এমন একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করায়, যে ভিত্তিটি স্বয়ং এই ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ২য় উহা এমন একটা নিয়মের নির্দ্দেশ করে যাহা অধ্রুব—যাহা বিশ্বজনের পক্ষে অবশ্য-পালনীয় নহে।

মনুর উপদেশ।

কর্ম্ম যোগ।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগদেহ সম্ভবম্
কর্ম্মজা গতয়োনৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥

কায় মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম কৃত হয় সেই সকল কর্ম্ম হইতেই মানুষ উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্ত হয়॥

তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ
দশ লক্ষণ যুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্॥

দেহীর মনকেই মনোবাক্-কায়াশ্রিত উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন প্রকার দশ লক্ষণযুক্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক জানিবে॥

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥

পরদ্রব্যে অভিধ্যান, মনদ্বারা অনিষ্ট চিন্তা, পরলোক নাই—দেহই আত্মা—এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ মানসিক অপকর্ম্ম॥

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙময়ং স্যাৎ চতুর্ব্বিধম্॥

পরুষ বাক্য, মিথ্যা বাক্য, পৈশুন্য অর্থাৎ পরোক্ষে পরের দোষ কথন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ—এই চতুর্ব্বিধ বাচিক অপকর্ম্ম॥

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥

অদত্ত ধনগ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদার সেবা এই ত্রিবিধ শারীরিক অপকর্ম্ম॥

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্
বাচাবাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্॥

দেহী, মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মন দ্বারা, বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্য দ্বারা, এবং শারীরিক কর্ম্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করে॥

বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ড স্তথৈব চ
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যাহার বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত আছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞান-বলে কায়মনোবাক্যকে দমন করিতে পারেন তাঁহাকেই যথার্থ ত্রিদণ্ডী বলা যায়॥

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ
কাম ক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া সর্ব্বভূত সম্বন্ধে মনুষ্য যখন ত্রিদণ্ডের যথাব্যবহার করেন, তখনি তিনি সিদ্ধি লাভ করেন॥

ভূতাত্মা জীবাত্মা, ও পরমাত্মা।

যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে
যঃ করোতি তু কর্ম্মানি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ॥

যিনি এই আত্মার কারয়িতা অর্থাৎ যিনি এই শরীরকে কার্য্য করান তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। এবং যে কর্ম্ম করে, বুধেরা তাহাকে ভূতাত্মা বলেন॥

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখ্যং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥

তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ॥

ভূতাত্মা ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় হইতে ভিন্ন জীব সংজ্ঞক অন্তরাত্মা সর্ব্ব দেহীরই সহজাত; ইনিই জন্মে জন্মে সুখ দুঃখ অনুভব করেন। ঐ মহান্ (অন্তরাত্মা) ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এই উভয়ে পঞ্চভূত-সম্পৃক্ত, অর্থাৎ পঞ্চভূতের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এবং ইহারা উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সর্ব্বজীবে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে॥

অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ॥

উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যে সকল জীব সতত কর্ম্ম করে, তাহারা এই পরমাত্মার দেহ হইতে অসংখ্য মূর্ত্তিরূপে নিষ্পতিত হইয়া থাকে।

জীবের কর্ম্মফল ও বিভিন্ন দেহ ধারণ।

পঞ্চেভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥
তেনানুভূয় তা যামীঃ শরীরেনেহ যাতনাঃ
তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ॥
সোঽনুভূয়াসুখোদর্কান্ দোষান্ বিষয় সঙ্গজান্
ব্যপেত কল্মষোঽভ্যেতি তাবেবোভৌ মহৌযসৌ॥
তৌ ধর্ম্মং পশ্যতস্তস্য পাপঞ্চাতন্দ্রিতৌ সহ
যাভ্যাং প্রাপ্নোতি সম্পৃক্তঃ প্রেত্যেহ চ সুখাসুখম্॥
যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽ ধর্ম্মমল্পশঃ
তৈরেব চাবৃতোভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥
যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামী প্রাপ্নোতি যাতনাঃ।
যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীবো বীতকল্মষঃ
তান্যেবং পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ॥
এতা দৃষ্টাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্ম্ম তোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ॥

দুষ্কৃতকারীর জন্য পঞ্চভূতের অংশ হইতে পরলোকে আর একটি যাতনাময় দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ দেহারম্ভক ভূতের অংশে লীন থাকিয়া দুষ্কৃতিকারী ঐ শরীর দ্বারা যমযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সে বিষয়াসক্তি দোষে যমলোকে দুঃখাদি অনুভব করিয়া ভোগাবসানে নিষ্পাপ হইয়া, ঐ উভয় মহৌজা মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞকে আশ্রয় করে। মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ—উভয়ে আলস্যরহিত হইয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী থাকেন এবং ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা জীব,—ইহলোকে ও পরলোকে সুখ দুঃখ অনুভব করেন। জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্ম ও অল্প অধর্ম্ম করেন তবে সূক্ষ্মভূত দ্বারা শরীরী হইয়া তিনি পরলোকে সুখ ভোগ করিতে থাকেন। আর যদি তাঁহার অধর্ম্ম অধিক ও ধর্ম্মের ভাগ অল্প থাকে তাহা হইলে ঐরূপ ভূতাংশ দ্বারা তাহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে সে যমযাতনা ভোগ করে এরূপ একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। জীব যাতনা ভোগ করিয়া নিষ্পাপ হইলে পর, নিজ কর্ম্মানুসারে আবার ভাগমত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হেতুক জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

বিশ্বের রহস্যময় আবর্ত্ত।

("সায়ান্স্ সিফ্টিং-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত")

সর্ ডেবিড জিল্ বলেন "ধৈর্য্য সহকারে সুদীর্ঘকালব্যাপী শ্রম এবং অঙ্কফলের তন্ন তন্ন গণনা দ্বারা এই মহান ব্যাপার আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, আকাশের অধিকাংশ স্থান যুড়িয়া দীপ্তিমহিমাময় দুই তারকা-স্রোত বহমান, দুই স্রোত বিপরীতমুখী। বিশ্লেষিত রশ্মির দুর্ব্বোধ্য লিপির ব্যাখ্যা দ্বারা এই আশ্চর্য্য সত্য প্রকাশ পাইয়াছে যে, উভয় স্রোতের তারকা-সমূহের গঠন ও বর্দ্ধন প্রণালী একই প্রকার, তাহাদের রাসায়নিক উপাদান সকলও একই প্রকারের।"

এই আবিষ্কার এত আধুনিক যে, ইহার বিশেষ বিবরণ এখনও অসম্পূর্ণ, জ্যোতির্বেত্তারা কেবল বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন; ইহা হইতে আর কি কি প্রসূত হইতে পারে তাঁহারা বলিতে অক্ষম। এই তথ্যটীর মধ্যে বিরাট নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত, কেননা, সমস্ত বিশ্ব যে এক অবিচ্ছেদ্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, ইহা তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে; ইহা জাগতিক যন্ত্রের যে প্রণালী প্রকাশ করিতেছে তাহা স্বপ্নেও কখন দেখা যায় নাই। সর্ ডেবিড জিলের

বর্ণনানুযায়ী একটি চিত্র আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যাউক।

মনে কর একটি বালক ঘাসের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার মস্তকের অনেক উর্দ্ধে অদৃশ্য বায়ুসাগরে কোটী কোটী আকন্দ তুলাখণ্ড ভাসিতেছে, রৌদ্রে ঝিকমিক্ করিতেছে। আকন্দ তুলাখণ্ডগুলি দুই বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া, দুইটী স্বতন্ত্র অথচ অপরিহার্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বায়ুস্রোত কর্ত্তৃক বিপরীত দিকে তাড়িত হইতেছে। বালকের চক্ষের সমক্ষে এই তুলাখণ্ডগুলি যেরূপ, এই নবাবিষ্ক'রে, জ্যোতির্বিদ্‌দের চক্ষের সমক্ষে দৃশ্যমান বিশ্বের তারকা সমুহ সেই-রূপভাবে প্রতিভাত হইতেছে। এই ভাসমান তুলাখণ্ডগুলির বিপরীত গতির কার্য্য কারণ সম্বন্ধে বালক কিছুই চিন্তা করিত না, কেবল সরল মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত, হয়ত বা একটু আশ্চর্য্য হইত।

জ্যোতির্ব্বিদেরাও বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, অধিকন্তু, কারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও পাইতেছেন। তাঁহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। সমস্ত তারকা দুই বিশাল স্রোতে কেন বহমান? সকল তারকাই, আমাদের সূর্য্যও, একই উপাদানে গঠিত। দুই বিশাল তারকা স্রোতের বিপরীত মুখী গতিতে যে পার্থক্য প্রকাশ করে তাহা তারাগণের অন্তর্নিহিত কোন পার্থক্য নহে; যাহা কর্ত্তৃক তারাগণ অনিবার্য্যরূপে সম্মুখদিকে বাহিত হইতেছে, তাহাতেই এ পার্থক্য। কিন্তু, সেই যে অনির্দ্দিষ্ট বস্তু, যাহা কোটী কোটী সূর্য্যকে অদৃশ্য স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—প্রবল স্রোতঃস্বিনী যেরূপে খড় কুটা ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহার এই পার্থক্য উপাদান ঘটিত পার্থক্য নহে, এ কথাও সহেতুক। ইহা আকাশের এক বিশাল আবর্ত্ত, এক অপরিমেয় ঘুর্ণি-পাক ইহার অপ্রতিহত শক্তি।

ইহা কি ঈথর? কিন্তু ঈথর ত অতৌল্য। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা নিরেট পদার্থের মধ্য দিয়াও ঈথর প্রবাহিত হয়, অথচ তাহাতে কোন পদার্থের ভৌতিক সংস্থানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনা। ঈথর যান্ত্রিক প্রণালীতে (mechanical) কার্য্য করে না। তাহা হইলে, ইহা স্রোতের মত করিয়া তারা সকলকে টানিয়া লইয়া যাইবে কি প্রকারে? যদি ঈথর না হইল তবে ইহা কি? ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আপনাদের মধ্যে পরস্পরের যে আকর্ষণ শক্তি সে শক্তি তারকাপালের এইরূপ বেগে তাড়িত হইবার কারণ নহে; কেননা এই বিশাল স্রোত-বেগ ছাড়া তারাগণের স্বতন্ত্র গতি আছে। আমাদের কল্পিত, বায়ুতরঙ্গ তাড়িত, আকন্দতুলা খণ্ডগুলিও এইরূপে নিজস্ব গতিতে চালিত হইতে পারে, অথচ তাহাতে তাহাদের দুই সাধারণ বিপরীতমুখী স্রোতগতির কোন ব্যাঘাৎ ঘটেনা।

এই সত্যটী, সমুদয় তারকা জগতের একত্বের যে একটা অনুভূতি মনে আনিয়া দেয়, তাহাতে মন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। তারাগণের রচনাপ্রণালীর ও উপাদানের অভিন্নতা, আকৃতির মোটা-মুটি একিই ভাব, বর্দ্ধনপ্রণালীর ও গুরুত্বের ভিন্নতা প্রভৃতির বিষয় সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা ছিল তাহাতে কখন মনে এরূপ ভাবের সঞ্চার হয় নাই। অসীম আকাশে সমগ্র তারকা এক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিচালিত হইতেছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে একতার জ্ঞান কি সুন্দর-

রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ক্রমে ইহাও নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে যে, এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতও পরস্পর সাপেক্ষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে না, এ বিপুল বিশ্ব একতানে দোলায়মান হইতেছে। এ বিশ্ব এক বিরাট পরমাণু, এই পরমাণুর উপাদান—প্রত্যেক কণিকা গতির এমন এক নিয়মের অধীন যে সেই নিয়মসূত্রে সমগ্র বিরাট পরমাণুটী স্থায়ী একতানে বাঁধা রহিয়াছে। যে গুলিকে "পলাতক তারকা" নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নিজস্ব গতি এত দ্রুত যে, অনুমান হয় যেন দৃশ্য জগৎ হইতে বহিষ্কৃত হওয়াই তাহাদের নিয়তি। ক্রিয়াশীল রশ্মি বিকীর্ণকারী (radio-active) রেডিয়ম্ ধাতু সদৃশ পদার্থের পরমাণু সকল হইতে যে কণিকাপুঞ্জ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তাহার সহিত এই "পলাতক তারকা" দলের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীসত্যব্রতা দেবী।

নিষ্কাম কর্ম্মই ধর্ম্ম।

সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া মানব যখন আত্ম-বিস্মৃত হয়, তখনই তাহার হৃদয়ে অমানিশার ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়। সে হৃদয়ে সে মুহূর্ত্তে আত্মার জ্যোতি প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া শত দুঃখ শত বিপদ, শত বাধা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে হৃদয় অশান্তির রাজ্য হইয়া উঠে। ইহার কারণ কি? মানব আপনাকে ভুলিয়া যায় কেন? অনেক ধার্ম্মিকেরও যে এই দুর্ব্বলতা দেখা যায়।

যে ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধন করেন তাঁহার এইরূপ দুর্ব্বলতা অতি বিরল। নিষ্কাম ধর্ম্ম অনেকে করেন বটে কিন্তু প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ অনেকেরই নিকটে প্রত্যক্ষীভূত হয় না। এই নিষ্কাম কর্ম্মের অভাবই মানবের আত্ম-বিস্মৃতির কারণ।

নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ কি?—ফল-কামনা রহিত হইয়া কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য। আমরা স্বাধীন হইয়াও ঈশ্বরের নিকট পরাধীন। তাঁহারই আদেশে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে জড়ীভূত, সুতরাং যাহা কিছু করি তাহা তাঁহারই কর্ম্ম; অতএব কর্ম্মের ফল তাঁহাতেই অর্পণ করিতে হইবে। কর্ম্মে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাহাতে তাঁহার অবির্ভাব উপলব্ধি করতঃ কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন কার্য্য বটে, কিন্তু সাধনার বলে কিনা সিদ্ধ হয়। শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হউক, তাহা অতিক্রম করিয়া নিষ্কামী হওয়া চাই। কারণ মানব মাত্রই কর্ম্ম-লিপ্ত। যে গৃহী সে কর্ম্ম লিপ্ত; যিনি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী তিনিও কর্ম্ম লিপ্ত। সুতরাং কর্ম্ম যখন মানবকে কখন ত্যাগ করিতে পারে না, তখন নিষ্কাম হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় কি। সেই নিষ্কাম কর্ম্মই তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব' তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। তবে কি সংসার ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়-কার্য্য নয়? নিশ্চয়ই, সংসার-ধর্ম্ম পালন তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আমরা তাঁহারই সৃষ্ট প্রধান জীব। আমরা যখন আমাদিগের সর্ব্বস্ব তাঁহার বলিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া দিতে পারি, তখনই আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। কিন্তু যখন আমরা তাহা না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হই তখনই আমাদের পতন হয় ও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হই। হৃদয় দেবতাকে চিরকাল হৃদয়ে রাখিতে হইবে। তাঁহার দান—আমাদের প্রাণ-মন সকলি তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে। তবেই তাঁহার সেই অমৃত-চরণে অক্ষয় মুক্তি লাভ হইবে। শত বিপদের মধ্যে যাঁহার আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাই, যাঁহার অভয়-হস্ত দেখিতে পাই, সেই অন্তরতর অন্তরতম জগৎ-পিতার শরণ গ্রহণ কর। তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও ভয়ত্রাতা। সংসারের সকল ক্ষেত্রে, সকল সুখ দুঃখ, বিপদ-সম্পদে তাঁহার চরণ ধরিয়া থাক। তিনি ভয়-বিপদের মধ্য দিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবেন। পুণ্যপথে তাঁহার দিকে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতি তাঁহার শত পদ-ক্ষেপ হৃদয়ে অনুভব কর। সেই শুভ-মুহূর্ত্তে কি সুখসূর্য্য তখন উদিত হইবে, যখন সংসারে থাকিয়াও আমরা সংসার ভুলিয়া যাইব। মৃত্যুতেও তখন কি আনন্দ। মৃত্যুর দ্বার দিয়াই তাঁহাকে সম্যক প্রাপ্ত হই। হে জগৎ পিতা! আমাদের হৃদয়ে বল দাও। তোমার প্রতি আমাদিগকে আকর্ষণ কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া আমাদের সকলি তোমাকে অর্পণ

করিতে পারি এবং তোমার আদেশ অনুসারে তোমারি ইঙ্গিতে এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধন করিতে পারি।

শ্রীপৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী।

নানা কথা।

শশকের চক্ষুদ্বারা অন্ধকে চক্ষুদান।—একটি যুবক তাহার নয় বৎসর বয়সের সময় অন্ধ হইয়া যায়। এক শশকের চক্ষুতারকার আবরণ লইয়া যুবকের চক্ষুতারকায় যোড়কলম (Grafting) করিয়া দেওয়াতে সে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে; এই সংবাদে সকলের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই লোকটী অন্ধ অবস্থায় পনের বৎসর কাটাইয়াছে। এক প্রকার সাদা পদার্থ জন্মিয়া তাহার চক্ষুতারকাবরণের স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া যায়। ডাক্তার লেসার বলেন, তিন-মাস পরে এই যোড়কলম ঠিক জায়গায় লাগিয়া গেল, রোগী বার ইঞ্চি দূর হইতে আঙ্গুল গনিতে সক্ষম হইল। যুবকটী ক্রমে ক্রমে রং চিনিতে শিখিতেছে, বিনা সাহায্যে একাকী স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছে। অস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রে, শশকের চক্ষুতারকাবরণ তুলিয়া রোপণ করিয়া দেওয়া অতি পুরাতন পদ্ধতি, কিন্তু ইহা তাদৃশ প্রচলিত নহে, এবং এরূপ ফলদায়ক হইতেও প্রায় কখন দেখা যায় নাই।

বহুমূত্র রোগে টক দুধ ব্যবস্থা—সর লোডর ব্রান্টন্ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, দুগ্ধাম্ল বীজাণু (Lactic acid germ) দ্বারা বহুমূত্র রোগকে পরাস্ত করা যাইতে পারে,' অর্থাৎ যেরূপ টক দুধ চিকিৎসার কথা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। তিনি বলেন টক দুধের মধ্যে ঘোলই উত্তম, ইহাতে তৃষ্ণা নিবারণ ও শরীর পোষণ করে; এবং ইহাতে একপ্রকার ওজন পদার্থ আছে, যাহা শরীর কর্ত্তৃক শোধিত হইলে, শরীরের অভ্যন্তরে চিনিকে দুগ্ধাম্লে (Lactic acid) পরিণত করিতে পারে। সর লোডর আরও বলেন যে, মাকম তোলা দুধের দ্বারা সময়ে সময়ে যে উপকার পাইতে দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, মাকমতোলা দুধেতেও ঘোলের গুণ কিছু কিছু আছে। কিন্তু ঘোলই অধিক ফলদায়ক। নিম্নোক্ত প্রণালীতে ঘোল সেবন এই ডাক্তারের ব্যবস্থা:—একটা বড় পাত্র ভরিয়া ঘোল রাখিবে, দিন কয়েক সেবনের পর যতটা ঘোল কমিয়া যাইবে ততটা টাট্‌কা ঘোল দ্বারা সেই পাত্র আবার পূর্ণ করিয়া দিবে। ঘোলের পাত্র ধুইবে না, বাসি টক ঘোলেতে টাট্‌কা ঘোল মিশিলে টাট্‌কা ঘোলে অম্লের সঞ্চার শীঘ্রই হয়।

ম্যালেরিয়ার নবীনতম চিকিৎসা।—বিদেশী নিদান শাস্ত্র সভাতে Société de pathologie Exotique) ম০ কুটো বলিয়াছেন যে, একপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বরে মিথিলীন নীল (Methylene blue) দ্বারা শিরাভ্যন্তরে পিচ্‌কারি দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। যে সমস্ত ম্যালেরিয়া রোগী কুইনিনেতে কিছুমাত্র ফল পায় নাই তাহারা এই নূতন ঔষধে সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়াছে; ইউরোট্রোপাইন বা সালোলের (Urotropine or salol) সহিত মিশ্রিত করিয়া ৫০ সান্টিগ্রাম (Centigrammes) দেওয়া দৈনিক ব্যবস্থা। ম০ কুটোর বিবেচনায়, অচৈতন্য বা তড়ক সংযুক্ত বিষম ম্যালেরিয়াতে, দিনের মধ্যে বারবার মিথিলীন নীলের পিচকারী শিরাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

সর্পবিষ নিবারক নূতন রস।—বার্লিন নগরের জলচিকিৎসা প্রতিষ্ঠার সহকারী ডাক্তার ক্রাউস্ সাহেব সর্পদংশন বিষ নিবারণের এক নূতন রস আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহা সকল প্রকার সর্পের বিষ-নাশে সমান কার্য্যকারী। এই নূতন ঔষধের কার্য্যকারিতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা শীঘ্রই সর্পবহুল দেশসমূহে প্রেরিত হইবে।

পাকস্থলীর ফোটো তোলা:—মিউনিক নগরের একজন চিকিৎসক একটি অভিনব যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্বারা পাকস্থলীর অভ্যন্তর দেশের সুস্পষ্ট ফোটো তোলা যাইতে পারে। রোগীর ক্যামেরাটাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে হয়,পরে ক্যামেরা গম্যস্থানে পৌছিলে ক্যামেরা সংলগ্ন ছোট ইলেক্ট্রিক্ ল্যাম্প দ্বারা পাকস্থলীর অভ্যন্তর দেশ আলোকিত করা হয়। ২০ ইঞ্চি লম্বা সিকি ইঞ্চি চওড়া ফোটোগ্রাফের ঝিল্লী (film) ক্যামেরার তলদেশে গুটান থাকে। চিকিৎসক সুতাগাছা ধরিয়া টানিলে ঐ ঝিল্লী লেন্সের (lens) উপর প্রসারিত হইয়া পড়ে ও ইলেক্ট্রিক্ ল্যাম্প জ্বালান হইলে তৎক্ষণাৎ ঝিল্লীপটে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। আবশ্যকীয় সংখ্যক ছবি যতক্ষণ তোলা না হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ এই প্রণালীতে কার্য্য চলিতে থাকে।

নূতন ধরণের আতস বাজি।—ইহা কেবলমাত্র নয়ন-রঞ্জক পদার্থ নহে, ইহা স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস উচ্চারণে সক্ষম; এই বিবরটি, প্রবন্ধপাঠ দ্বারা, ফরাসী বিজ্ঞান সভায় (French academy of Sciences) বিশেষরূপে জ্ঞাপন করা হয়। এই নূতন প্রণালীর

আবিষ্কারকেরা তিনবৎসর যাবৎ এই চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, এখন তাঁহারা বলিতেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন স্ফোরক (explosive) পদার্থ-দ্বারা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন-বর্ণ উচ্চারণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা একটা "রেলরোড" টোটা প্রস্তুত করিয়াছেন সেটা বলিয়া ওঠে "থাম"! আর একটা ১৪ই জুলাই দিনের জন্য, প্রস্তুত করিয়াছেন; সেটা চেঁচাইতে থাকে "সাধারণ তন্ত্র চিরজীবী হোক্" (Vive la Republique)

শ্রীসত্যব্রতা দেবী।

(Science Siftings)

মহর্ষি।

মহর্ষি দেবের সহিত আমার প্রথম সম্বন্ধের কথা মনে হইলে সর্ব্বপ্রথমে, অথর্ব্ব বেদের 'যস্মিষ্ঠিতি চরতি যশ্চ বক্ষতি' শ্লোকটির কথা মনে পড়ে। আদি-ব্রহ্মসমাজের বেদী হইতে বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মুখে ইহা ব্যাখ্যাত হইতে শুনিয়াছিলাম। সেই দেব বাণী ধীরে ধীরে তাঁহার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়া আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রবাহিত করিয়া দিল। তৎকালে আমার চক্ষু দিয়া অবিরাম প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছিল। ফলতঃ আমি কোথায় আছি তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একরস আনন্দে আমি বিভোর। ব্যাখ্যান অবসানে, প্রাচীন গায়ক বিষ্ণুবাবুর গান শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরে আমি আমাদের হুগলির ভবনে প্রত্যাগমন করিলাম। ট্রেন চলিয়াছে কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান চলিতেছে। রাত্রে আহার করিতেছি, ঐ ব্যাখ্যান আমার হৃদয়ে জাগিতেছে; মনে আনন্দ আর ধরে না। এই অবস্থায় রাত্রি অবসান হইল। আমি প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরম পিতার মহিমা গানে প্রবৃত্ত হইলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, দেখি মহর্ষি-দেবের সৌম্যমূর্ত্তি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান। আমি তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তানপুরা যোগে মহেশের নামগান করিলাম। পরে ছয়টার সময় গঙ্গাতীরে প্রাতঃকালীন বায়ু সেবনে বাহির হইলাম। বেলা সাতটার সময় প্রত্যাগমন কালে দেখি একখানি বজরা-হুগলী এমাম-বাড়ীর নিকট উপস্থিত। একজন পলিত-কেশ বৃদ্ধ উহার ছাদের উপর চৌকিতে উপবিষ্ট। পরে বুঝিলাম, আমি পূর্ব্ব রাত্রে যাঁহার বক্তৃতা আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রবণ করিয়া ছিলাম, তিনিই আজ আমার সম্মুখে। অবিলম্বে বাটী ফিরিয়া গিয়া আমার হারমোনিয়ম ও কয়েক খানি গানের কাগজ লইয়া একখানি নৌকাযোগে তাঁহার বজরায় উঠিলাম এবং ছাতের উপর গিয়া প্রণামান্তে মুক্ত-কণ্ঠে পূর্ব্ব-রাত্রের প্রদত্ত উপদেশ যতদূর স্মরণ ছিল উৎসাহের সহিত তাঁহাকে শ্রবণ করাইলাম। তিনি দূরদেশে গঙ্গা-বক্ষে ঐ ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়া গেলেন, এবং আসন ত্যাগ করিয়া আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া মস্তকে হাত-বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক" আরও বলিলেন আমার বিশ্বাস ছিল, আদি-ব্রাহ্ম সমাজে আজকাল শ্রদ্ধাবান লোক আসে না, যে সব লোক আসে, তাহারা ভাসা ভাসা। কিন্তু এই দূরদেশে অমৃতের বার্ত্তা শুনিয়া আমার সে বিশ্বাস অপসারিত হইল। আমি দেখিতেছি শ্রদ্ধাবান প্রেমিক ভক্ত লোকও আসিয়া থাকেন। তদুত্তরে আমি বলিলাম আমি বহুদিন হইতে আদি-সমাজের নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিয়া আসিতেছি, তথায় অনেক ভক্ত লোক দেখিতে পাই যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনায় যোগ দিয়া ও সঙ্গীত শুনিয়া মনে অপার আনন্দ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। আরও বলিলাম এক সময় আমি সমাজ-মন্দিরে কয়েকটি কাশী বাসী পণ্ডিত দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদিগকে আদরের সহিত আসনে উপবেশন করিতে বলায়, তাঁহারা প্রথমেই বলিলেন, "ও মাহাত্মা ধন্য হায়, যেনে এই ধর্ম্ম-সভা রচনা কিয়া, এই রাজধানীকা বিচমে, বিষয়কা প্রবল স্রোত বহতা হায়, শান্তিকা ও আরামকা স্থান একো না নজর পড়া।" তাঁহারা উপাসনা ও সঙ্গীত শেষে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাচীন গায়ক বিষ্ণুবাবুর সহিত—'গাওরে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্মসনাতন পাতক-নাশন' এই সঙ্গীতে যোগ দিয়া ধন্য হইলেন। ক্রমে আমি কয়েকটি সঙ্গীত হারমোনিয়ম যোগে তাঁহাকে শুনাইলাম। ক্রমে বজরা ত্রিবেণীর ঘাটে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি ভাবে বিভোর। অনেকক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় আসিয়াছি? আমি বলিলাম, ঐ ত্রিবেণীর ঘাট দেখা যাইতেছে। তিনি বজরা ফিরাইতে আদেশ দিলেন। তখন বেলা দশটা। তাঁহার ভৃত্য একখানি রূপার প্লেটে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন মহর্ষির হস্তে আনিয়া দিল। তিনি তাহার অৰ্দ্ধাংশ অন্য একটি রেকাব আনাইয়া আনন্দের সহিত আমাকে দিলেন। আমি তাঁহার নিজহস্ত প্রদত্ত দেব-প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলাম।

সে আজ বত্রিশ বৎসরের কথা। তাঁহার সহিত এই প্রথম সম্মিলন এখনও আমার অন্তরে সজীব ভাবে জাগিতেছে। এই প্রেমের সম্বন্ধ আমার প্রতি তিনি চিরজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই আমার যে কিছু কর্ত্তব্য পরায়ণতা সৎকার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহ, ধ্রুব সত্যে নির্ভর, তাঁহার মহিমাগানে প্রবৃত্তি। এ সকলই তাঁহার আশীর্ব্বাদ।

পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ
পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ।

মহর্ষি দেবের বরণীয় মূর্ত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে আমাদের দেশের অমর কবির এই শ্লোকটি মনে উদিত হয়।

শ্মশান-ঘাটে ঠাকুরমার অন্তিমকালে বৈরাগ্যের

উদ্যোগ-পর্ব্ব মহর্ষি যে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শান্তি-পর্ব্বে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহা হইতে এই অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছি, যে মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হইতে চায়, সে ধর্ম্মের বিমল আনন্দ লইয়া থাকুক। বিবেক বৈরাগ্য ও সদ্ভাব পূর্ণ কত সংগীত ও বক্তৃতা তাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে সহজে বহির্গত হইয়া কত শত নিরাশ অন্তরে কত যে অপার শান্তি প্রবাহিত করিয়াছে, কে তাহার পরিমান করিবে।

শ্রীলালবিহারী বড়াল।

১লা ডিসেম্বর তারিখের—The Indian Daily news পত্রে প্রকাশ গরগাঁও জেলার অন্তর্গত রেওয়ারি নামক স্থানের জনৈক উকীল অপুত্রক অবস্থায় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পত্নী জীবিত। উকীল বাবু তাঁহার অর্জ্জিত প্রায় ষাট হাজার টাকা দয়ানন্দ এংগ্লো ভেদিক কালেজে (anglo-vedic college) অর্পণ করিয়াছেন। যতদিন তাঁহার বিধবা পত্নী জীবিতা থাকিবেন, ততদিন তিনি পোনের হাজার টাকার সুদ পাইবেন এই মাত্র। এরূপ দান নিতান্ত বিস্ময়কর বলিতে হইবে। উকীল বাবুর নাম সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। হায় আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে কবে এরূপ লোকের অভ্যুদয় হইবে।

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ।—বিগত ৩০এ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ৫৫তম সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে উপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ শিরোমণি ও চিন্তামনি চট্টোপাধ্যায় পারায়ণের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সন্ধ্যার পরে সমাজমন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইলে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, ও সম্পাদক কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সঙ্গীত শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রে শ্রোতার সংখ্যা ৪।৫ শত হইবে।

কুশদহ।—গোবরডাঙ্গা অঞ্চল হইতে "কুশদহ' নামক একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাবু যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু উহার সম্পাদক। আমরা যোগীন্দ্র বাবুকে পূর্ব্ব হইতে চিনি। তিনি কর্ম্মনিষ্ঠ ও সাধক। প্রাগুক্ত সংখ্যার প্রকাশিত প্রস্তাব গুলি মন্দ হয় নাই।

জগজ্জ্যোতিঃ।—কলিকাতা বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে মহাস্থবির কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে ঐ নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের নিকট অনেকগুলি বৌদ্ধ বাস করেন। বঙ্গভাষায় এইখানি বৌদ্ধদিগের মুখপত্র। ইহাতে জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। আমরা এই পত্রের উন্নতি কামনা করি।

উপদেশ—পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ২রা নবেম্বর "সেবাশ্রমে' যে উপদেশ দেন তাহা তত্ত্বকৌমুদীর ১৬ই অগ্রাহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। "ত্যাগই আমাদের ধর্ম্ম, ত্যাগই আমাদের সমাজ, ত্যাগই আমাদের একতা; এবং আমাদের আদর ও আশ্রয়।" শাস্ত্রীজির একথাটি আমাদের বড়ই সুমিষ্ট লাগিল।

সহ সং।

বিজ্ঞাপন।

উনঅশীতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আন্দুল আর্য্য-ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১২ই পৌষ রবিবার ২৬শ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় বিশেষ উপাসনা ও বক্তৃতা হইবে। ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহীরালাল মল্লিক।
সম্পাদক।

সপ্তদশ-কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯।

৭৮৬ সংখ্যা ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

বিশ্বাসের আলোকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলে এই শান্তিনিকেতনের তপস্যাশ্রম, বিদ্যামন্দির, ছাত্রনিবাস, ইহার নয়নরঞ্জন বাহ্য-দৃশ্য-শোভা, উৎসব সংক্রান্ত সুগম্ভীর উপাসনা উপদেশ, সুশ্রাব্য গীত বাদ্য, তৎসঙ্গে লোকসমারোহ, আনন্দমেলা, যাত্রাভিনয় আতসবাজী এবং পান ভোজন, সজ্জন সম্মিলন প্রভৃতি ব্যাপার, সর্ব্বোপরি এখানকার সুবিমল সমীরণ, প্রমুক্ত প্রান্তর, সুনীল অনন্ত আকাশ, ব্রহ্মাণ্ডপতি পরম দেবতার এক অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, জনসমাগম এবং আনন্দ কোলাহল অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার বাহ্য ঐশ্বর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার শান্ত গম্ভীর আবির্ভাব এবং জীবন্ত প্রভাব এখানে চির বর্ত্তমান। কিন্তু কিসের জন্য এ সমস্ত বিপুল আয়োজন, এই লোক সংগ্রহ? এক অখণ্ড অদ্বিতীয় চিন্ময় পরব্রহ্মের দিকে কি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নহে?

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মপরিচয় এবং ব্রহ্মসাধনে অনুরাগ উদ্দীপন জন্যই এই আশ্রমের ও উৎসবের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত শত সহস্র দর্শক ও যাত্রী দলের মধ্যে যদি একটী মনুষ্যও মহর্ষিদেবের উপরিউক্ত শুভ অভিপ্রায়টী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অমর যোগজীবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তিনি নিশ্চয়ই দেবগণের পার্শ্বে বসিবার উপযুক্ত হইবেন। সারদর্শী সাধক এ স্থানের যাবতীয় দৃশ্যমান অনিত্য ঘটনা পুঞ্জের এবং নয়নমনোহর বাহ্য ব্যাপারের অন্তরালে সেই সর্ব্বগত নিত্য নির্ব্বিকার—পরম সুন্দর পুরুষ ও তাঁহার প্রেরিত মহর্ষির আধ্যাত্মিক দেবজীবনের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন সন্দেহ নাই।

হে শান্তিনিকেতনের যাত্রী! যখন আসিয়াছ, কিছু নিত্য সম্বল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাও। স্থান মাহাত্ম্যটা বুঝিয়া দেখ। সত্য সত্যই কি তোমরা শূন্য প্রাণে গৃহে

ফিরিয়া যাইবে ? মহর্ষির ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত বুঝিবার চেষ্টা করিবে না ? তিনি বলিতেছেন, "বৎস এস, আমার সঙ্গে সপ্তপর্ণবৃক্ষমূলে আসিয়া ঐ যোগাসনে উপবিষ্ট হও এবং মুদ্রিত নয়নে শান্ত চিত্তে বল, "ওঁ শান্তম্‌শিবমদ্বৈতম্‌"। তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সুদূরপ্রসারিত মহা প্রান্তর, উহার এক প্রান্ত হইতে প্রাতে রক্তিমরাগরঞ্জিত নব রবি আকাশে উঠিয়া অপর প্রান্তে অস্ত যায়। ঊর্দ্ধ নেত্রে অনন্তে নীলাম্বরের প্রতি চাহিয়া দেখ, কি নয়নস্নিগ্ধকর অখণ্ড প্রগাঢ় নীলিমা। যেন স্থির ধীর নিস্তরঙ্গ বিশাল জলধি। এখানকার প্রশান্ত ভাব সুকোমল বক্ষ জননীর ন্যায় স্নেহালিঙ্গন পাশে চাপিয়া ধরিবার জন্য চারিধার হইতে যেন তোমা পানে নামিয়া আসিতেছে। কি আরাম, কি শান্তি! মৃদু মারুত হিল্লোলের সুখস্পর্শে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল, হৃদয় শীতল হইল। এই প্রমুক্ত প্রান্তরের প্রমুক্ত বায়ু এই প্রমুক্ত আকাশ, ইহারা অনন্তের প্রেরিত দূত; সাধককে অনন্তের বার্ত্তা আনিয়া দিতেছে। এমন পবিত্র সহবাসে বসিয়া কেবলই বল, ওঁ। ওঁকার নাদে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া একাগ্র চিত্তে তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হও।

বাহিরের নানাবিধ সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া গীত বাদ্য শুনিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলে, চক্ষু কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিলে। আর এই আকাশ, এই অন্তরীক্ষ, এই প্রান্তর, ইহারা কি কিছুই নহে? যদি কিছুই নয়, তবে ইহাদের দর্শনে স্পর্শনে কেন প্রাণ উদাস হয়, হৃদয় অনন্তের পানে ছুটিয়া যাইতে চায়? যোগীরা কিরূপে ধ্যান ধারণা করেন? উত্তরে কথিত হইয়াছে,

> "ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃ পূর্ণং যদাত্মকম্‌,
> সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধি স্তস্য লক্ষণম্‌।"

ঈদৃশ সমাধি সাধনের প্রধান অবলম্বন এই চতুঃপার্শ্বস্থ মহা আকাশ।

এই প্রমুক্ত আকাশ, প্রমুক্ত প্রান্তর দেখিতে মনে হয় যেন কেবলই শূন্য, কিন্তু ইহাই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের ছায়া।

এই প্রমুক্ত আকাশতলে বসিলে, আমরা কত যে ক্ষুদ্র তাহা বেশ বুঝিতে পারি। হায়, এই অনন্তের সর্ব্বগ্রাসী মহাসত্তার অতলস্পর্শ গভীর অভ্যন্তরে আত্মহারা হইবার জন্য যোগারা কত লালায়িত!

বিচিত্র গুণের আধার, অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত সুন্দর, মহৈশ্বর্য্যশালী লীলাময় ব্রহ্মে আমরা আত্মহারা হইতে চাহিনা, তাঁহার প্রেমমাধুর্য্যরসে তলাইয়া যাইতে ভয় পাই, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক পদার্থে, রূপ রস শব্দ গন্ধে আপনাকে অনায়াসে হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহাদের মোহে মজিয়া রহিয়াছি। বহির্জ্জগতের দৃশ্যমান ঘটনাতরঙ্গের মধ্যেও সেই পরম পুরুষের নিত্য নব নব বিকাশ এবং আবির্ভাব, কিন্তু অন্তর্ভেদী বিজ্ঞানদৃষ্টির অভাবে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। হায়, কবে আমরা বিশ্বাসনয়নে অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইব!

আমাদের ধ্যেয় উপাস্য পরমাত্মা নির্গুণ, অব্যবহার্য্য একটি সংজ্ঞা মাত্র নহেন, তিনি শরণাগত বৎসল। গভীর ধ্যানযোগে তাঁহার সত্তাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলারও তুল্য শান্তি আর কিছুতে নাই। সে ক্রোড়ে প্রবেশ করিতে পারিলে কিসের ভয়, কিসের ভাবনা। এই খানেই সকল কামনার পরিসমাপ্তি, এইখানেই জীবনের সকল প্রশ্নের মীমাংসা, সাধকের পরমপুরুষার্থসিদ্ধি। অতএব নিরাকার সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রাপ্তির পক্ষে এখানকার এই অনন্তের

আভাস আমাদের প্রধান উপকরণ, চিদাকাশ স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার ইহাই সিংহদ্বার।

হে অনন্তদেব সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, তোমার নিকট আর কি চাহিব? চাহিবার অগ্রেইত সকলই তুমি দিয়াছ। তুমি স্বয়ং আপনাকে দিয়া জীবের সকল কামনা পূর্ণ করিয়াছ। আকাশ যেমন সর্ব্বগত ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত, তেমনি তুমি আকাশের আকাশ, সূক্ষ্ম আকাশ, মহাকাশ, চিদাকাশ, আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। শিশু মায়ের কোলে থাকিয়াও যেমন বার বার আদর করিয়া প্রেমভরে মা মা বলিয়া ডাকে, কোন অভাব না থাকিলেও মা বলিয়া ডাকিতে ভাল বাসে, তেমনি তোমার স্নেহকোলে বসিয়া আমরাতোমাকে ডাকিতেছি। তুমি বাহিরের ভৌতিক আবরণে আর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিও না, অব্যবধানে দেখা দিয়া, স্নেহালিঙ্গনে বাঁধিয়া আমাদিগকে তোমার করিয়া লও।

উপনিষদে আত্মজ্ঞান।

বৈদিক সময়ের ঋষিরা ঈশ্বরকে কেবল বাহ্য বিষয়ে দেখিতেন, উপনিষদের সময়ে তাঁহারা তাঁহাকে আত্মাতে অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আত্মজ্ঞান হইতে পরমাত্মজ্ঞান অর্জ্জন করিলেন। পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মাতে দেখ, ইহা উপনিষদের উপদেশ। উপনিষদ বলিতেছেন—

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং—

যে সকল ধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপর ব্যক্তির তাহা কদাপি হয় না।

আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগস্থাপন, ইহাই উপনিষদের মূলতত্ব এবং নানা উপদেশ ও আখ্যায়িকা সূত্রে তদ্বিষয়ক শিক্ষাদান উহার চরম উদ্দেশ্য, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে আত্মজ্ঞান বিষয়ক একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বিরোচন আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত হইবার পর প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেন তোমরা এখানে আসিয়া বাস করিতেছ? তাঁহারা বলিলেন

য আত্মা২ পহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোকো হবিজিঘৎসো ২পিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ

যে আত্মা পাপশূন্য অজর অমর অশোক ও ক্ষুৎপিপাসা বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক, আমরা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি—সেই আত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রজাপতি একেবারে সমস্তটা খুলিয়া বলিতে চাহেন না, এজন্য দ্ব্যর্থ ভাবাপন্ন দু-একটা কথা বলিয়া উপদেশ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে বলিলেন—

ঐ যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষের আকৃতি দেখিতেছ—ওই যে অক্ষিপুরুষ ওই সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন জলে যাহার প্রতিবিম্ব পড়ে, দর্পণে যে মূর্ত্তি দর্শন করা যায়, সে কে?

প্রজাপতি উত্তর করিলেন এই সেই আত্মা বটে। জলপূর্ণ পাত্রে একবার

তোমাদের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন কর—দেখিয়া যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে বলিও।

তাঁহারা জলের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন—তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দেখিতেছ?

তাঁহারা বলিলেন, আমরা উভয়ের সমস্ত দেহের অবিকল প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি—নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব দেখা যাইতেছে।

প্রজাপতি কহিলেন,

তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া, পুনর্ব্বার দেখ কি দেখা যায়?

তাঁহারা সেইরূপ করিয়া বলিলেন আমরা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই যেমন তেমনি দেখিতে পাইতেছি।

প্রজাপতি বলিলেন "ওই যা দেখিতেছ—ওই সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।"

বিরোচন ঐ কথাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অসুরদের নিকট ফিরিয়া গেলেন, আর জড়াতিরিক্ত চৈতন্য নাই, এই ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া দিলেন—ইহাতেই তাহাদের অধোগতি হইল। যাহারা এই মতের অনুগামী তাহারা দেহকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া বিষয় সুখে মত্ত থাকে। যাহারা এখানে দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্ম করে না—ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা এই আসুরিক ব্যবহারের জন্য অসুর নামে খ্যাত। অসুরেরা ক্ষণবিধ্বংসী শরীরকে আত্মা ভাবিয়া মৃত দেহকে গন্ধমাল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া আপনাদিগকে ভুবনবিজয়ী জ্ঞান করিয়া থাকে।

প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্তি—এতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে

কিন্তু ইন্দ্র এ উপদেশে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ভাবিলেন—"জলের মধ্যে দেহের যে পরিষ্কার সুন্দর ছবি পড়িয়াছে সে যদি আত্মা হয় তবে অন্ধ হইলেও আত্মা অন্ধ দেখিতে হইবে—খঞ্জ হইলেও আত্মা ঐ রূপ হইবে এবং দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিনষ্ট হইবে। অতএব এ উপদেশ কোন কার্য্যেরই নহে।" তিনি সমিৎ হস্তে পুনর্ব্বার প্রজাপতির দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপনার সংশয় জানাইলেন।

প্রজাপতি বলিলেন যা বলিতেছ ঠিক্ কথা—আর ৩২ বৎসর আমার নিকট বাস কর তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এইরূপে আরো ৩২ বৎসর অতীত হইলে প্রজাপতি বলিলেন—

স্বপ্নে যিনি সুখে বিচরণ করেন তিনি আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না। তিনি ভাবিলেন "সত্য বটে এ অবস্থায় আত্মা দেহের ব্যথায় ব্যথিত হয় না তবুও স্বপ্নেতে ভয় হয় কে যেন আমাকে তাড়না করিতেছে—কে আমাকে পীড়ন করিতেছে, সে সময়ে কষ্টে অভিভূত হইয়া স্বপ্নাত্মা ক্রন্দন করিতে থাকে। অথচ প্রজাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে আত্মা অভয়—অজর অমর অশোক—তাহা কি প্রকার?

এই সকল ভাবিয়া ইন্দ্র প্রকৃত আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া গেলেন। প্রজাপতি পুনরায় তাহাকে আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবার উপদেশ দিলেন। সেই কাল অতীত হইলে ইন্দ্রকে বলিলেন—

সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্য কখন কোন স্বপ্ন দেখে না—সম্পূর্ণ শান্তির অবস্থায় থাকে—সেই আনন্দময় অবস্থা যার সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

ইহাতেও ইন্দ্রের সংশয় মিটিল না। তিনি ভাবিলেন—এ অবস্থায় আত্মা আপনাকে আপনি জানে না। আর বাহিরের কোন বস্তুকেও জানিতে পারে না। এ বিনাশের অবস্থা। অথচ প্রজাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে আত্মা অমৃত—ইহার বিনাশ নাই। অতএব এ উপদেশও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

সমিৎহস্তে পুনর্ব্বার তিনি প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া গেলেন। গিয়া গুরুর আদেশ মত আবার ৫ বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যে শতাধিক বৎসর অতিবাহিত হইল। তৎপরে প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া রীতিমত আত্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলেন। হে মঘবন্, এই দেহ নশ্বর, মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরী, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত, এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন আলোক চক্ষের তারকে প্রবেশ করে তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। যিনি আঘ্রাণ করেন তিনি আত্মা, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়; যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন তিনি আত্মা, মন দিব্য চক্ষু স্বরূপ; আত্মাই এই নানারূপ দিব্য চক্ষে কাম্য বিষয় সকল দর্শন করত রমন করেন। আত্মা যত দিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহ পাশে বদ্ধ হইয়া সুখ দুঃখে বিচলিত হন কিন্তু যখন তিনি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না

আত্মো বৈ সশরীরঃ প্রিয়া প্রিয়াভ্যাং নবৈ সশরীরস্য
সতঃ প্রিয়া প্রিয়য়ো রপ হতিরস্তি
অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া প্রিয়ে স্পৃশতঃ

যেমন অশরীরী বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতি পরমাত্মাকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন—তখন তিনি উত্তম পুরুষ—তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন দিব্যজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া—দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পরম শান্তি —পরমারোগ্য উপভোগ করেন।"

প্রজাপতির এই উপদেশ, সমস্ত উপনিষদেরও এই সারমর্ম্ম। বৈদিক ঋষিরা একেকে বহুরূপে প্রকৃতি ক্ষেত্রে প্রকাশিত দেখিয়া পূজা করিতেন

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজো
ময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ

এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ—তাঁহার আবির্ভাব তাঁহারা ভূলোকে দ্যুলোকে আকাশে অন্তরীক্ষে সূর্য্য চন্দ্র বায়ু মেঘ বিদ্যুতে প্রত্যক্ষ করিতেন। উপনিষদের আচার্য্যেরা বহু হইতে একে পৌঁছিয়া সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ

যে তেজোময় অমৃতময় অন্তর্য্যামী পুরুষ আত্মায় অবস্থিতি করিতেছেন

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়,

তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। যখন সাধক জানিতে পারেন যে "যিনি অসীম আকাশের অধিদেবতা সর্ব্বজগতের মূলাধার বৃহৎ হইতেও বৃহৎ পূর্ণব্রহ্ম,

তিনি আমার আত্মার অধিদেবতা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা।”—তখন তাঁহাতে আত্মসমাধান করেন—তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

সমোদতে মোদনীয়ং হিলব্ধ্বা

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি

তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ-হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

তৃতীয় উপদেশের

অনুবৃত্তি।

পূর্ব্বোক্ত নীতিবাদের ন্যায় আমরা আর একটি নীতিবাদের উল্লেখ করিব যাহা মিথ্যা নহে কিন্তু অসম্পূর্ণ। প্রয়োজনবাদ ও সুখবাদের পক্ষপাতিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে একটু ব্যাপক করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে সুখই মঙ্গল,—সুখ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; তাঁহারা বলেন, আত্ম সুখবাদীরা ব্যক্তিগত সুখকে সুখ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন; আসলে সাধারণের সুখকেই সুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

একথা আমরা স্বীকার করি যে, এই নূতন সিদ্ধান্তটি, ব্যক্তিগত স্বার্থবাদের বিরোধী; কেন না ঐ নীতিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া কোন ব্যক্তি শুধু যে একটা ক্ষণিকভাবের ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে তাহা নহে, পরন্তু অবস্থা বিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

তথাপি, এই সিদ্ধান্তটি, প্রকৃত নীতি হইতে—সমগ্র নীতি হইতে দূরে অবস্থিত।

সাধারণ-স্বার্থবাদ, নিঃস্বার্থপরতায় লইয়া যায়;—অবশ্য ইহা অনেকটা ভাল; কিন্তু নিঃস্বার্থপরতা মঙ্গলের একটা উপাধি-মাত্র (Condition),স্বয়ং মঙ্গল নহে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেও কোন একটা ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ করা যাইতে পারে। কোন এক কার্য্যে, কার্য্যকারী ব্যক্তির কোন লাভ নাই বলিয়াই যে সেই কার্য্য অন্যায় হইবে না, একথা বলা যায় না। সর্ব্বাগ্রে সাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোন কাজ করিলে, যাহাকে বলে অহংপরতা—সেই অহংপরতা-পাপে কোন ব্যক্তি লিপ্ত না হইলেও অন্যান্য বহুবিধ পাপে লিপ্ত হইতে পারে। ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে, সাধারণের স্বার্থ সকল সময়েই ন্যায়-ধর্ম্মের অনুমোদিত; আসলে সাধারণের স্বার্থ ও ন্যায়ধর্ম্ম—এই দুইটি জিনিস এক নহে। যদিও অনেক সময়ে এই দুইটি এক সঙ্গে যায়, তবু কখন-কখন উহারা পৃথক্‌ভাবেও কাজ করে। অ্যাথেন্‌সের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য, থেমিস্‌টক্লিস্‌ অ্যাথেন্‌স্‌-বন্দরের মৈত্রীবদ্ধ প্রদেশ-সমূহের নৌ-বহর অগ্নিসাৎ করিবার প্রস্তাব করেন;—কিন্তু অ্যারিস্‌টাইডিস্‌ বলেন, প্রস্তাবটি সুবিধাজনক বটে, কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ; এই কথায়, অ্যাথেনীয়েরা এই অন্যায় সুবিধাটি পরিত্যাগ করিল। তবেই দেখ, এ বিষয়ে থেমিস্‌টক্লিসের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না; দেশের স্বার্থের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। যদি তিনি বলপূর্ব্বক এই সমস্ত কাজ এথেনীয়দিগের দ্বারা করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন এবং

সেই জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে, যে কাজ আসলে অন্যায় তাহার জন্য অতীব শ্লাঘ্য আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখান হইত।

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, এই দৃষ্টান্তে যদি স্বার্থ ও ন্যায়ধর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী হইয়া থাকে, তাহার কারণ, এই-স্থলে স্বার্থ যথেষ্টরূপে সাধারণের স্বার্থ হয় নাই বলিয়া; এইরূপ স্থলে,—"পরিবারের জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন করিবে, নগরের জন্য পরিবারকে বিসর্জ্জন করিবে, দেশের জন্য নগরকে বিসর্জ্জন করিবে, বিশ্বমানবের জন্য দেশকে বিসর্জ্জন করিবে—এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

তুমি যদি অতদূর পর্যন্তও যাও, তবু দেখিবে ন্যায়ধর্ম্মের ধারণায় তুমি উপনীত হইতে পার নাই। বিশ্বমানবের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ, ন্যায়ধর্ম্মের সহিত যে মিল হইতে পারে না, এরূপ নহে; কারণ ইহা নিশ্চিত যে উহাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া, ঐ দুই জিনিস এক নহে; তাই, এরূপ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, বিশ্বমানবের স্বার্থ ন্যায়ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত। যদি শুধু একটা দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হয় যে, স্থল-বিশেষে জনসাধারণের স্বার্থের সহিত প্রকৃত মঙ্গলের ঐক্য হয় নাই, তাহা হইলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সাধারণের স্বার্থ ও প্রকৃত মঙ্গল এক জিনিস নহে।

তুমি উপদেশ দিতেছ যে, সাধারণ স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিবে। কিন্তু কাহার দোহাই দিয়া তুমি এইরূপ উপদেশ দেও? শুধু কি স্বার্থের দোহাই দিয়া? যদি স্বার্থ বলিয়াই স্বার্থের কথা শুনিতে আমি বাধ্য হই, তবে আমার নিজ স্বার্থের কথা আমি কেন না শুনিব? অন্যের স্বার্থের জন্য আমার নিজের স্বার্থকে কেন বিসর্জ্জন করিব তাহার ত কোন সুসঙ্গত হেতু দেখিতে পাই না।

তুমি বলিতেছ, সুখই মানব-জবিনের পরম লক্ষ্য। ইহা হইতে ন্যায্যরূপে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আমার সুখই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য।

যদি তুমি আমাকে আমার সুখ বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দেও, তাহা হইলে সুখ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া তোমার এই উপদেশ দিতে হইবে।

অধিকাংশলোকের স্বার্থই পরম স্বার্থ,— এই প্রসিদ্ধ মূলসূত্র অনুসারে চলিলে, কি বিপদেই পড়িতে হয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। প্রথমত ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আমার প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করাই কঠিন; তার পর দেখ, ন্যায়ধর্ম্মের অভ্রান্ত আদেশের স্থানে, ব্যক্তিগত স্বার্থের অনিশ্চিত গণনাকে দাঁড় করাইয়া তুমি এই কঠিনতার কিছুমাত্র লাঘব করিলে না। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যদি আমার নিজের স্বার্থ নির্ণয় করিতে হয়—শুধু নিজের স্বার্থ নয়, আমার পরিবারের স্বার্থ,—শুধু পরিবারের স্বার্থ নয়, দেশের স্বার্থ, শুধু দেশের স্বার্থ নয়—বিশ্বমানবের স্বার্থ আমাকে নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কি! আমার দূরদৃষ্টিকে সমস্ত জগতের উপর প্রসারিত করিতে হইবে? এইরূপ কঠিন পথে আমাকে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইবে? তাহা হইলে এমন একটা জ্ঞান তুমি আমার উপর আরোপ করিতেছ যাহা শুধু ঈশ্বরেতেই সম্ভবে। প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয়ের উদ্দেশে ঠিক্ পথে আপনাকে

পরিচালন করিতে হইলে, দর্শনের ইতিহাস কিংবা কূট নীতি-বিদ্যাও যথেষ্ট নহে। মনে রাখিও, মানব-জীবনের কোন গণিত-সিদ্ধ বিজ্ঞান নাই। তোমার গণনা যতই গভীর হউক না, তোমার ভাগ্য যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হউক না, দৈব-ঘটনা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আসিয়া, তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে,—তোমার দুঃখ যতই নৈরাশ্যজনক হউক না তাহা হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে, সুখ ও দুঃখকে একত্র মিশাইয়া ফেলিবে—তোমার দূর-দৃষ্টির সমস্ত সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

এইরূপ চঞ্চল ভিত্তির উপর তুমি ধর্ম্মনীতিকে স্থাপন করিতে চাহ? দেখ, এই প্রহেলিকাবৎ সাধারণ-স্বার্থকে সমর্থন করিবার জন্য আমরা কতই কুতর্ক অবলম্বন করিয়া থাকি! আমার কোন বন্ধুর দৈন্য-দশা উপস্থিত হইলে, আমি সহজেই সাধারণ স্বার্থঘটিত এমন একটা দূর-সম্পর্কের হেতু বাহির করিতে পারি যাহার দোহাই দিয়া আমি আমার বন্ধুর সাহায্যে হয়-ত বিরত হইব। এই ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আমার নিকটে অর্থ যাচ্ঞা করিতেছে; কিন্তু ঐ অর্থ যদি আমি বিশ্বমানবের কাজে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমার ঐ অর্থব্যয় কি আরও সার্থক হইবে না? কল্য ঐ অর্থ কি আমার দেশের জন্য আবশ্যক হইবে না? অতএব উহা আপাতত ব্যয় না করাই ভাল। তাছাড়া এই স্থলে সাধারণের স্বার্থ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইলেও ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে;—এইরূপ নানা প্রকার মিথ্যা জল্পনা আসিয়া আমার মনকে অধিকার করিবে। কোন ভাল কাজ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে যদি ইহাই দেখিতে হয়, উহা অধিকতম লোকের পরম স্বার্থ কি না, তাহাহইলে এরূপ কাজ দুঃসাহসী ও উন্মাদ-গ্রস্ত লোক ভিন্ন আর কেহ করিতে সাহস পাইবে না। স্বীকার করি, সাধারণ-স্বার্থের ধারণা হইতে উদার আত্মোৎসর্গ প্রসূত হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক মহাপরাধও প্রশ্রয় পাইতে পারে। ঐ সাধারণ-স্বার্থের দোহাই দিয়া, সর্ব্বপ্রকার উন্মত্ত ব্যক্তিরা—ধর্ম্মোন্মত্ত, স্বাধীনতা-উন্মত্ত, দর্শনশাস্ত্র-উন্মত্ত ব্যক্তিরা—বিশ্বমানবের পরম স্বার্থের উদ্দেশে, অনেক জঘন্য কাজ কি করে নাই? অবশ্য অনেক সময়, সেই সকল কাজের সহিত উচ্চতর নিঃস্বার্থভাবও মিশ্রিত ছিল।

এই নীতিবাদের আর একটি ভুল—ইহা স্বয়ং মঙ্গল এবং মঙ্গলের একটি প্রয়োগ-বিশেষ—এই উভয়কে এক করিয়া ফেলে। যদি অধিকতম লোকের পরম স্বার্থই মঙ্গল হয়, তাহা হইলে, ইহার পরিণাম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে;—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শুধু একটা সার্ব্বজনিক ও সামাজিক ধর্ম্মনীতিই আছে, নৈজিক কিংবা ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতির কোন অস্তিত্ব নাই; শুধু এক শ্রেণীরই কর্ত্তব্য আছে,—অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য; নিজেরপ্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, আমরা ঠিক্ সেই সকল কর্ত্তব্যকে ছাঁটিয়া ফেলিতেছি যাহার বিদ্যমানে অন্য সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন করা সম্ভব হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সেই ব্যক্তির সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ যাহাকে আমরা "আমি" বলি। এক হিসাবে আমিই আমার সমাজ;সেই সমাজে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যস্ত। প্লেটো একটা কথা বেশ বলিয়াছেন:—আমি আমার অন্তরে একটা সমগ্র নগরকে বহন করিতেছি,—ভাব, ধারণা, বাসনা, প্রবৃত্তি,আবেগ চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা উহা অধ্যুসিত; এই সকলের জন্য বিধিব্যবস্থা স্থাপন করা নিতান্তই আবশ্যক।

কিন্তু এই নীতিবাদ অনুসারে এই নিতান্ত-আবশ্যক আত্মশাসন ব্যবস্থাকেই রহিত করা হইতেছে; অর্থাৎ নৈতিক ধর্ম্মনীতিকে—আত্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন করা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

হৃদয়গ্রন্থি ভগ্ন করিবার তিনটি উপায়।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্।

ইহলোকে, এই জীবিত অবস্থাতেই যিনি হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন করিতে পারেন, তিনি অমর হয়েন। হৃদয়গ্রন্থি কাহাকে বলে? "গ্রন্থিবদ্দৃঢ় বন্ধন রূপাঃ অজ্ঞান প্রত্যয়াঃ"। যেমন দরিদ্রের মলিন ছিন্ন বস্ত্রে শত গ্রন্থি থাকে, সেইরূপ মানব হৃদয়ে যে অজ্ঞান-প্রত্যয় সকল দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাকেই হৃদয়গ্রন্থি বলে। অজ্ঞান-প্রত্যয়ের মধ্যে বিশেষরূপে তিনটী প্রধান। প্রথম, ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বে মূঢ় থাকিয়া মৃৎপাষাণাদি পদার্থে তাঁহার স্বরূপ কল্পনা। দ্বিতীয় তাঁহার অনন্ত মঙ্গল ভাবের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভরহীনতা। তৃতীয় কামনার বিষয় সকলের আপাত মধুময় ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রেয় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেয়পথে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মৃত্যুপাশে পতিত হওয়া। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার ও নির্ব্বিকার, ইহা আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে সপ্তাহে সপ্তাহে বা দিনে দিনে শ্রবণ করিতেছি কিন্তু তাহাতে আমাদের ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞান হইতেছে না কেন? কেবল শ্রবণে জ্ঞান হয় না। যাহা শ্রবণ করিব তাহা সাধন না করিলে জ্ঞান হয় না। সাধনে জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মের —প্রত্যেক ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে. তবে সিদ্ধি লাভ হইবে। এ তো সহজ পথ নহে, ব্রহ্ম ত চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত পদার্থ নহেন যে, তাঁহাকে আমরা সহজে প্রাপ্ত হইব। অথচ যাঁহাকে সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জানিয়া বা না জানিয়া মানব অন্তঃকরণ হইতে একটি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস সতত উত্থিত হইতেছে। কিন্তু তিনি মানব অন্তঃকরণে তৎপ্রাপ্তির জন্য যে পিপাসা দিয়াছেন, সে পিপাসা শান্তির নিমিত্ত সাধনরূপ মহাব্রত দিয়া এবং ধীশক্তিরূপ মহাঅস্ত্র দিয়া তৎপ্রাপ্তির উপায় বিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন—

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।

তিনি দুর্জ্ঞেয়, বিষয়মোহে হতচেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না। তিনি দর্শন শাস্ত্রই পড়ুন আর তর্কশাস্ত্রই পড়ুন, তাহার মনের সংশয়চ্ছেদ কখনই হয় না, তাঁহার জ্ঞান কদাপি তৃপ্ত হয় না। সত্যের সত্য তাঁহার নিকটে ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। কাষ্ঠেতে যেমন গূঢ়রূপে অগ্নি আছে, সেইরূপ তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন; বিশুদ্ধ সত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নির্ম্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধ দারুনিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, তিনি আমাদের আত্মাতে সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশেতেও ওতপ্রোত

হইয়া আছেন, তিনি পর্ব্বতের গুহা গহ্বরে, তিনি হিমবৎ কৈলাস শিখরে, তিনি বিস্তীর্ণ দাবানলে, তিনি ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গে, তিনি নির্জ্জন, দুর্গম, সঙ্কটস্থানে স্থিতি করেন এবং নিত্য হয়েন তিনি আমাদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমাদের পুরাতন পিতামহ। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অজ্ঞান-প্রত্যয় দূর করিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া প্রথম গ্রন্থি ছিন্ন করিবেন। পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম যোগ কহে। অধ্যাত্ম যোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্য-সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়, তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি উপহার দিয়া আনন্দ সাগরে লীন হয়। যতই তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যতই তাঁহার জ্ঞানের সহিত আমার জ্ঞানের যোগ হয়, যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়, ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই সেই দুর্দর্শ গূঢ় পুরুষ সুদর্শ হইয়া আমাদের সহজ প্রত্যক্ষের বিষয় হন এবং এই প্রকার যোগেতেই আমরা তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই প্রথম গ্রন্থি অজ্ঞান প্রত্যয় নষ্ট হয়, আমাদের সম্মুখে স্বর্গদ্বার অপাবৃত হয়।

দ্বিতীয়, ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি অবিশ্বাস ও তাঁহাতে নির্ভর হীনতা। যখন অধ্যাত্মযোগে তাঁহাকে দর্শন করিলে, তখন অবশ্যই দেখিলে যে তিনি যাহা, তাহাই তিনি। অর্থাৎ তিনি মঙ্গলময়, অনন্ত ও পূর্ণ। অধ্যাত্মযোগে সেই মঙ্গল অনন্ত ও পূর্ণকেই প্রাপ্ত হইলে। আমাদের জীবনের সমুদয় জিজ্ঞাসা, সমুদয় আকাঙ্ক্ষা এবং সমুদয় উদ্দেশ্য সেই একই মঙ্গলের জন্য। এক অধ্যাত্মযোগেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, জিজ্ঞাসা পরিসমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষালাভ করিয়া ব্রহ্মসাধন করিয়া আর কি মানুষ অতৃপ্ত বাসনা লইয়া চন্দ্র সূর্য্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, অগ্নি বায়ুতে তাঁহাকে খুজিয়া বেড়াইবে, তীর্থে তাঁহাকে খুজিয়া বেড়াইবে, "লেড়কা বগলমে ধুঁধুঁড়তা সহরমে" ছেলে তোমার কোলে অথচ ছেলেকে খুজিয়া বেড়াব যেমন, তোমার অন্তরে তোমার মঙ্গলময় বিধাতা দীপ্যমান, আর তুমি তীর্থে তীর্থে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ ইহাও সেইরূপ। ঋষি বলিয়াছেন যে, 'নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতেহি ধ্রুবং তৎ'। অধ্রুব পদার্থে সেই ধ্রুব পদার্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যিনি ধ্রুব পদার্থ, তাঁহাতে নির্ভর স্থাপন করিলে আর মৃত্যু-ভয় থাকে না। রোগে তিনিই ঔষধ, শোকে তিনিই সান্ত্বনা, দারিদ্রে তিনিই তৃপ্তি এবং মৃত্যুতে তিনিই অমৃত-আশ্রয়। এই অমৃত-আশ্রয়কে সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে ধরিলে চলিবে না। যেমন করিয়া লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করে, ততোধিক, যেমন করিয়া গন্ধ পুষ্পকে আশ্রয় করে, যেমন করিয়া দাহিকাশক্তি অগ্নিকে আশ্রয় করে, যেমন করিয়া শীতলতা তুষারকে আশ্রয় করে, সেই প্রকার তুমি তোমার সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মাকে আশ্রয় কর, তোমার সকল সংশয় তিরোহিত হইবে, সকল নির্ভর তাঁহাতে যাইয়া তাঁহা হইতে অমৃত ফল লাভ হইবে। একটি গূঢ় রহস্যের কথা আছে। এই যে বহিরাকাশ অনন্তে বিস্তৃত হইয়া বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে ইহাই আমাদের

অধ্যাত্মজ্ঞানের সম্মুখে বিস্তৃত এক মহা প্রহেলিকা। অধ্যাত্মজ্ঞানের আবরণ হইতেছে এই কঠিন প্রহেলিকা। এই প্রহেলিকা ভেদ করিতে হইলে সৎগুরুর সমীপস্থ হইয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন যে

"সৎগুরু পাওবেঁ ভেদ বাতাবেঁ জ্ঞান করে উপদেশ,
কয়লাকো ময়লা ছুটে যব আগ কর পরবেশ"

অর্থাৎ সৎগুরুর নিকটে যাইবে, তিনি জ্ঞান রহস্য শিক্ষা দিবেন এবং অন্তর্বাহ্যের ভেদ বুঝাইয়া দিবেন। যখন জ্ঞানাগ্নি অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তথাকার অজ্ঞান সন্দেহাদি দূর হইয়া নির্ম্মল জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মও প্রকাশ্য ভাবে এই একই উপদেশ দিতেছেন যে, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ সবিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্'। অর্থাৎ—পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

এখন তৃতীয় গ্রন্থি, কামনার বিষয় সকলের আপাত মধুময় ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রেয় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেয় পথে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মৃত্যুপাশে পতিত হওয়া। উপনিষদে আছে যে, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" স্বয়ম্ভু পরমাত্মা লোক লীলা সম্পন্ন করিবার জন্য ইন্দ্রিয় দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য সকলেই বহির্বিষয়ই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে কেহ দেখে না। স্বাধীন-বুদ্ধি মানব, ধীশক্তি সম্পন্ন মানব বহির্বিষয়ই দর্শন করে, প্রেয় পদার্থেই মোহিত হয়, ইহা কি মানবের পক্ষে লজ্জার বিষয় নয়? তুমি যেমন বহির্বিষয়ের অনুকূল ইন্দ্রিয় পাইয়াছ, তেমনি তুমি অন্তরাত্মাতে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের জন্য স্বাধীনতা পাইয়াছ, ধীশক্তি পাইয়াছ। ইন্দ্রিয়গণকে বাহিরে প্রয়োগ করিবে, ধীকে অন্তরে আত্মাতে প্রয়োগ করিবে না? ধীশক্তি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গল নিয়মের অধীন থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সুপথে পরিচালন করিবে। এই ধর্ম্ম নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে একমাত্র প্রেয়েরই বশবর্ত্তী হইয়া শ্রেয় পথকে লঙ্ঘন করে, তাহার দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। সে তৃতীয় গ্রন্থির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, আমাদের হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় উভয়েরই ঘোরতর সংগ্রাম! আমরা দুইয়েরই সন্ধিস্থলে বাস করিতেছি। একদিকে প্রেয় আমাদের পদদ্বয় বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন করিতে চাহে, আর অন্য দিকে মাতৃস্নেহ পূর্ণ শ্রেয় আমাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতে চাহেন। অন্তর-হলাহল মধুরভাষী প্রেয় আসিয়া বলে 'শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্' তুমি শতায়ুবিশিষ্ট পুত্র পৌত্র গ্রহণ কর, হস্তি হিরণ্য অশ্ব রথ তোমার জন্য সকলই প্রস্তুত। তুমি আমার পথবর্ত্তী হও; সুগন্ধ গন্ধবহ তোমার শরীর শীতল করিবে, তোমার প্রাসাদে নৃত্যগীত হাস্য পরিহাস অহরহ উল্লাস বহন করিবে, ইন্দ্রিয় সুখদ গন্ধামোদ সকল তোমার চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে, মর্ত্ত্যলোকের দুর্ল্লভ অপ্সরাগণ তোমাকে পরিচারণা করিবে, যত লোক তোমার পদানত হইবে তুমি সকলের প্রভু হইবে,

তুমি মহদায়তন রাজ্যের রাজা হইবে, তোমার যশঃ কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই ঘোষিত হইবে; যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তবে তুমি সকলের প্রভু হইবে। কিন্তু শ্রেয়ঃ-কামী মনুষ্য প্রেয়ের এই কথার প্রত্যুত্তর দেন যে, 'সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তি তেজঃ' তুমি যে প্রকার প্রলোভনে আমাকে ফেলিতে চাহ, ইহাতে অল্প কালের মধ্যে আমার সকল ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে। অন্তক আমার পার্শ্বে লুকায়িত আছে, রন্ধ্র পাইলেই আমার ধন প্রাণ সকলই হরণ করিয়া লইবে; অতএব তোমার নৃত্যগীত অশ্ব রথ তোমারই থাকুক। তুমি যাহা কিছু দিতে পার, তাহাতে আমার তৃপ্তি কখনই হইবে না। "ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ" আমি কোন সাংসারিক প্রলোভনে ভুলিবার নহি। অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে আমার চিত্ত নির্ভর করিতে পারে না।

বিবেক বিজ্ঞান যুক্ত মানবের এইরূপ বাক্যে যখন প্রেয় নিস্তব্ধ হয় তখন শ্রেয় আসিয়া তাহাকে বলে, তুমি কেন শোকে নিমগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তি হীন হইয়া অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ; যাঁর প্রীতি সুধাতে জগৎ সংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেম-রূপ মঙ্গল মূর্ত্তি দর্শন কর এবং দুঃখ-সন্তপ্ত অশ্রু ধারাকে প্রেমাশ্রু ধারাতে পরিণত কর। যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদায় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় হয় না; যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না; তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর, মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আমাকে অবলম্বন কর, আমি তোমাকে সেই প্রেমময়ের অমৃত ক্রোড়ে লইয়া সমর্পণ করিব। বাস্তবিক শ্রেয় যে আশ্বাসবাণী প্রদান করেন তাহা সত্য, আর প্রেয়ের লোভণীয় আশ্বাস বাক্য মরীচিকাবৎ অসার। যিনি শ্রেয়ের পথানুসরণ করিয়া তাহার উপদেশ বাক্য জীবনের আদর্শ করেন, তিনি হৃদয়ের তৃতীয় গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারেন। হৃদয় গ্রন্থি সমূহ ভগ্ন করিবার প্রথম উপায় ব্রহ্ম দর্শন, দ্বিতীয় উপায়, তাঁহার মঙ্গলময় ভাবে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকল অবস্থাতে তাঁহারই মঙ্গল স্বরূপে নিমজ্জিত হইয়া থাকা, আর তৃতীয় উপায় হইতেছে বিবেকের সাহায্যে শ্রেয় পথে বিচরণ করিয়া সংসারে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করা।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভি র্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।

PRAYERS.*

(I)

O, Lord most high, we have come to Thee not with the pride of strength but with a humble and lowly heart, that Thou mayst uplift and elevate us. We approach Thee not as saints but as sinners, that Thou mayst deliver us from evil, and save us from ignorance and frailty. We come to Thee not bedecked with prosperity but as poor afflicted souls, that our days of misery may be brought to an end. We come to Thee as creatures tainted with impurity, that Thou mayst wash away our iniquities and fill our hearts with a holy and righteous spirit. Groping our way in the dark, we seek after Thee that Thou mayst lead us to Thy ineffable light. Entangled in the snares of death we call unto Thee, that Thou mayst conduct

* From ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান
By Maharshi Devendranath Tagore.

us to Thy mansion of immortality. All that pertains to us is utter misery; Thou art our only good and only bliss. Depending on Thee we eagerly await the kingdom of Truth, the Light and Life everlasting. Our faith in thy goodness is firm and unwavering. Lead me, O Lord, from out the false to the true. Lead me from darkness unto light, from death unto Immortality. O Thou that art self-effulgent, do Thou reveal Thyself unto me. O Thou dread Lord, may Thy benign face protect me for ever and ever, —Santih—Santih.

(II)

O Lord God of Truth, since Thou inspirest me with the hope that Thou wilt abide with me for ever and ever, surely Thou wilt fulfil it. Thou hast never failed them that put their trust in Thee. How long, oh how long shall I wait for the day when I shall enjoy the supreme happiness of seeing Thee face to face, and shall be privileged to live with Thee for ever more. O Lord my God, I have wholly surrendered myself to Thee, do Thou take me to Thyself. It is not for earthly gain, or rank or fame that I have come to Thee. I have not sought Thy throne that Thou mayst show me the way to win the applause and esteem of my fellow men; I have sought Thy protection that Thou mayst renovate my soul with Thy strength and purge it of the taint of sin. O Saviour of the fallen! to live for ever in Thy blessed company is my sole desire. Fulfil, O Lord, this my heart's desire. Grant that I may have the power strictly to adhere to Thy straight path, by overcoming all the dangers and difficulties and temptations of this world, that I may repose in Thy perfect love and do Thy will with all my heart. This is my only prayer O Lord! Amen.

(III)

O Lord my God, may we always conserve Thy beauty in our heart. Thou art the Light that lighteth the sun, the moon and the starry heavens. The whole universe is radiant with Thy light. Thou art the light of our eyes and Thou art the light of our soul. Thou art the light of light—supremely Beautiful. If it be Thy will, O Lord, that we should be saved from the sin and sufferings of this world, then take us instantly by the hand and conduct us to Thy holy Presence. The storm and stress of this life are past all endurance. Abide with us as our Protector. If I am banished from Thy presence, the sun moon and stars lose their lustre in my eyes. O Lord of my heart, make me Thy constant companion and servitor.

"I ask Thee not for wealth or fame. Grant me only this privilege that I may remain Thy servant and attendant for ever and ever."*

নানা কথা।

তক্ষশীলা। বৌদ্ধযুগে তক্ষশীলা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই তক্ষশীলা বা টাক্‌শিলার স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে নানা অনুমান স্থান লাভ করিয়াছে। সার আলেকজাণ্ডর কনিংহাম Sir Alexander Cunningham ৮½ ইঞ্চ পরিমাণ তাম্রশাসন রাউলপিণ্ডী জেলার সাডেরাই Shah Dheri নামকস্থানে একটি স্তূপের ভিতরে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ স্থান N. W. Railwayর সরাই কালা Sarai kala নামক ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ সাডেরাইকে যে অপর দুইটি ফলক পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে তক্ষশীলার নাম লেখা আছে। কনিংহাম সাহেবের তাম্রশাসনে লেখা আছে, "সম্বৎসর মিতি ১০ ত্তেন সভায়কেন থুবা প্রতিষ্ঠাপিতো মাতাপিতু পূয়ারি অথর

---

*ধনমান চাহিনা তোমা হতে, দেও এই অধিকার
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি—
ব্রহ্মসঙ্গীত।

কা পুরারি"। অর্থ, ১০ অব্দে সতারক কর্ত্তৃক এই স্তূপ তাঁহার পিতামাতার সম্মানার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার পাঠান্তর করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে অক্ষর ঐ তাম্রফলকে অঙ্কিত, বর্ত্তমানে তাহার আদৌ প্রচলন নাই। পাঠনির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে ঐ সাড়েরি ও তক্ষশীলা একই স্থান। Journal and the proceedings of the Asiatic society of Bengal. July. 1908.

মাধ্যামিক দর্শন—তিব্বতীয় ভাষায় ভারতের দর্শন গ্রন্থাদি বহুল পরিমাণে অনুবাদিত হইয়াছিল। মাধ্যামিক দর্শনের সংস্কৃতমূল ২৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ভারতে এক খানি ব্যতীত প্রায় সমস্তই বিনষ্ট, কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ রহিয়াছে। মহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন ঐ সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, আর্য্য নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, বুদ্ধ পালিতের রচনা। আচার্য্য তথা, যোগ-সাংখ্য-বৈশিষক বেদান্ত মীমাংসা সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় স্থান পাইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৯০৭ সালে সিকিমে অবস্থান কালে Labrang লাব্রাং নামক মঠে ঐ সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐ গ্রন্থের নাম Yangyur। যে যে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ উহাতে স্থান পাইয়াছে তাহার নাম ১। প্রজ্ঞানাম মূলমধ্যমিককারিকা, ২। যুক্তিষষ্ঠিক কারিকা ৩। বেদল্য সূত্রনাম ৪। শূন্যতা সপ্ততি কারিকা, ৫। বিগ্রহব্যবর্ত্তনী কারিকা, ৬। মূলমধ্যমকবৃত্তি অকুতোভয়। ৭। বৈদল্যং নাম প্রকরণম্। ৮। শূন্যতা সপ্ততি বৃত্তি। ৯। বিগ্রহ ব্যবর্ত্তনী বৃত্তি। ১০। মহায়ন বিংশতিকা। ১১। অক্ষর শতক ১২। অক্ষরশতকনামবৃত্তি। ১৩। প্রতীত্য সমুৎপাদহৃদয়কারিকা। ১৪। প্রতীত্য সমুৎপাদ হৃদয় ব্যাখ্যান। ১৫। অবুধ বোধক নাম প্রকরণম্। ১৬। রত্ন সুকোষ নাম। ১৭। ভবসংক্রান্তি ১৮। ভবসংক্রান্তি টীকা ১৯। বুদ্ধ পালিত মূলমধ্যম বৃত্তি, ২০। স্বভাবত্রয়প্রবেশ সিদ্ধি ২১। হস্তবলনাম প্রকরণ। ২২। হস্তবলনাম প্রকরণ বৃত্তি। ২৩। মধ্যমহৃদয় কারিকা। ২৪ মধ্যমক হৃদয় বৃত্তি তর্কজ্বল। ২৫। মধ্য-প্রতীত্যসমুৎপাদ নাম। ২৬। মধ্যমার্থ সংগ্রহ। ২৭। মাধ্যমিকাবতারস্য টীকা নাম। The same paper.

অহল্যাবাই।—অহল্যাবাই ১৭৩৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোলকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুলহার রাও এর পুত্র খ্যাণ্ডি রাও এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। অহল্যা ৩০ বৎসর বয়সে বিধবা হন। তিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া রাজ্যশাসন করেন। এই ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুললনা বিবিধ সৎগুণের জন্য ভুবন বিখ্যাত। কথিত আছে, বারাণসীর বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর-মন্দির, এবং গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির তাঁহারই অগাধ অর্থে বিনির্ম্মিত। তিনি প্রত্যহ সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্নদান করিতেন। গ্রীষ্মের প্রখর রবিতাপ তপ্ত পথিকের পিপাসা দূর করিবার জন্য প্রশস্ত রাজপথের মধ্যে মধ্যে তিনি জলদানের ব্যবস্থা করেন। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপের সময় বস্ত্রদানের তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। The Calcutta university magazine august & september.

উত্তর মেরু।—বিগত শতাব্দীতে উত্তর মেরু আবিষ্কারের নিস্ফল চেষ্টায় দুই শত জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। প্রায় আড়াই কোটী পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে এবং চারিশত লোক প্রাণ দিয়াছে। প্রবুদ্ধ ভারত। সেপ্‌টেম্বর, ১৯০৮।

পালক।—বিলাতীয় মহিলাগণ তাঁহাদের টুপিতে বহুলপরিমাণে পাখীর পালক ব্যবহার করেন। The christian life এর ২৪ এ অক্টোবর তারিখের জনৈক লেখক বলেন অন্ততঃ একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় মহিলাগণের ভিতরে এ কুপ্রথা তিরোহিত হওয়া উচিত। এই পালক সংগ্রহের জন্য কত পক্ষীর জীবন অকালে ও নৃশংসরূপে বিনষ্ট হয়।

জাপান।—জাপান দেশে তদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। বিগত দুই বৎসরে নবদীক্ষিতের সংখ্যা বার হাজারের অধিক হইয়াছে। 10 th October. the christian life.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১৫।৴৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৬২।৯
সমষ্টি	...	৩০৭৭৵৩
ব্যয়	...	২৭২॥৵৯
স্থিত	...	২৮০৫৸৴৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
২০৫৶৩
২৮০৫৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২০৩৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিংএজেন্ট মহাশয়ের নিকট হইতে
প্রাপ্ত
২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	২৲
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী	১৲
	২০৩৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৮৸৶০
পুস্তকালয়	...	২৮॥ ৩
যন্ত্রালয়	...	৬৫৲
সমষ্টি	....	৩১৫।৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫৮॥৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৭।৵৩
পুস্তকালয়	...	৪॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৭৯৸৵০
সমষ্টি	...	২৭২॥৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, শ্রাবণ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৯৬২॥০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮০৫৶৩
সমষ্টি	...	৩৭৬৭॥৶৩
ব্যয়	...	৪৪৮৸৶৩
স্থিত	...	৩৩১৮॥৶৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৭১৮॥৶৩
৩৩১৮॥৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২০০৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেন্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে
প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২৶০
পুস্তকালয়	...	৪৮॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৬০৬।০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৭৫।৶০
সমষ্টি	...	৯৬২॥০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬০৸৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২॥১
পুস্তকালয়	...	৪।৶০
যন্ত্রালয়	...	১২০৵৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৩১৵৯
সমষ্টি	...	৪৪৮৸৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, ভাদ্র মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৬৯৮৵৹
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৩১৮॥৵৩
সমষ্টি	...	৩৫৮৮॥/৩
ব্যয়	...	৩৩৩৫৮/৩
স্থিত	...	৩২৫২৸৹

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৬৫২৸৹

৩২৫২৸৹

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০১৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে
পাওয়া যায়

২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্তবাবু বনমালী চন্দ্র	১৲
	২০১৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৬৵৹
পুস্তকালয়	...	১২/৹
যন্ত্রালয়	...	৪॥৹
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন	.	১৫৸৵৹
সমষ্টি	...	২৬৮৸৵৹

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৭৸৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৶৹
পুস্তকালয়	...	১॥৶৩
যন্ত্রালয়	...	১০৪॥/৹
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫৶৬
সমষ্টি		৩৩৫৸/৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

আদি-ব্রাহ্মসমাজের ইলেক্‌ট্রিক লাইটের জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫৲
শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী	১০৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	৫৲
শ্রীযুক্ত জে, ঘোষাল	৫৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার	১৲
	৫১৲
পূর্ব্ব প্রাপ্ত	৩৩২৲
	৩৮৩৲

বিজ্ঞাপন।

ঊনঅশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

মহর্ষিদেবের তিরোভাব উপলক্ষে চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভা।

৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের দিন। এই দিন প্রাতে তাঁহার মধ্যম পুত্র সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতৃগতপ্রাণ শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী পিতার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করেন। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মসাধারণের নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকাল ৪ ঘণ্টার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম শোক ও ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সমাগত হইয়া মহর্ষিদেবের বহির্বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া উপবেশন করিলে প্রথমে সময়োপযোগী একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয়। পরে শ্রদ্ধাস্পদ; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করেন এবং মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী হইতে তাহার বিশেষ বিশেষ স্থান পাঠ করিয়া সকলের চিত্তকে মহর্ষিদেবের মহজ্জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ও সকলের হৃদয়কে মোহিত করিয়া তুলেন। অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা ও বক্তৃতা দ্বারা মহর্ষিজীবনে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি তিনি অনুরাগের সহিত কিছুক্ষণ মহর্ষির ব্রহ্মানুরাগিতার ব্যাখ্যা করার পর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের মহাভাব অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিলে পর শান্তিবাচন ও সঙ্গীত দ্বারা কার্য্যশেষ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষিদেবের মুক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'অদ্য মহর্ষিদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। এই অবসরে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি অর্পণ করিয়া এবং তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া ধন্য হইলেন। আমাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিগত যতই পার্থক্য থাকুক না কেন কিন্তু যেখানে মহর্ষিদেব আমাদের সাধারণ পিতা সেখানে

আমরা সকলেই এক, এক গৃহের এক পরিবার। ব্রহ্মসভা যখন ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল, সেই শুভক্ষণেই মহর্ষি আমাদের পিতৃপদ অধিকার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ, ব্রহ্মের উপাসনা, তাহার দ্বৈতবাদ, ব্রাহ্মের দীক্ষা, ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজে তদনুকুল গৃহ্যানুষ্ঠান, এ সকলই মহর্ষির সৃষ্টি। সুতরাং তিনি আমাদের সকলের নিশ্চয় পিতা এবং গুরু। এই পিতা এবং গুরুর শ্রাদ্ধের আমরা সকলেই সমান অধিকারী। যে দিন দেখিব যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম স্ব স্ব গৃহে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেছেন, সেই দিন বুঝিব যে আমরা সকলেই তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। যে দিন দেখিব যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম তাঁহার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাঁহার দৃষ্ট সত্যে বিশ্বাস করিয়া মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে যত্ন করিতেছেন সেই দিন বুঝিব যে আমরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। আমরা জানি শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রই মহর্ষিদেবকে পিতা এবং গুরু বলিয়া প্রথম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। গুরুবাদের গোঁড়ামি যেমন পৌত্তলিক সমাজে অপকার আনয়ন করিয়াছে, গুরুবাদ বর্জ্জনও ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ অপকার আনয়ন করিয়াছে; ইহা দ্বারা ব্রাহ্মবালক ও যুবকবৃন্দ শ্রদ্ধাহীন হইয়া ধর্ম্মজ্ঞান হারাইতেছেন দেখিয়া মনে বড় সন্তাপ উপস্থিত হয়।

"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" এই বিশেষ বাক্যের গুরুত্ব অধিক। ব্রাহ্ম সমাজে মতভিন্নতা এবং স্বাধীন চিন্তারও গুরুত্ব তেমনি অধিক। কিন্তু যখন দেখি নাভিকে অতিক্রম করিয়া নেমি স্বয়ং চলিতে চায়, তখনই বিনাশের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ভীত হই। কেন্দ্র ছাড়িলেই চক্র গতিহীন হয়। যিনি পিতা, যিনি গুরু তিনিই ব্রাহ্মসমাজের নাভি। তাঁহার জীবনের সুন্দর, অতি সুন্দর আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের জীবনগত আদর্শ হউক এবং সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনচক্র চালাইলেই আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপযুক্ত হইব।

মহর্ষি মুক্তপুরুষ। মুক্তপুরুষের আবার শ্রাদ্ধ কি, এ কথা উঠিতে পারে। কিন্তু শ্রাদ্ধ সেই ব্রহ্মগত পুরুষের জন্য নহে। শ্রাদ্ধ লৌকিক কল্যাণের জন্য—শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য, তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতা চরিতার্থ করিবার জন্যই কৃত হয়। অতএব মহর্ষি আমাদিগকে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন আমরা তাহা দ্বারা আপনাপন জীবনকে উন্নত করিব ইহাই লক্ষ্য।

মুক্তাত্মা শরীরযোগে আবির্ভূত হন না, কেবল সান্নিকর্ষ উপলব্ধি করান। আমি ভাবিতাম এখানে মহর্ষিদেবের এত সেবা করিলাম এত স্নেহ ভালবাসা লাভ করিলাম কিন্তু তিনি এতদিন চলিয়া গিয়াছেন আর আমি তাঁহাকে হারাইয়া এত শোকার্ত্ত তা একদিন স্বপ্নযোগেও তিনি আমাকে দেখা দিলেন না। এই ভাবনা মনে করিয়া একদিন গিরিধীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। ব্রাহ্মবন্ধুগণের অনুরোধে রবিবারে সমাজ মন্দিরে আমাকে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়। উপাসনান্তে উপদেশ দিবার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের

"ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বদৈ দেবা বলিমাহরন্তি মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে"

এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া তাহার মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ কৃত ব্যাখ্যান ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু এ ব্যাখ্যানে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না বলিয়া আমি তদুপরি শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যান অবলম্বন করিলাম। আমার বিবেক অমনি যেন রক্তচক্ষু হইয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিল, "রে নরাধম তোর গুরুর অবমাননা করিলি।" আমি ভয়ে ভীত, আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বাক্য স্তব্ধ হয় হয়, এমন সময়ে আমার সেই পরমভক্তি ভাজন গুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিলাম। তিনি বলিলেন, "বৎস, ভয় নাই। শঙ্করের ব্যাখ্যান অত্যন্ত আধ্যাত্মিক, বড়ই সত্য, বলিয়া যাও।" তখন আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল, আমি অকুতোভয়ে অত্যন্ত অনুরাগের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেলাম।

মুমুক্ষু যোগী জনের চিত্ত সংসারের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া কি ভাবে অনূর্দ্ধ থাকিতে পারে, মহর্ষিদেবের এই তিনটি বাক্যে তাহা বিশদ রূপে প্রকাশ পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, "আমি তাঁহার (দিদিমার) সহিত আমাদের পুরাতন বাড়ীতে গোপীনাথঠাকুর দর্শন করিতে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভাল বাসিতাম না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া সমস্ত দেখিতাম। এখন আমার দিদিমা নাই। কিন্তু কত দিন পরে, কত অন্বেষণের পরে আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি"।

"এইক্ষণে তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ আমার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—"স্বস্তিবঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ"। এই অজ্ঞানান্ধকার সংসারের পরকূলে ব্রহ্মলোকে যাইবার পথে তোমাদের নির্ব্বিঘ্ন হউক। এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এই পৃথিবী হইতেই শাশ্বত ব্রহ্মলোককে অনুভব করিতেছি"।

"এই অকিঞ্চিৎকর দীন হীনের গৃহে তিনি অনেক দিন অতিথি হইয়া রহিয়াছেন এবং কৃপা করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেছেন। এখন তাঁর নিজের ঘরে যাইবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁর এই মধুর আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া আমার এই ভাঙ্গা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রেমাগারে চলিলাম। সেখান হইতে আর ফিরিব না"। আর এই যে চারিটি ঈশ্বরের বাণী তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা তাঁহার মোক্ষের সম্যক্ নিদর্শন।

১

"যতটুকু আমার কথা শুনিয়া চলিয়াছ, যতটুকু আমার আদেশ পালন করিয়াছ, ততটুকু তোমার জয় লাভ হইয়াছে। এখন সম্যক্‌রূপে আমার কথা শুনিয়া চল যে এই সংসারের পর পারে উত্তীর্ণ হইবে এবং সিদ্ধি লাভ করিবে।"

২

"তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিবে এবং নিত্যকাল আমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।

৩

"ভয় নাই, তোমার এই শরীরের পতন হইলে আমার নিত্য সহবাস লাভ করিবে।"

৪

"তুমি নমস্কারের সহিত আমাতে নিত্যযুক্ত থাকিবে"।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহ বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎজীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়; তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও আজ অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এই জন্য ৭ই পৌষ যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করবে—জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত; এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘ জীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনো দিন বিস্মৃত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনো দিন বিচলিত হন নি; যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু—

ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি—যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়;—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরম লক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা তা নাকে বেষ্টিত করে—সেই সীমা কিছু না কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারা সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন; সেই জীবনের সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—তাকে নিয়ে আর আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই—তার সঙ্গে কেবল একটিমাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্চে অমৃতের যোগ—মৃত্যুই সেই অমৃতকে প্রকাশ করচে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত নেই। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কি না ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেই জন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন, বনের ফুল পূজা অবসানে প্রসাদী ফুল হয়ে আজ বিশেষ-রূপে সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্ম্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এই জন্যে তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎ জীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষ তিনি একলা অমৃত জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে দিনকার সংবাদ খুব অল্প লোকই জেনেছিল। ৬ই মাঘ মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি—সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

ঊনাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

প্রাতঃকাল।

পবিত্র মাঘোৎসব ১১ই মাঘ দিবসের প্রভাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতল গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৃহটি শ্রদ্ধাবান উপাসকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেকেই স্থানাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এবৎসর প্রবীন ও বর্ষীয়ান লোকের যেরূপ সমাগম হইয়াছিল অনেক দিন সে দৃশ্য আমরা দেখি নাই। ধূপ ধুনার গন্ধে সমাজ মন্দির আমোদিত হইলে ঠিক আটটার সময় শঙ্খ ধ্বনির পর অর্চ্চনা হইয়া উপাসনা ও সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু উদ্বোধন করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। পরে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ওজস্বিনী ও বিচিত্র ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলে মোহিত ও স্তব্ধ হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব।

এর মধ্যে দুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে বরকন্যার মিলন এবং তাকে বেষ্টন করে আছে আহূত অনাহূত রবাহূতের মিলন—পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন—তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মূল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্বসাধারণের সঙ্গে আনন্দ মিলন।

আজ প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে সেই মূল কথাটিকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই—সব মিলনের মূলে যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগৎ সংসার নেই কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন সেই খান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব—তার পরে সেই একটি মাত্র বৃন্তের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয় পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিভৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত আরম্ভ করা যাক্। কোন্‌খানে আমি আর তিনি মিল্‌চেন সেইটে একবার চেয়ে দেখি।

রোজই ত দেখা যায় সকাল থেকেই সংসারের কথা ভাব্‌তে সুরু করি। কেননা, সে যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কি চাই কি না চাই কি রাখব কি ছাড়ব এই কথাটাকেই মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার।

যে বিশ্বভুবনে বাস করি তার ভাবনা আমাকে ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য্য উঠ্‌চে না, বায়ু বইচে না, অণু পরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টি রক্ষা হচ্চে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড় ভাবনা করেই ভাব্‌তে হয় কেননা সেটা যে আমারি ভাবনা।

তাই এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোট সংসারের অতি ছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে মনে হয় না। আমার প্রভাত কালের সামান্য আয়োজন

চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্য্যোদয়ের কাছে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না, এমন কি তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চল্‌তে পারে।

তবেইত দেখছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্চে বিশ্বজগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করচেন আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্বটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্য্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেননা ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্তৃত্ব আছে।

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন। যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্চে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছাময় তিনি "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে। এই বলে, সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই, আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে। স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাক্‌তে পারেনা। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করেনা। সে মায়ের কাছ থেকে কেবল সেবা চায় না, সেবার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চায়—বন্ধুর কাছ থেকে কেবল উপকার চায়না, বলে যে বন্ধু ইচ্ছা করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার করুক্—এমন কি, উপকার নাও করুক কিন্তু তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে, আমি যেন তার অনিচ্ছার সামগ্রী না হই।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকেনা, সেখানে নিজেকে তার খর্ব্ব কর্‌তেই হয়। আমি যেমনি ইচ্ছা তেমনি চল্‌ব অথচ অন্যের ইচ্ছাকে বশ করে আনব এ ত হয় না। গৃহিণীকে বাড়ির সকলেরই সেবিকা হতে হয় তবেই তিনি বাড়ির সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুল্‌তে পারেন।

এই যে ইচ্ছার অধীনতা এতবড় অধীনতা ত আর নেই। আমরা দাসতম দাসের কাছ থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদায় করতে পারিনা—অতএব সেই ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে তখন আর কিছুই বাকি থাকেনা।

তাই বলছিলুম—ইচ্ছাতেই আমাদের স্বাধীনতার সব চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। ইচ্ছা, অহঙ্কারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে সুখ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে বড় সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে'।

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্ম্মটি দেখ্‌তে পাচ্চি—তিনিও ইচ্ছাকে চান। এই জন্যেই—চাইতে পারবেন বলেই—আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেননি। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য কেবল ঐ একটি জিনিষ তিনি নিজে রাখেননি—সেটি আমার ইচ্ছা—ঐটে তিনি কেড়ে নেননা, চেয়ে নেন—মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিষ আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি সে আমারি ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর

ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করেছেন। আমার কাছে এসে বল্‌চেন আমি রাজখাজনা চাইনে আমাকে প্রেম দাও। হে প্রেমস্বরূপ তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক সৃষ্টিছাড়া "আমি"র লীলা ফেঁদে বসেছ এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

তাই যদি না হত তবে এ গানটি গাইতে কি আমার সাহস হত?

"নাথহে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও—
মাঝে কিছুই রেখোনা রেখোনা—
থেকোনা থেকোনা দূরে!

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে? বিশ্বভুবন বল্‌তে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোট যে কোনো অঙ্কের দ্বারা তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কি না প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে একেবারে তাঁর পাশে এসে বস্‌বে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎ যজ্ঞের হোম হুতাশন যুগযুগান্তর জ্বল্‌চে আম সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবীর জোরে দ্বারীকে বলচি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে?

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষার অশান্ত উন্মত্ততা, অহঙ্কারের চরম পরিচয়?

কিন্তু অহঙ্কারের একটা যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা সেটা ত এর মধ্যে দেখ্‌চিনে—এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করা। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে সে যে নিজেকে দীন করে, সকলের পিছনে সে দাঁড়ায়, যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধূলা পেলেও সে যে বাঁচে!

সেই জন্যে, জগৎ সৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য বড় লাভ বলে চায়।

কেন চায়? কেন না, সে যে অধিকার পেয়েছে। হোন না তিনি বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ এই প্রেমের দাবি তিনিই জন্মিয়ে দিয়েছেন, আবার প্রেমও তাঁরই সঙ্গে। এতে আর ভয় লজ্জা কিসের!

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ "আমি" করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। একদিকে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড, আর একদিকে আমার এই আমি! এ রহস্য কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে সেই পরম আমি যে মিল্‌বেন!

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? কোথাও যাঁর কোনো সমাজ নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর এক্‌লা, কি অনন্ত এক্‌লা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই তাঁর একাধিপত্য এক জায়গায় বিসর্জ্জন করেছেন! তিনি আমার এই "আমি" টুকুর আনন্দ-নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন, বন্ধু হয়ে ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন "আমার চন্দ্রসূর্য্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেন না ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি হয়েছ, তুমি আছ!"

এই খানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বল্‌তে পারি—"আমি তোমাকে চাই নে! সে কথা তাঁর ধুলোজলকে বলতে গেলেও তারা সহ্য করে না—তারা তখনি মারতে আসে! কিন্তু তাঁকে যখনি বলি "তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই,

খ্যাতি চাই।” তিনি বলেন আচ্ছা বেশ! বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন!

এদিকে কখন্ এক সময় হুঁস্ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকাকড়ি ধনদৌলৎ কোনোমতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না—বাইরে আবর্জ্জনার মত পড়ে থাকে! সেখানে ফাঁক থেকেই যায়! সেখানকার সেই একলা ঘরটিকে জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বল্‌তে পারব, আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস; যে দিন বল্‌তে পারব চন্দ্রসূর্য্যহীন এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার “আমি” জন্মের মত সার্থক হবে!

আমাদের অন্তরাত্মার “আমি” ক্ষেত্রের একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎজুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে! আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্ব্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আস্‌তেন তাহলে জোড়হাত করে মাথা ধুলোয় লুটিয়ে তাঁকে মান্‌তুম—কিন্তু ঐ জায়গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙ্‌তেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে!

কিন্তু এমন করলে ত চল্‌বে না! শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে! মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না! ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টি পৌঁছায় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশ পথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জেলে তোল্! যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তাঁর আলোক আমাকে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝ্‌তে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে! তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্ত্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যে দিন আমার প্রেম জাগ্‌বে সে দিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাক্‌বে না। কেন যে “আমি” হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি সে দিন সেই বিরহ দুঃখের রহস্য একমুহূর্ত্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

হে আমার প্রাণের প্রাণ, জগতের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশু পক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাকে “আমি” বলচি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি অপূর্ব্ব—এ কেবলমাত্র “আমি,” একলা “আমি” অনুপম অতুলনীয় “আমি”। এই “আমি”-র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহাবিজন লোকে হে আমার অন্তর্যামী তুমি ছাড়া কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালেই নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু! এই আমি নামক তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে এই বিশেষ লীলায়

তোমার সঙ্গে যোগ দেব—একের সঙ্গে এক হয়ে গিলব !

এই আমিটিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনচ। কত সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে এ'কে তোমার পাশে করে হাতে ধরে নিয়ে এসেচ কিন্তু কারো সঙ্গে এ'কে জড়িয়ে ফেলনি ! কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণু পরমাণুকে চালনা করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ যে আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্চে এই "আমি"র রেখা। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা-বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হক্, তোমার চেয়ে বড় না হক্ ! আর আমার এই যে একটা সাধারণ জীবন, যা নানা ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা চেষ্টাদ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করচি সেইটেই নানাদিক্ দিয়ে প্রবল হয়ে না উঠে। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি—কিন্তু আমি রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে জান্‌তে চাই। এই আমিক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ—আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচ্‌বে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই "আমি"-নিকেতনেই যে তোমার চরম লীলা এইজন্যেইত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান। সেই জন্যেইত এইখানেই মৃত্যু, এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বল্‌তে পারি আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছু চাইনে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

প্রাতঃকালের উৎসবে যে কয়েকটি নূতন সঙ্গীত এবার রচিত ও গীত হইয়াছিল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গুণকেলী—নবপঞ্চতাল।

জননী, তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণরূপে।
জননি, তোমার মরণ-হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে ॥
তোমারে নমিহে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমিহে সকল জীবন-কাজে ;
তনুমনধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে ॥

টোড়ী—নবতাল।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া ॥
দিকে দিকে আজ টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া ॥
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে,
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয় প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া ॥

আসাবরী—কাওয়ালি।

তব অমল পরশরস তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও ॥
তব মধুময় প্রেমরসসুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী আনন্দ জাগাও।

মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালি।

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে,
এস গন্ধে বরণে, এস গানে ॥

এস, অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস, চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে ॥
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এসহে বিচিত্র বিধানে।
এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে,
এস সকল কর্ম্ম অবসানে ॥

প্রাতঃকালের সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

সায়ংকাল।

ঐ দিন মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গন বিচিত্র পুষ্প ও বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। উপাসনার সময় যদিও সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথাপি সন্ধ্যার বহুপূর্ব্ব হইতে জন সমাগম হইতে লাগিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে জনস্রোতে প্রাঙ্গন ও দ্বিতল পূর্ণ হইয়া গেল। সেদিনের উপাসক ও দর্শক দুই সহস্রেরও অনেক অধিক হইবে। এরূপ নিস্তব্ধ জনতা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার অত্যুচ্চ সুকণ্ঠে বেদগান আরম্ভ করিলেন। সকলে স্তব্ধ পুলকে তাহা শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্বোধন নিম্নে প্রকাশ করা গেল। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু সঙ্গীত-মঞ্চে বসিয়া গায়কগণের সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া সেদিনকার সঙ্গীতকে আরও মধুময় করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহশয়ের পৌত্র অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথের অষ্টমবর্ষ বয়স্ক কল্যাণীয় শ্রীমান সৌম্যেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার এই তরুণ বয়সে বালকণ্ঠে সকল সঙ্গীতে আশ্চর্য্যভাবে যোগ দিয়া যে গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় মহর্ষিদেবের পূত বংশে কোনকালে প্রতিভার অভাব ঘটিবে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমানের আশ্চর্য্য শক্তি সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। পরিশেষে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার সেই গুরু পরিশ্রমের উপর রাত্রিকালে যে অমূল্য উপদেশ দেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা যে ভাবে চিত্রিত করেন তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার এই উপদেশ চিরদিনের ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয় সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। আমরা ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে লালিত পালিত; কিন্তু সেদিনকার তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে অনেক রহস্য পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারি নাই, অনেক সঙ্কীর্ণতা যাহা ত্যাগ করিতে পারি নাই, তৎসম্বন্ধে সত্য সত্যই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এবং একথা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে সকলেই আমাদের সহিত এসম্বন্ধে একমত হইবেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্বোধিত করিলেন।

প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং॥

জগতের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে বন্ধন রহিয়াছে তাহা প্রেমবন্ধন। মানবাত্মার কূটস্থ মর্ম্ম গহ্বরে একের জন্য অন্যের যে এক চিত্তমোহিনী আকর্ষণ রহিয়াছে তাহা প্রেম, দুরান্ত আকাশ মার্গে এই যে রাশিচক্র ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে, কিন্তু স্বীয় রেখার বিন্দু মাত্র অতিক্রম করিতে পারে না যাহার বলে, সেই সেতুবন্ধন প্রেম বন্ধন। কে এই প্রেম বন্ধনে জগতের অন্তর্বাহ্য মঙ্গল নিয়মে নিবদ্ধ করিয়াছেন ?

"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃঢ়া যেন স্বস্তভিতং যেন নাকঃ।

যে প্রেমময়ের প্রেম আকর্ষণে দ্যুলোক উগ্রভাবে দণ্ডায়মান পৃথিবী দৃঢ় ভাবে স্বীয় কক্ষে ঘূর্ণিত হইতেছে, স্বর্গ এবং আদিত্য স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে।

"যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।"

যিনি নিজ মহিমা দ্বারা এই চক্ষু কর্ণ এবং প্রাণবিশিষ্ট জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রভু, হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং এই গভীর সমুদ্র যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহারই প্রেমে জগৎ হাস্যময়, তাঁহার দানে জগৎ পুষ্ট, তাঁহার শক্তিতে জগৎ শক্তিশালী তাঁর প্রাণে জগৎ প্রাণবান—তিনি প্রেমময় তাঁহাকেই আমরা চাই, কেবল চাই তাহা নহে, তাঁহাকে পূজা করিতে চাই, তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই। যখন ঈশ্বরকে আমরা লাভ করি, আমরা সমুদয় কামনার বিষয় লাভ করি, তাঁহাকে পাইয়া কিছুরই অভাব থাকে না। সেই পরম পুরুষ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেমময় আনন্দময় আমাদের সমুদয় কামনার পরিসমাপ্তি। ইহলোকের সুখৈশ্বর্য্য পরলোকের উন্নত ভোগস্পৃহা সকলই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, যখন সেই প্রেমময় অনন্ত মহাসাগরে আমরা নিমজ্জিত হইতে পারি, যখন নমস্কারের সহিত তাঁহাতে যোগযুক্ত হইতে পারি। আজ মাঘোৎসবের রজনী। অদ্য কোন তামসিক আমোদ আহ্লাদের জন্য আমরা এখানে সমবেত হই নাই। কোন রাজসিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যও এখানে আগমন করি নাই। হে ভাই, হে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, একবার ঊর্দ্ধে চক্ষু উত্তোলন কর; একবার হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে চিত্ত সংযোগ করিয়া সমাহিত হও, দেখিবে যে, ইহলোক পরলোক ইহকাল পরকাল কেবল একটা ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন মাত্র একটা প্রহেলিকা মাত্র। ইহারই অতীত মার্গে পড়িয়া রহিয়াছে তোমার একটা স্মৃতির ছায়া, ইহারই ভবিষ্যত পটগাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে তোমার অনুমানের আশার একটা ছবি। ইহারই অন্য নাম ঋষিরা দিয়াছেন নশ্বর জগৎ। যদি ইহা নশ্বর জগৎ তবে ইহা ক্রীড়ার স্থান নহে, অপরিণামদর্শী মানবের অল্পায়াসলভ্য সুখের আলয় নহে। সুখ যদি যথার্থই ইচ্ছা করিয়া থাক তবে নিষ্ঠাকে অবলম্বন কর। একবার তোমার আত্মার গভীর অন্তরে প্রবেশ কর এবং দেখ যে তোমার সেই প্রেমময় পিতা ইহ উৎসবের দেবতা শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে, আনন্দরূপং অমৃতং রূপে এবং সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে দীপ্যমান রহিয়াছেন। সেখানে কালের গতি নাই, দেশের রেখা নাই। কেবল তিনি ও তুমি। এই পুণ্য মুহূর্ত্তে জ্ঞান চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া প্রেম পুষ্পে তাঁহার পূজা করিয়া মৃত্যু হইতে অমৃতে চলিয়া যাও। প্রেমই তাঁহার পূজার পুষ্প। এস ভাই এই প্রেম পুষ্প দ্বারা হৃদয়াঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করি ও জীবনকে সার্থক করি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি করচি, তার পরিণাম কি, তার তাৎপর্য্য কি সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানেনা সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়—সে জানেনা, মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্য্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, একথা শিশু অনেকদিন পর্য্যন্ত একেবারেই জানেনা। তবু একথা একদিন তাকে জান্‌তেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করচেনা—সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠ্‌চে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের ঊর্দ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আস্‌চি।

আমরা কি করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চল্‌বে না।

আমরা মনে করছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জ্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন; মহোৎসব-ক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত উৎস আছে তারি জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মত প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এই টুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারিনে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়; এমন কি, এ'কে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও এ'কে ছোট করা হবে।

আমি বলচি আমাদের এই উৎসব মানব সমাজের উৎসব। একথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বল্‌তে পারি তাহলে চিত্তের সঙ্কোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎবের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবেনা; আমরা ঠিক জেনে যাবনা কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলবনা এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখ্‌ব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ—
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন—আমি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখ্‌তে পারেনা। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর ত দরজা বন্ধ করে থাক্‌তে পারেন না; এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন, সে মূর্খই হোক্ আর পণ্ডিতই হোক্, সে রাজ-চক্রবর্ত্তী হোক্ আর দীন দরিদ্রই হোক্, অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্ত্তা এসে পৌঁচেছিল, সে দিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জান্‌তেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"

যিনি সর্ব্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁকে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন; ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃ-পূর্ণং দেখেছিলেন—সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, "বেদাহং", আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেইদিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্ব্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে

আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল—নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরে সম্পদ্ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসঙ্গীতের তানপুরার মত পর্ব্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত নিরন্তর বাজতে থাকত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে—সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্ব্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলি কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্য্যালোক এবং বাতাসকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলি বিভাগ, কেবলি বাধা;—বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়—সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

"যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহাঃ"—

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন স্বাহা!" কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চলচে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনই হয় না। যে বলতে পেরেছে "বেদাহং" আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখীর কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসঙ্গীতের সুর এসে পৌঁছিল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগযুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বল্লে "বেদাহমেতং"—আমি এঁকে জেনেছি! কাকে জেনেছ? "আদিত্য বর্ণং"—জ্যোতির্ম্ময়কে জেনেছি—যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ম্ময়? কই তাঁকে ত আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখ্‌চিনে।—না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখোনি—তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে

তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েচ, সে যে অন্ধকার—নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না—সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্ম্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার; সেখানে দ্বারে একজন ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে, সে বল্‌চে, না, না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও! সে বল্‌চে কান বন্ধ কর, পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বস পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত "না" দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছিনে—কিন্তু বেদাহমেতং—আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের—যাঁকে জান্‌লে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না—যাঁকে জান্‌লে, নিম্ন দেশ যেমন জল সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাস সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে—তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জ্জন করে উঠল—দূর কর দূর কর, এ'কে বের করে দাও—এ'ত আমার ঘরের সামগ্রী নয়! এ'ত আমার নিয়মকে মান্‌বে না!

না, এ তোমারি ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেল্‌তে পারবে না—তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে!

প্রভাত এসেছে—আমাদের উৎসব এই কথা বল্‌চে! আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্চে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব!

বহু যুগ পূর্ব্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল, "একমেবাদ্বিতীয়ং।" অদ্বিতীয় এক! পৃথিবীর এই পূর্ব্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন! একমেবাদ্বিতীয়ং! অদ্বিতীয় এক!

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে, যে, "এক-সূর্য্য উদয় হচ্চেন, এবার ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও"—এই মন্ত্র কোনো একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও—শূন্যস্থ বিশ্বে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো—পূর্ব্বগগণের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং—আমি জান্‌তে পারচি—তমসঃপরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জান্‌তে পারচি—নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জান্‌তে পারে তেমনি করে

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ!"

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আস্‌চে সেই নব প্রভাতের বার্ত্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানব সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ

করছিলেন—এক! এক! এক! তিনি বলছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই একেক যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে —যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্ব্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে—যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে!

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দ্দিনের মধ্যে কোথায় এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ং—দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ কথা নিশ্চয় জানতে হবে—সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আজ বিরাট্ মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নীচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্ল্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে! এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং!" বলে গিয়েছেন মনে রাখিস্, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক!

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর ত আমাদের নিদ্রা নেই দেখছি! "এক" আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা সুস্থির থাকতে পারচিনে! আজ আমরা ঘর ছেড়ে, দল ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি! এ পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখ্‌ছি অভাব নেই! ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছিল!

তার পর থেকে আনাগোনা ত চলেইচে; একে একে দূত আসচে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্চে যা পূর্ব্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মত স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে। আমরা অনুভব করচি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনি খুল্‌বে এমনি আমাদের মনে হচ্চে। কেননা, কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে! আর ঐ যে

দেখ্‌ছি বাতায়নে এক একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্চেন! তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্চে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়; পৃথিবীতে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না! তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্যসঙ্গীতকে এখনি বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুল্‌বেন। সেই মহা সঙ্গীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারম্বার ফিরিয়ে আন্‌তে হবে—একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সাম্‌নে প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলে না যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা যারা বলে "একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" সেই এক প্রভুই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, আমরা তারা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা বলি "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ" হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়; আমরা তারা যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিনে আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক, এক, অদ্বিতীয় এক! তবে আমরা আর এ স্থানীয় ধর্ম্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাক্‌ব কেমন করে! আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখ্‌তে হবে! এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করচে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করচে সে ত এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি; যাকে বল্‌ব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের! না! আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিনি আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আস্‌চি তা ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" এই যে মহান্ আত্মা এই যে বিশ্বকর্ম্মা দেবতা যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্ত্তমান যুগে জগতে ধর্ম্ম সমন্বয় জাতি সমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন; আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য!—এই আশ্চর্য্য ই তহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করচি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে—বিধাতার এই মহতী কৃপার যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে!—বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, হৃদয়কে প্রসারিত কর, নিজেকে দারিদ্র বলে

জেনোনা, দুর্ব্বল বলে মেনোনা—তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্ম্মকে যন্ত্রবৎ কোরোনা--সত্যকে সকলের উর্দ্ধে স্বীকার কর এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্ম্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম্ম রচনা করচ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি! তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্‌খানে স্পর্শ করেছে, কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চল্‌চে তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝ্‌তে পারচিনে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে, আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচ্‌চেনা, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উট্‌চেনা, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ কর্‌চে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়্‌চে; স্বার্থ আরাম,অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড় কিছুকেই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, একথা বলবার বল পাচ্চিনে যে সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু তুমি আমার পক্ষে আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্চে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে! হে পরমাত্মন্, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্ত্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, আমাদের সচেতন কর; তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করচি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবারজন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কি তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি! জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথায় পেতে নিই—ভয় দূর হোক্, অশ্রদ্ধা দূর হোক্, অহঙ্কার দূর হোক্, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত, এবং এক মঙ্গল সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেনে সর্ব্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমার সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারেনা, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সঙ্কল্পকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক্, হৃদয় বলতে থাক্ আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক্

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

পূরবী—তেওরা।

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা।
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী আহা।
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে
কিরণ-সঙ্গীতে সুধা বরষে আহা।
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদরসে আসে ভরি
দেহ পুলকিত উদার হরষে আহা।

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমল মাঝে, জোৎস্না রজনীমাঝে,
কাজল ঘনমাঝে নিশি আঁধারমাঝে,
কুসুম সুরভি মাঝে বীণ রণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে।

নাচে নাচে রম্য তালে নাচে
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে।
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভার লুটায়ে—
প্রেমে প্রেমে সাজে॥

ইমন মিশ্র—একতালা।

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিবহে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে।
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিবহে!
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে॥
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিবহে!
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিবহে।
কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে,
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিবহে!
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে॥
জানিনা বলিয়া তোমারে স্বীকার করিবহে,
জানি বলে নাথ তোমারে হৃদয়ে বরিবহে।
শুধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখ শোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিবহে—
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিবহে॥

মিশ্র সিন্ধু—কাওয়ালি।

আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে॥
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুতঘাতে।
দ্বার খোলোহে দ্বার খোলো—
প্রভু কর দয়া দেহ দেখা দুখরাতে॥

সুরট—কাওয়ালি।

কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে—
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম।
সকল দৈন্য তব দূর কর, ওরে
জাগ সুখে ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালরে জ্বালরে
ডাক আকুল স্বরে এসহে প্রিয়তম॥

হাম্বীর—তেওরা।

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।
পুরাণো আবাস ছেড়ে চলি যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই॥
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে
চির জনমের পরিচিত ওহে, তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কিছু ডর,
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সদা পাই॥

বেহাগ—একতালা।

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে
অপরূপ রূপইন্দু—
চিত্ত কুসুমে ভরিয়া উঠিবে
মধুময় রসবিন্দু।
নব-নন্দনতানে চির বন্দন পানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে
উথলা চেতনাসিন্ধু।
জাগিয়া রহিবে রাত্রি
নিবিড় মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক্
অমৃত সভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ নাথ,
বন্ধু বন্ধু বন্ধু" ॥

মিশ্র বাহার—যৎ।

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর সীমা, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস্ এসে
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।
লোকের কথা নিস্‌নে কানে
ফিরিস্‌নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা॥

বাউলের সুর—একতালা।

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা, (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়
এ যাত্রা তুমি থামাও। (বন্ধু)

আপনি যে দুখ ডেকে আনি সে যে
আলায় বজ্রানলে—
অঙ্গার করে রেখে যায় সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে—(বন্ধু)
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের দান
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ। (বন্ধু)
যেখানে যা কিছু পেয়েছি কেবলি
সকলি করেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব
কেহ নাহি করে ক্ষমা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোরে থামাও! (বন্ধু)

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বালকগণের প্রতি উপদেশ।

তোমাদিগকে নিয়ে আজ আমরা ভগবানের পূজার জন্য এখানে এসেছি। জীবন যেন তোমাদের সার্থক হয় এই কামনা। তোমরা শুনে থাকবে তিনি অমূল্য ধন, কোন মূল্য দিয়ে তাঁকে কেনা যায় না। তোমরা ভেবোনা যে আমরা ছোট ছেলে, ভগবানকে আমরা বুঝতে পারব না। ভেবো না, যে তিনি মস্ত বড় জিনিস, জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রবীণ বিজ্ঞেরাই তাঁকে চেনেন জানেন বোঝেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ধারণায় কি কখনো তাঁকে ধরা যায়? এই তরুণ হৃদয়ের সামান্য অনুভূতিতে কি কখনো তাঁকে বোঝা যায়? তোমরা জাননা যে শিশুদের তাঁতে কি আশ্চর্য্য অধিকার। তোমাদের সোজা বুদ্ধিতে তাঁকে সহজে ধরা যায়, তোমাদের সহজ মনে তিনি সহজে প্রকাশ পান। আশ্চর্য্য তাঁর স্বভাব! দুরূহতার মধ্যে তিনি অত্যন্ত দুরূহ, সহজের মধ্যে তিনি নিতান্ত সহজ। তোমরা তাঁকে চেন জান, বোঝো কেবল নাম দিতে জান না যে, এঁকে বলে ভগবান। কচি শিশু আলো দেখ্‌লে কত আনন্দিত হয়, কত উৎফুল্ল হয়ে খেলতে থাকে, সবাই তোমরা দেখেছ। সে যেমন আলো জিনিষটাকে চেনে, জানে, বোঝে, কিন্তু নাম জানে না, বলতে জানেনা এটা আলো, সেইরূপ তোমরা অহরহ ভগবানের মধ্যে রয়েছ ও ভগবান তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমরা তাঁকে দেখছ চিনছ বুঝছ কেবল নাম জান না যে এঁকেই বলে ভগবান। যে জিনিষকে লোকে খুব ভালবাসে তার গুণ তার ভাব, তার কথা বলে শেষ ক'রে উঠতে পারে না জানত? লোকে বলে ভগবানকে বলা যায় না তার অর্থ এ নয় যে একেবারে তাঁকে বলাই যায় না। তাঁকে বলে শেষ করতে পারা যায় না এই হচ্ছে তাঁর আসল ভাব। যদি তাঁকে বলা না যেত তবে এত কথা কোথা থেকে জন্মাত? কেনই বা জন্মাত? বলা তাঁকে যায়, কেবল, কত তাঁকে ভালবাসি সেইটি বলা যায় না।

তোমাদের অধিকার তাঁতে অত্যন্ত বেশী, তাই বড় সহজে তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ পান। কোথায় তিনি জান? এই দিনেতে তিনি দিনমনি, জ্যোৎস্নায় তিনি চন্দ্রমা, সুগন্ধে তিনি পুষ্পরাশি, সুপ্তিতে তিনি অন্ধকার। তোমাদের প্রত্যেকে তিনি চৈতন্য, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম, তোমাদের ত্যাগের মধ্যে দয়া তিনি বিধান করিতেছেন। তোমাদের মঙ্গলে তিনি আনন্দময়।

মঙ্গলে তোমরা আনন্দিত হও, ত্যাগে তোমরা দয়াময় হও, পরস্পরের মধ্যে তোমরা প্রেমময় হও, তোমাদের চৈতন্য উদ্বোধিত হউক, তোমরা ভগবানের সঙ্গে

যুক্ত হয়ে জগতে পরম কল্যাণের প্রতিষ্ঠা কর।

ওঁ শান্তিঃ।

নানা কথা।

বিবাহ।—বিগত ২০এ জানুয়ারি আমাদের প্রধান রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড মিন্টোর কন্যার সহিত ভূতপূর্ব লাটসাহেব শ্রীযুক্ত লর্ড ল্যানসডাউনের পুত্রের শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঐ বিবাহ কেথিড্রেল গির্জ্জায় সুসম্পন্ন হয়। বিবাহান্তে বিশপ যে উপদেশ দেন তাহার মর্ম্মার্থ এই "জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের বাণী হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। আমরা যে কিছু কর্ম্ম করি, বিপদে নিপতিত হই, বা সম্পদে উৎফুল্ল হই এ তাবৎই অবসর ক্ষেত্র; এসকলের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রচ্ছন্ন ও স্থায়ী দান অবতীর্ণ হয়—ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের অন্তরে আসিয়া উপদেশ দেন। উহা বাস্তবিকই অমূল্যধন, যদি আমরা শান্তপ্রাণে উহা শ্রবণ করি হৃদয়ে পোষণ করিতে সচেষ্ট হই এবং উহার প্রতি উদাসীন না হই। (Christ এ) ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হে পুত্র কন্যা! ঈশ্বর তোমাদিগকে আজ তাঁহার সমীপে আহ্বান করিয়াছেন—এই দৃশ্যমান উপাসনা ক্ষেত্রে নহে—কিন্তু সেই মন্দিরে যাহা তিনি নিজে সংরচন করিয়াছেন। তিনি চান আজ তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর। তোমাদের উভয়ের প্রীতি উভয়ের প্রেম যাহাদ্বারা তোমাদের জীবন আজ জ্যোৎস্নাময়, বন্ধুগণের অনুরাগ, সমস্ত সাম্রাজ্যের সহানুভূতি, সেই মন্দিরের উপাদান। আমরা সেই মন্দিরের বাহিরে রহিয়াছি কিন্তু তোমরা ঐ মন্দিরের ভিতরে। সেখানে যাইয়া তাঁহার বাণী আজ তোমরা শ্রবণ কর। পরমপিতা সেই প্রেম ও আনন্দের মন্দিরে লইয়া গিয়া তোমাদিগকে যাহা শুনাইবেন তাহাই তোমাদের এই উদ্বাহ দিবসের অমূল্য সম্পত্তি। তিনি যে তোমাদিগকে আজ কি বলিতেছেন, তাহা আমি শুনিতে পাইতেছি না কিন্তু তোমরা তাহা শুনিতে পাইতেছ। তিনি তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছেন এবং যাহা বলিতেছেন শ্রবণ কর। বাহিরের এই সৌন্দর্য্য ও কোলাহলের ভিতরে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর, সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা কর, তাঁহার মৃদুমন্দ বাণী অবশ্যই শুনিতে পাইবে। বল ভগবন্ তোমার বাণী শুনাও, তোমার চরণাশ্রিত সেবক তাহা শ্রবণ করিতে প্রস্তুত।"

সভ্যতা কোন্ পথে।—ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে কতকগুলি আমেরিকার ও ডেনমার্কের অধিবাসী দেড় লক্ষ টাকা মূলধনে যাভা দ্বীপে Java Reptile Skin Co. যাভা সর্প-চর্ম্ম কোম্পানি নাম দিয়া একটি ব্যবসা খুলিয়াছেন। সর্পের চর্ম্ম সরবরাহ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক আনা হইতে পাঁচ টাকা মূল্যে এক একটি সর্প তাঁহারা খরিদ করিতেছেন। জীবন্ত সর্পের মূল্যই অধিক। মৃত সর্পের মূল্য কয়েক আনা মাত্র। জীবন্ত মরাল জাতীয় বোয়া সর্প যাহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, তাহার মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, উহার চর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐরূপ একটি সর্পকে ধরিয়া তাহার মস্তক একটা ফাঁসের ভিতর গলাইয়া উর্দ্ধে টাঙ্গান হয়। নিম্ন হইতে লোকে তাহার লেজ টানিয়া ধরিয়া থাকে। পরে ঐ জীবিত সর্পের ঘাড়ের চারিদিকে ছুরিকা যোগে বৃত্তাকারে চর্ম্মটি কাটিয়া সমস্ত চর্ম্মটি ঠিক সমানভাবে টানিয়া ছাড়ান হয়। এইরূপে লেজ পর্য্যন্ত সুগোল চর্ম্ম বেশ খসিয়া আইসে। চর্ম্মহীন সর্পটি ঘণ্টাকাল ছটফট করিয়া মরিয়া যায়। ঐ চর্ম্ম পরে পরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত হইয়া মনিব্যাগ ও পাশ্চাত্য রমণীর কোমরবন্ধ আকারে বর্ত্তমান সভ্যতাকে ফুটাইয়া তোলে। কি ভীষণ ও লোমহর্ষণ ব্যাপার!

অমৃতবাজার ১৫ই জানুয়ারি।

কবি মিল্টন।—কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টন ১৬০৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাহার পর তিন শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মোৎসব লইয়া অনেক স্থলে সভাসমিতি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিয়া সভ্য-জগৎ সত্যসত্যই ধন্য হইয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।—মহর্ষিদেবের আদর্শ জীবন লইয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৬ই মাঘ বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল। মহর্ষিদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী আদি-ব্রাহ্মসমাজে দশ টাকা দান করিয়াছেন।

মৃত্যু।—শিবনারায়ণ পরমহংস আজ কয়েক দিবস হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্যাপককাল ধরিয়া কালিঘাট মনোহরপুকুর নামক স্থানে থাকিতেন। তিনি তাঁহার সারল্যে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকেই বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবেন।
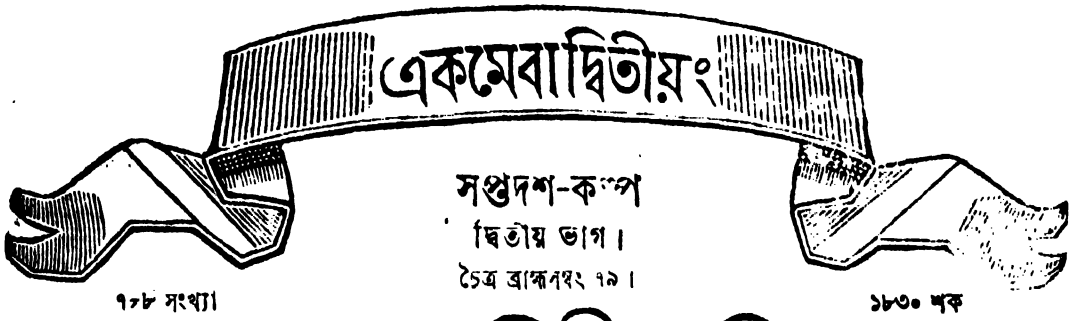
সপ্তদশ-কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯।
১২৮ সংখ্যা ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

প্রেমিক ধর্ম্ম।

তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ের প্রস্রবণ হইতে নদী যখন প্রবাহিত হয় তখন সেই নদীর প্রবাহে বসুন্ধরা উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হয়, সেই নদীর উপকূলে কত নগর নগরী পত্তন হইয়া মনুষ্যের বাসোপযুক্ত হয়, তাহার বক্ষোপরি কত বাণিজ্যতরী ধনধান্য বহন করিয়া জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। সেই নদী যে যে স্থান দিয়া বহিয়া যায় সেই সকল স্থান শোভা সৌন্দর্য্য শ্রী সম্পদে পূর্ণ হয়। কিন্তু সেই নদী তাহার প্রস্রবণ হইতে বিযুক্ত হইলে অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার পার্শ্বস্থ ভূমি নির্জ্জলা নিষ্ফলা হইয়া পড়ে, ফল ফুল শস্য মরিয়া যায়। ঈশ্বর-প্রীতি সেইরূপ আমাদের সকল পুণ্য কর্ম্মের প্রস্রবণ। জগতের ইতিহাস দেখ, ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগের প্রবর্ত্তনা কোথা হইতে? কিসের বলে তাহারা ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে সক্ষম হয়? দেখিবে তাহাদের কার্য্যের মূল-প্রবর্ত্তক ঈশ্বর-প্রীতি।

ঈশ্বর যিনি 'প্রেমের আকর ভূমি' তাঁহার সহিত প্রত্যেক মানবাত্মার প্রেম-বন্ধন। তিনি আমার, আমি তাঁহার—জীবাত্মা পরমাত্মার এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তিনি আমার আমি তাঁহার—আমি কোটি কোটি প্রাণীর মধ্যে মিশিয়া গিয়া আত্ম-হারা হই না। একদিকে যেমন তাঁহার করুণা—তাঁহার প্রেম বিশ্বব্যাপী, তেমনি আবার প্রত্যেক আত্মার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ; আমার আত্মার উপরেও তাঁহার প্রেমদৃষ্টি নিরন্তর রহিয়াছে। তিনি আমার আমি তাঁহার—আমি আর তিনি ভিন্ন যেন আর কেহই নাই! একের ভাল-বাসায় প্রেমের সফলতা হয় না—দান-প্রতিদানে প্রেমের পূর্ণতা। ঈশ্বরপ্রেমী ঈশ্বরের নিকট হইতে এই প্রেমের প্রতিদান চান, প্রতিদান পাইয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভগবানের নামই হচ্ছে ভক্তবৎসল।

গীতা বলিতেছেন :—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বংচ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

যিনি আমাতে সর্ব্বতোভাবে তন্ময়, তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলেন না আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করি না।

এই যোগের কি মধুময় ফল! এই যোগবলে জীবন সুধাময় হয়।

"সকলি সুধাময় যখন তাঁর সাথে ভয়-তাপ কি থাকে সে অমৃত নিকেতনে পা-ইলে—সংসার যাতনা সব ভুলিয়ে যাই।"

সেই মঙ্গলময়ের সহবাসে আমরা দিন দিন প্রেমের পথে, মঙ্গলের পথে অগ্রসর হই। কোন মানুষ কাছে থাকিলে আমরা দুষ্কর্ম্ম করিতে কত না ভীত হই তবে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া কোন্ লজ্জায়, কি সাহসে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইব? যদি কোন প্রলোভন আসে তাহা অতিক্রম করিবার বল পাই। যদি মোহবশতঃ কখন পাপ-পঙ্কে পতিত হই—জানি সেই করুণা-ময় আমার সঙ্গে আছেন—তাঁহার অসীম ক্ষমাগুণে আশ্বসিত হই যে তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন। তাই উপনিষদে আছে—যিনি পরমাত্মার সহিত এই প্রেম-যোগ বন্ধন করেন তিনি শোক তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন—

সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।

আমরা এই মৃত্যুময় সংসারে বাস করিতেছি, এই প্রেম আমাদের মৃত-সঞ্জীবন ঔষধ।

খ্যাতনামা রুষীয় মহাপুরুষ Count Tolstoi প্রেমিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"প্রেমের নিয়ম জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখ। মানুষ যতই দুশ্চরিত্র হউক না কেন, তাহারও সঙ্গে সাধু ব্যবহার করিয়া দেখ, দুদিন দেখ, এক সপ্তাহ দেখ, পরে আত্মজিজ্ঞাসা কর এইরূপ আচরণ কি তোমার নিতান্তই কষ্টকর হইয়াছে—ইহাতে তোমার আত্মার উন্নতি হইয়া অবনতি হইয়াছে? দেখিবে তোমার উন্নতি বই দুর্গতি হয় নাই। যে তোমার প্রতি অন্যায় করিয়াছে তাহারও ভাল করিবার চেষ্টা কর, নিন্দা অপবাদ ছাড়িয়া দেও, জীব জন্তু মনুষ্য সকলেরই প্রতি দয়া মায়া মমতা কর—পরীক্ষা করিয়া দেখ এই আচরণের ফল কি হয়? পরীক্ষাতে দেখিতে পাইবে তোমার জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে—অবসাদের পরিবর্ত্তে আত্মপ্রসাদ লাভে তুমি প্রসন্ন হইবে। কিছু কাল ধরিয়া এই ভাবে দিনযাপন কর দেখিবে তোমার আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—তোমার আত্মা শান্তিসুখে পূর্ণ হইয়াছে। শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে প্রেমিক ধর্ম্ম কেবল মৌখিক নহে—তাহা সজীব ধর্ম্ম—তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী।"

এই প্রেম সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা সংসারে বিস্তারিত হইয়া সংসারকে মধুময় করে। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে তখন আমরা সংসারধর্ম্ম উৎসাহে আনন্দে সম্পাদন করিব। যাহাতে লোকসমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার সহায়তায় প্রাণপণে সচেষ্ট হইব। আমাদের চারিদিকে দুঃখের যে গভীর আর্ত্তনাদ উঠিতেছে তাহার প্রতি কর্ণপাত করিব। আপনাকে ভুলিয়া সেবা-ধর্ম্মে নিরত হইয়া বিপন্নকে আশ্রয়দান, পীড়িতকে ঔষধ পথ্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাদান, পতিতকে উদ্ধারের চেষ্টা—এই সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানে তখন আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও তৎপরতা হইবে। এই প্রেমের সঙ্গে স্বার্থের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই।

জননী যখন সন্তানের লালন পালনে নিযুক্ত থাকেন তখন কি তিনি নিজের দিকে এতটুকুও দৃষ্টি করেন ?

আমরা সংসারের নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছি—কর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই। শরীর নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক—পরিবার পোষণের জন্য কর্ম্ম প্রয়োজন—কিন্তু এই কর্ম্মের সহিত স্বার্থের সংস্রব এক—আর ব্রহ্মপ্রীতিতে কর্ম্ম করা অন্যরূপ। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা তখন হইবে, "যখন আমাদের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্ত্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে।"

আমরা যখন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশে কর্ম্ম করি সেই কর্ম্ম দ্বারাই আমরা স্বাধীন হই—সেই কর্ম্ম তখন মুক্তি! তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্ম্মের বৈচিত্র্য বিলীন হয়, সংসারের নানা দুঃখ কষ্টের আনন্দ-অবসান হয়।

ব্রহ্মের সহিত আমাদের প্রেমবন্ধন—এই যে যোগ ইহা অমৃত যোগ। তিনি যদি আমার হইলেন, চিরকাল তিনি আমারই থাকিবেন—সে সম্বন্ধ এখানেই শেষ নহে। পরকালে অবিশ্বাস অন্তরে আর স্থান পায় না। সহস্র যুক্তি তর্কে যাহা না হয় এই যোগে তাহা সিদ্ধ হয়। পরকাল-তত্ত্ব ভক্তের মানসপটে জাজ্বল্যমান ফুটিয়া উঠে।

সংসার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র—লোকসমাজে আমাদের জীবনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাই বলিয়া আমরা অন্ধের ন্যায় দিশাহারা হইয়া কার্য্য করিব না। যে কোন কর্ম্ম করি আমাদের লক্ষ্য সেই একের প্রতি স্থির, তাহা হইতে আমরা বিচ্যুত হইব না। বাহিরের অবস্থানুসারে আমাদের কর্ত্তব্য সাধন কিন্তু পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ নির্ভর ও আত্ম-সমর্পণ—এই আমাদের জীবন। ইহার উপমাস্থল সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ যাহা মেঘমালা অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর গগনে সমুত্থিত হয়—তাহার বক্ষোপরি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা শিলাবৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের উপদ্রব—কিন্তু তাহার শিখরদেশ নিরবচ্ছিন্ন রবিকিরণে সমুজ্জ্বল।

সংসারের কর্ত্তব্য পালন আমাদের উচ্চ অধিকার স্বীকার করি কিন্তু বৌদ্ধদের মত আমরা কেবলমাত্র নীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি না। অনন্তের অভিমুখে আত্মার গতি—পূর্ণতা তাহার লক্ষ্য। আত্মার এই অনন্ত আশা, অক্ষয় পিপাসা, চিরবর্দ্ধনশীল প্রেম নিম্নতর নীতিক্ষেত্রে পূর্ণ হয় না। যে কোন বস্তু শুধু সংসারেই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে তাহা লইয়া আমরা কি লইব? ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর গভীর উক্তি আমাদের আত্মাতে প্রতিধ্বনিত হয়—

> যেনাহং না মৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং

আমাদের আত্মা সেই যোগমন্দিরে প্রবেশ করিতে উৎসুক যেখানে যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে—সে আনন্দের বিরাম নাই সে আনন্দের তুলনা নাই।

> যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া
> যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি
> সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং
> বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ
> যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
> যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে
> যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ
> সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।
>
> গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যাসে যখন যোগী উপরতচিত
আত্মাতে আত্মায় দেখি হন পুলকিত,
আত্ম-দরশনে চিত্ত অচল যখন
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দে মগন ;
অপার আনন্দ তাঁর, শান্তি অবিরাম,
ধ্যানযোগে আত্মাতে নিরখি আত্মারাম,
যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে
যার গুণে গুরুদুঃখ তুচ্ছ তাঁর মনে ;
এ হেন সাধনাগুণে যোগী পাপহীন
ব্রহ্মপরশন-সুখ ভুঞ্জে অনুদিন।

মনুষ্যের তিন অবস্থা।

আসক্তি বৈরাগ্য ও প্রেম, মনুষ্যের এই তিনটি অবস্থা দেখিতে পাই।

অতিরিক্ত অনুরাগের নাম আসক্তি।

যে ব্যক্তি অর্থে আসক্ত, অর্থে তাহার প্রাণমন সমর্পিত। তাহার অর্থগত প্রাণ। তাহার এক পয়সা মা বাপ। সে টাকায় বাঁচে, টাকার ক্ষতিতে মরে।

কিরূপ মানসিক অবস্থার নাম আসক্তি? কিরূপ ব্যক্তিকে আসক্ত বলা যায়? যখন কোন পার্থিব পদার্থের প্রতি কোন ব্যক্তির সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তখন বলিতে পারি, সে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত। যখন দেখি, সেই পদার্থের মিলনে তাহার অতিশয় সুখ, এবং তাহার অভাবে তাহার অতিশয় দুঃখ, তখন বলি সে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত। কেহ অর্থে আসক্ত, কেহ স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত।

মনুষ্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাই। কেহ সন্তানবিয়োগে পাগল হয়, আত্মহত্যা করে; আবার, কেহ বা পরমেশ্বরের নাম করিয়া শোক জয় করে।

সামান্য অসুবিধা হইলে, কেহ পরমেশ্বরের উপাসনায় বিরত হন। তাহার কারণ, অনুরাগের অভাব। আবার কেহ বা অনেক অসুবিধা ও স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া নিয়মিতরূপে উপাসনা করেন। প্রবল অনুরাগই তাহার কারণ।

লোকে পুত্রশোকে যেমন কাতর হয়, অর্থক্ষতিতেও সেইরূপ। অর্থনাশে মানুষ পাগল হয়, আত্মহত্যা প র্য্যন্ত করে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, জীবনের মায়া অপেক্ষা অর্থের মায়া অধিক।

অনেকের পক্ষে একটী টাকা হারাইলে যত কষ্ট হয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির ব্যাঘাৎ হইলে কি, সেইরূপ কষ্ট হয়? একটা টাকা হারাইলে যেরূপ মনের কষ্ট হয়, একবেলা উপাসনা না হইলে অথবা মুখ দিয়া একটা মিথ্যা কথা বাহির হইলে, অনেকের পক্ষে কি, সে পরিমানেও কষ্ট হয়? সাংসারিক পদার্থের প্রতি মায়া অনেকের এতই অধিক!

যশ মান লোকের প্রবল আসক্তির বিষয়। নিন্দা হইলে কি কষ্ট! প্রশংসা হইলে কি সুখ! মানুষের প্রাণ প্রশংসায় নাচিয়া উঠে! নিন্দায় মানুষ মরিয়া যায়! মানুষ কথায় বাঁচে কথায় মরে!

মনের স্বভাব এই যে যাহার প্রতি ভালবাসা, তাহার নিকট যাইতে চায়। সেই জন্য আসক্তি, পার্থিব পদার্থের নিকট মনকে লইয়া যায়। সেই জন্যই মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে। সেই জন্য আসক্তি ব্রহ্মসাধনের ব্যাঘাত করে।

কাহারও কাহারও জীবনে আসক্তি কাটিয়া গিয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়। যে কোন কারণেই হউক কাহারও কাহারও জীবনে এইরূপ হইয়া থাকে। আসক্তি তিরোহিত হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়।

তখন মনের ভাব এইরূপ হয়;—সকলই অসার, সকলই অনিত্য, সকলই

মরণশীল। কিছুতেই আস্থা থাকেনা। কেহই আপনার নহে। মরিলেই সব ফুরাইল। কে কবে মরিবে, আমি কবে মরিব, কে জানে? সকলই জলবিম্ববৎ স্বপ্নবৎ, মরীচিকাবৎ! সংসারটা যেন একটা মহাশ্মশান! ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!

এক প্রকার সাময়িক বৈরাগ্য আছে, তাহাকে শ্মশানবৈরাগ্য বলে। শ্মশানবৈরাগ্য কেমন? বৃক্ষ ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু শিকড় মাটির নীচে রহিল। সুতরাং বৃক্ষ আবার গজাইয়া উঠিল। সেইরূপ আসক্তির বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল বটে, কিন্তু সংসারের মাটিতে উহার শিকড় থাকিল; সেই জন্য, আবার উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু যদি মূল উৎপাটিত হয়, তাহা হইলে আর সংসারের রস টানিতে পারেনা, মরিয়া যায়।

বৈরাগ্য অনেকের পক্ষে বড় কষ্টের অবস্থা। একদিক্ গিয়াছে, আর একদিক্ আসে নাই। হৃদয় যেন শ্মশান। কিছুতেই মন বসে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "এই অবস্থার লোক বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায়, ইতস্ততঃ ধাবমান হয়।"

তৃষ্ণার্ত্ত যেমন জল অন্বেষণ করে, বৈরাগ্য সেইরূপ শান্তি অন্বেষণ করে। শান্তি লাভের জন্য কত চিন্তা করে, কত প্রকার উপায় অবলম্বন করে।

আসক্তি কাটিয়া গেলে বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের উপরের অবস্থা প্রেম। পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি হইলে, জীব শান্তি পায়। স্থায়ী ভক্তি ও প্রেম সকল দুঃখ দূর করে।

ভগবানের প্রতি যে প্রেম, তাহা সকল সংসারে, সকল জীবে ছড়াইয়া পড়ে। কেননা এ সংসার তাঁহারই সংসার; সকল জীব তাঁহারই।

প্রেমের এমনই নিয়ম যে, প্রেমাস্পদের ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলিও প্রেমিকের নিকট প্রেমাস্পদ হয়। প্রেমাস্পদের সম্বন্ধীয় যাহা কিছু, তাহাও প্রেমিকের নিকট প্রেমের বিষয় হয়। সেইজন্য ভগবৎপ্রেমের অবস্থায় সংসার আবার ফিরিয়া আসে। বৈরাগ্যের অবস্থায় যে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আবার আসিল। শিশু মা মা বলিয়া কাঁদিয়া পুতুলগুলি ফেলিয়া দিল। মা আসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন, আবার পুতুলগুলিও তাহার হস্তে গুঁজিয়া দিলেন। যাহা গিয়াছিল, আবার আসিল। সংসার পর হইয়াছিল, আবার আপনার হইল।

স্ত্রী পুত্র পরিবার, সকল জীব, সকল সংসার, পরমেশ্বরের; আমার মাতাপিতার; সুতরাং সকলই আমার, কেহ পর নহে।

আসক্তি কি বলে? স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন সম্পত্তি, সকলই আমার। বৈরাগ্য কি বলে? কে আমার? কে আপনার? সকলই পর। প্রেম কি বলে? সকলই আমার মাতাপিতার। সুতরাং সকলই আমার; সকলই আমার আপনার। সকলই আমার ভাই ভগিনী।

প্রেমের ফল স্বার্থত্যাগ ও সেবা। যে ব্যক্তি কেবল সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে চায়, সে স্বার্থের দাস। প্রেম কাহাকে বলে, সে জানে না। যাহার জন্য আমার অর্থ, সুখ, আরাম, শরীরের রক্ত না দিতে পারি, তাহার প্রতি কি আমার প্রেম আছে?

স্বর্গীয়া কুমারী কব বলিয়াছেন যে, কত নারী কত পুরুষের প্রেমে পড়িয়া, এবং কত পুরুষ কত নারীকে ভালবাসিয়া তাহার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দিতে প্রস্তুত;

কিন্তু আমরা সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের জন্য কি করিতে পারি ?

যিনি পরমপুরুষ, সত্য সুন্দর পুরুষ, জগৎপতি, হৃদয়নাথ, তাঁহার জন্য কতটুকু স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে আমরা প্রস্তুত ?

হে হৃদয়নাথ! সত্য সুন্দর পুরুষ! আমার প্রাণেশ্বর! "প্রাণস্য প্রাণঃ", এই দেহ, মন, প্রাণ, জ্ঞান, বুদ্ধি, হৃদয়, সকলই তোমারই প্রদত্ত। আমার নিজের কি আছে? আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার। আমি আপনি আপনার নই। আমি তোমারই সম্পত্তি। আমি যেমন তোমারই, সেইরূপ, যথার্থ ই যেন আপনাকে তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারি। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া, নিরন্তর তোমার প্রেমমুখ দর্শন করি। তোমার মুক্তিপ্রদ সহবাসে যেন আমার শোক, তাপ, পাপ, সকলই বিদূরিত হয়। হে প্রেমময়! তোমার অপরিশোধ্য প্রেমঋণে, ইহজীবন, অনন্তজীবন, যেন চিরবিক্রীত হইয়া থাকে। যেন তোমার প্রেমে বাঁচি, তোমার প্রেমে মরি। যদি এ জীবন বিসর্জ্জন দিলে তোমাকে লাভ করিতে পারি, তবে ত সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে পরমধন লাভ করিলাম। হে প্রাণেশ্বর! জীবনের জীবন! কৃপা কর! চরণে স্থান দেও! এ অধম দাসকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লও।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

মার্কস্ অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

ডেমক্রিটাস্ বলেন;—"যদি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে চাহ, তবে অধিক কাজের ভার হাতে লইও না।" আমার মনে হয়,—এই কথা বলিলে আরও ভাল হইত যে "নিতান্ত আবশ্যক ছাড়া কোন কাজ করিবে না; সামাজিক জীবের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য এবং যে প্রণালীতে কাজ করা কর্ত্তব্য তাহাই করিবে।" কারণ এই নিয়মানুসারে, কাজ অল্প হইলেও, তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, এবং কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার সুখ তাহা হইলে আমরা অনুভব করিতে পারি। আমরা যে-সকল কথা কহি, যে সকল কার্য্য করি, তাহার অধিকাংশই অনাবশ্যক; আমাদের কথা ও আমাদের কাজ যদি কমাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের হাতে অনেক অবসর থাকে, মনও বিচলিত হয় না। অতএব কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে আপনি এই প্রশ্নটি করিবে, "এমন কোন জিনিসে হাত দিতেছি কি না, যাহা প্রায় অনাবশ্যক?" আমাদের কি চিন্তা, কি কার্য্য—উভয়ের সম্বন্ধেই এই কথাটি মনে করিবে। কেননা, অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা,—অনাবশ্যক কার্য্যকে টানিয়া আনে।

এ দিক্‌টা দেখিয়াছ কি? তবে ও দিক্‌টাও একবার দেখ। মনকে বিচলিত হইতে দিবে না; তোমার মনের যেন একটিমাত্র সংকল্প হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দোষে দোষী হয়, তবে সে আপনারই অনিষ্ট করে,—আপনার নিকটেই দোষী হয়। যদি তোমার কোন সুবিধা কিংবা লাভ হইয়া থাকে,—জানিবে সে বিধাতার দান। বিশ্বজনীন কারণ হইতে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা তোমার অদৃষ্টে গোড়া হইতেই আছে। মোটের উপর জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব ন্যায়পরায়ণ হও, দূরদর্শী হও, জীবনের সদ্ব্যবহার কর, আত্মবিনোদনের সময় সতর্ক থাকিও।

হয় এই জগৎ জ্ঞানময় সংকল্প হইতে, নয় আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন। যদি

আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহা জগৎ—অর্থাৎ সুষমা-বিশিষ্ট একটি সুন্দর গঠন। যদি কোন মানুষ আপনার গঠনে সুষমা দেখিতে পায়, —তবে সে কি বিশ্বজগৎকে বিশৃঙ্খলার রাশি বলিয়া মনে করিবে—সেই বিশ্বজগৎ যাহার অন্তর্গত মহাভূতদিগের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাও ক্রমে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

জগতে কি আছে—না জানা, এবং জগতে কি হয়—না জানা,—প্রায় একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। জগতে কি আছে—যে জানে না, এবং জগতে কি হয়—যে জানে না—উভয়ই জগতের সহিত সমান অপরিচিত। সে একপ্রকার রাষ্ট্রের "পলাতক আসামী" বই আর কিছুই নহে। যে জ্ঞানের চক্ষু বুজিয়া থাকে, সে অন্ধ; যাহার নিজের বাড়ী সুসজ্জিত নহে, যে আর একজনের সাহায্য চাহে,—সে ভিক্ষুক। আপনার মনের মত সব হইতেছে না বলিয়া যে সর্ব্বদাই খুঁৎখুঁৎ করে এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, সে জগতের একপ্রকার দুষ্ট ক্ষত স্বরূপ; এ কথা সে একবার ভাবিয়া দেখে না,—যে কারণ হইতে তাহার অপ্রিয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে, সেই কারণ হইতেই সে নিজেও উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বার্থপর, সমস্ত জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের বিশ্ব-আত্মা হইতে যে আপনার আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে সে একপ্রকার স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত রাষ্ট্রদ্রোহী।

এক জায়গা হইতে আলোচনা আরম্ভ কর; Vespatian এর আমলে জগৎ কিরূপ চলিতেছিল একবার ভাবিয়া দেখ; —দেখিবে এখনও যেমন তখনও তেমনি। কেহ বিবাহ করিতেছে, কেহ বা শিক্ষায় ব্যাপৃত, কেহ বা রোগগ্রস্ত, কাহারও বা মৃত্যু আসন্ন, কেহ বা যুদ্ধ করিতেছে, কেহ বা ভোজন করিতেছে; কেহ বা হল কর্ষণ করিতেছে, কেহ বা কেনা-বেচা করিতেছে; কেহ বিনয়ী, কেহ বা গর্ব্বিত; কেহ বা ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কেহ বা শঠ; কেহ বা বন্ধুগণের মৃত্যু কামনা করিতেছে, কেহ বা রাজকার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী-সভার সভ্য হইতেছে; কেহ প্রেমিক, কেহ বা কৃপণ, কেহ বা প্রদেশের, কেহ বা রাজ্যের শাসনদণ্ড ধারণ করিতেছে। কিন্তু সে সময়কার সমস্ত ব্যাপার বহুকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, Trajan এর আমলে আইস। এস্থলেও তাই, তাহারাও সব চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখ, অন্য কালে এবং অন্য দেশে তোমার চিন্তাকে লইয়া যাও, —সেখানেও দেখিবে কত লোক কত বিচিত্র কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবশেষে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিশেষত তোমার পরিচিত লোকদিগকে স্মরণ করিয়া দেখ, কত বৃথা কার্য্যে তাহারা ধাবমান হইয়াছে; আত্মার মর্য্যাদা তাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, স্বকীয় অন্তঃপ্রকৃতিকে তাহারা অবহেলা করিয়াছে, তাহাকে লইয়া তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই—তাহাতেই তাহারা দৃঢ়রূপে আসক্ত হয় নাই।

মনে রাখিও, যে কার্য্যের যতটা ওজন ও গুরুত্ব সেই পরিমাণে তাহাতে ব্যাপৃত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি তুচ্ছ বিষয় হইতে বিরত হও, তাহা হইলে বৃথা আমোদ-প্রমোদ অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।

যে সকল শব্দ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এখন তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হা! শুধু তাহাই নহে; কালক্রমে যশও ম্লান হইয়া যায়, এবং ভাষার ন্যায় মানুষও

অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। Camillus Coeso Volesus, Leonatus এই সব নাম এখন নিতান্ত "সে-কেলে" হইয়া পড়িয়াছে; Cipio, Cato, Augustus এবং তাহার পর Hadian, Antonius এই সকল নামও শীঘ্র ঐ দশা প্রাপ্ত হইবে। এই সব জিনিস ক্ষণস্থায়ী, শীঘ্রই স্বপ্ন কথার সামিল হইয়া পড়ে, বিস্মৃতির কবলে পতিত হয়। আমি সেই সকল লোকের কথা বলিতেছি যাঁহারা স্বকীয় যুগের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। অবশিষ্ট লোক ত মরিবামাত্রই বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয়। ভাল, চিরস্থায়ী যশের অর্থ কি?—একটা তুচ্ছ অসার বস্তু ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। তবে কোন্ জিনিস আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে? মনকে খাঁটি রাখা, সমাজের হিতের জন্য কাজ করা, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সাদরে ও অম্লানবদনে গ্রহণ করা—ইহা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বিষয় আর কিছুই নাই।

তরঙ্গতাড়িত পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হও, তরঙ্গসমূহ পর্ব্বতকে আঘাত করিয়া করিয়া অবশেষে আপনিই উপশান্ত হয়। অমুক ব্যক্তি বলিলেন,—"আমার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে—আমি কি দুর্ভাগ্য!" মোটেই না! বরং তাহার বলা উচিত,—"এই দুর্ঘটনায় আমি যে বিচলিত হই নাই—বর্ত্তমানে নিষ্পেষিত হই নাই, ও ভবিষ্যতের জন্যও ভীত হই নাই—ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমার ন্যায় অন্য কাহারও এই দুর্ঘটনা হইতে পারিত; কিন্তু এই দুর্ঘনায়, আমার ন্যায় সকলেই এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় যে দুর্ভাগ্য, তদপেক্ষা দুর্ঘটনা সহ্য করার সৌভাগ্য কি আমার অধিক নহে? যে ঘটনা মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে পারে না, তাহা কেমন করিয়া মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে? তুমি যদি ন্যায়বান হইতে চাহ, মহানুভব হইতে চাহ, মিতাচারী ও বিনয়ী হইতে চাহ, বিবেকী, সত্যপরায়ণ, ভক্তিমান ও দাসত্ববিমুখ হইতে চাহ—এই দুর্ঘটনা কি তোমাকে বাধা দিতে পারে? যে ব্যক্তির এই সকল গুণ আছে,—মানব স্বভাবে যাহা থাকা উচিত তাহাই তাহার আছে। কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে এই বীজ-মন্ত্রটি স্মরণ করিবে:—এই দুর্ঘটনাটি দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে, বরং ভাল করিয়া সহ্য করিতে পারিলে উহা সৌভাগ্যেই পরিণত হইবে।

মনুর উপদেশ।

আত্মদর্শন।

সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ
সর্ব্বং আত্মনি সম্পশ্যন্ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥

সমাহিত হইয়া, সৎ ও অসৎ-সমস্ত জগৎকে আত্মাতে অবস্থিত দেখিবে। আত্মাতে সমস্ত দর্শন করিয়া, অধর্ম্মে মন দিবে না।

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্
আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিণাম্॥

আত্মাই সমস্ত দেবতা, আত্মাতেই সমস্ত অবস্থিত; আত্মাই এই শরীরিগণের কর্ম্মযোগ উৎপাদন করিতেছেন।

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ তং পুরুষং পরম্॥

সেই পরম পুরুষকে,—সকলের শাস্তা, অণু হইতেও অণু, উজ্জ্বল প্রকাশবান্, স্বপ্নধীগম্য (চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় উপরত হইলে স্বপ্নাবস্থায় মন-মাত্র অবলম্বন করিয়া যে

জ্ঞান জন্মে তাহাকে 'স্বপ্নাবী' বলে) বলিয়া জানিবে।

একমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্‌
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্‌॥

সেই এককে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ বা প্রজাপতি মনু বলিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা ইন্দ্ররূপে, কেহ বা প্রাণ রূপে, এবং অপর কেহ বা শাশ্বত ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।

এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ
জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ॥

ইনিই পৃথিব্যাদি পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া জন্ম, বৃদ্ধি ক্ষয়ের দ্বারা, এই সংসার-চক্র নিত্য প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা
স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্‌॥

এইরূপে যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন তিনি সর্ব্ব সমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ ব্রহ্মকে লাভ করেন।

একটি নূতন আবিষ্কার।

গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, জীবের উৎপত্তির উপর বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। একদল বৈজ্ঞানিক বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তির-সম্ভাবনা; মাতৃপিতৃসাহায্য-ব্যতীত জীবের জন্ম হইতেই পারে না। আর একদল পণ্ডিত ইহাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বতঃজনন (Spontaneous generation) সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্‌ পুচে (Poucet) সাহেব স্বতঃজননবাদীদিগের নেতা ছিলেন, এবং পরে অধ্যাপক বাষ্টিয়ান্‌ (Bastion) ইহাঁর সহযোগী হইয়াছিলেন। ইহাঁরা বলিতেন, জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু ইহাই জীবোৎপত্তির একমাত্র ধারা নয়। অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি আমাদের চারিদিকে নিয়তই চলিতেছে। উদাহরণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা গলিত উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিদেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন এগুলিতে যে অতিক্ষুদ্র অসংখ্য কীটের উৎপত্তি দেখা যায়, তাহাই স্বতঃজননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্টুর (Pasteur) এই স্বতঃজননবাদীদিগের সমগ্র যুক্তিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। গলিত জীবদেহে যে সকল ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়, সেগুলি যে পিতৃমাতৃসাহায্য গ্রহণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করে, পাস্টুর সাহেব এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক টিন্‌ডাল্‌ সাহেব তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

ইহার পর বহুকাল স্বতঃজননবাদীদিগের কণ্ঠস্বর শুনা যায় নাই। বিরোধী পণ্ডিতসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় স্বতঃজননের প্রায় সকল ব্যাপারগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পৃথিবীর আদিম জীব যে স্বতঃজাত নয়,-তাহা ইহাঁরা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কাজেই স্বতঃজনন কথাটা জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থের এক অংশে থাকিয়া গিয়াছিল।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল বার্ক নামক জনৈক ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে রেডিয়ম্‌ নামক নবাবিষ্কৃত ধাতুটির পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেইসময়ে স্বতঃজননের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া একটা সংবাদ জানা গিয়াছিল। স্বতঃজননবাদের ছিন্ন মূল এই আবিষ্কারে পল্লবিত হইবে বলিয়া আশা হইয়াছিল। কিন্তু অপর বৈজ্ঞা-

নিকদিগের কঠোর পরীক্ষায় বার্কের আবিষ্কার অটল থাকিতে পারে নাই। বিচারে ইহার অনেক ভুল ধরা পড়িয়াছিল।

সম্প্রতি ডুবারন্ (Dubarn) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই প্রসঙ্গের আর একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আবিষ্কারটি কেবল স্বতঃজননেরই পোষক নয়, ইহা পদার্থমাত্রেরই গোড়ার খবর আনিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। আবিষ্কারক জৈব অজৈব সকল পদার্থকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক কণাকেই সজীব পদার্থের ন্যায় নড়িতে চড়িতে দেখিয়াছিলেন।

আবিষ্কারক ডুবারন্ সাহেব বিদেশী হইলেও, তিনি কয়েক বৎসর আমাদের দেশে বাস করিতেছেন, এবং এই কলিকাতায় বসিয়াই তাঁহার আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিতেছেন, তাই আমরা অতি আগ্রহের সহিত আবিষ্কার বিবরণটি লিখিতে বসিয়াছি।

জীববিদ্যা আজকাল যে প্রকার দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেই উন্নতির প্রধান সহায় বলিয়া মনে হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রধান গঠনোপাদান জীবসামগ্রীর (Protoplasm) অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য, এবং জীবদেহের কোষগুলির-জন্ম মৃত্যুর রহস্য এক অণুবীক্ষণ-যন্ত্রই চক্ষুতে দিব্য দৃষ্টি যোজনা করিয়া আমাদিগকে দেখাইতেছে। জীব তত্ত্বের গবেষণায় আজকাল যে সকল অণুবীক্ষণযন্ত্রের ব্যবহার হয়, সেগুলিকে নানা প্রকারে সুব্যবস্থিত করা সত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা যায় নাই। জীবাণু (Bacteria) প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র বস্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে গেলে, নানাপ্রকার রঙ দিয়া সেগুলিকে আজও রঞ্জিত করিতে হয়, নচেৎ পরীক্ষাকালীন তাহারা মোটেই আমাদের চোখে পড়ে না। তা'ছাড়া জীবাণুগুলি যাহাতে নড়িয়া চড়িয়া যন্ত্রের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য সময়ে সময়ে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দৃষ্টিক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা হয়। প্রচলিত অণুবীক্ষণযন্ত্রকে সংস্কৃত করিয়া নূতন প্রথায় একটি উন্নত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য ডুবারন্ সাহেব অনেকদিন অবধি চেষ্টা করিতেছিলেন। জীবাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীবগণের স্বচ্ছন্দ বিহার বন্ধ করিয়া এবং তাহাদের দেহাভ্যন্তরে রঙ প্রবেশ করাইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে যে, তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়াই তিনি নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহাঁর চেষ্টা সফল হইয়াছে। সূর্য্যালোককে বা বিদ্যুদালোককে আবশ্যক মত প্রখর করিয়া যন্ত্রে ফেলিবারও একটি সুন্দর কৌশল সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। তা ছাড়া ইনি অণুবীক্ষণের শক্তিকে বৃদ্ধি করিবারও একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাঁর স্বহস্ত-নির্ম্মিত যন্ত্রটির শক্তি এত অধিক হইয়াছে, যে ইহাদ্বারা কোন ক্ষুদ্র জিনিস পরীক্ষা করিলে যন্ত্রে তাহার আকার ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার গুণ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বড় দেখায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র এ-পর্য্যন্ত কেবল নামেই অণুবীক্ষণ ছিল। কোন যন্ত্র সাহায্যে অদ্যাপি অণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। ডুবারন্ সাহেব তাঁহার অণুবীক্ষণকে সত্যই অণুবীক্ষণ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

স্বর্ণ রৌপ্য ও প্লাটিনম্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে চূর্ণ করিয়া ও পিষিয়া, তাহা-

দেরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে লইয়া ডুবারন্ সাহেব তাঁহার নিজের হাতের অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কণাগুলির প্রকৃত ব্যাসের পরিমাণ এক ইঞ্চির চল্লিশ হাজার ভাগের এক্‌ভাগ মাত্র ছিল, কিন্তু যন্ত্রে সেগুলির প্রত্যেককে এক একটি শিশিরবিন্দুর আকারে দেখা গিয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, ইনি যতগুলি পদার্থের কণা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সকলকেই সম্পূর্ণ গোলাকার এবং একই আয়তনবিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

ইহার পর আরো সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডুবারন্ সাহেব অপর যে সকল কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা আরো বিস্ময়কর। পরীক্ষায় প্রত্যেক কণাটিকেই তিনি চঞ্চল দেখিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম না মানিয়া প্রত্যেকেই সজীব পদার্থের ন্যায় চলা ফেরা আরম্ভ করিয়াছিল। কণাগুলিতে অত্যন্ত তাপ প্রয়োগ করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ চূর্ণিত ও মর্দ্দিত করিয়াও ঐ সজীবতার লক্ষণের পরিবর্ত্তন করা যায় নাই।

দুইটি চলিষ্ণু জিনিস বিপরীত দিক হইতে আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দিলে, উভয়েরই বেগ কমিয়া আসে। কিন্তু ডুবারন্ সাহেবের আবিষ্কৃত আণুবীক্ষণিক বর্ত্তুল কণাগুলি সংঘর্ষণের এই সুপরিচিত নিয়ম মানিয়া চলে নাই। ধাক্কায় তাহাদের প্রত্যেকটির বেগের বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। পদার্থমাত্রেরই সূক্ষ্ম কণার এই সকল অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আবিষ্কারক বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাপ বা আলোক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের উপর পড়িলে চাপ (Radiation Pressure) দিয়া তাহাকে গতিশীল করায়। নানাপ্রকারে তাপালোকের চাপের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উহাই অতিসূক্ষ্ম কণাগুলিতে চঞ্চল করে বলিয়া আবিষ্কারক প্রথমে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কণাগুলিকে অনিয়মিতভাবে যথেচ্ছ চলিতে দেখিয়া, ইহা যে, তাপালোকের চাপের কার্য্য নয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকারে জড়পদার্থের পরিজ্ঞাত সাধারণ ধর্ম্মগুলির মধ্যে কোনটিরই সহিত ঐ সকল জড়কণার কার্য্যের ঐক্য দেখিতে না পাইয়া আবিষ্কারক তাহাদিগকে "সজীবকণা" (Vital particles) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের অতি ক্ষুদ্র অংশ এবং ধাতু প্রস্তরাদির সূক্ষ্ম কণা পরীক্ষা করিয়া সকলেরই ঠিক একই কার্য্য দেখা গিয়াছিল, সুতরাং আবিষ্কারকের মতে এই সকল সজীবকণাই সজীব নির্জ্জীব সকল পদার্থেরই গঠনোপাদান এবং শেষ পরিণাম।

আধুনিক জীব তত্ত্ববিদ্‌গণ জীব সামগ্রী (Protoplasm) নামক এক জিনিসকে জীবদেহের প্রধান উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। নির্জ্জীব অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ কোন এক অজ্ঞাত শক্তিতে একত্রিত হইয়া পড়িলে তখন তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, এবং পূর্ব্বেকার নির্জ্জীব পদার্থ সজীবের সকল ধর্ম্ম পাইয়া জন্ম মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যগুলি দেখাইতে থাকে। ইহাই জীব-সামগ্রী। অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিকই অদ্যাপি জীবসামগ্রীকে নিজের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। বিধাতার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শিল্পশালাই ইহার উৎপত্তি, এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় নির্জ্জীব পদার্থ জীবধর্ম্মী হয়, তাহা বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত আর কেহই জানেন না। ডুবারন্ সাহেব তাঁহার "সজীবকণার" সাক্ষাৎ পাইয়া বলি-

তেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে জীবসামগ্রী (Protoplasm) বলেন, তাহা সজীবকণারই সমষ্টি এবং কণাগুলিই জীবসামগ্রীতে সজীবতা আনয়ন করে; অর্থাৎ "সজীব-কণা" জীবসামগ্রীর এক ধাপ নীচেকার জিনিস।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সজীব নির্জীব নানা পদার্থের সূক্ষ্ম কণা পরীক্ষা করিয়া ডুবার্‌ন্ সাহেব যে সজীবতার লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাপ দিয়া আঘাত দিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তিনি সেগুলির জীবধর্ম্মের লোপ করিতে পারেন নাই, এবং সেগুলিকে কোন ক্রমে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মেই বাধ্য করা যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই যখন ঐ "সজীবকণা" দ্বারা গঠিত তখন একত্রিত হইলেই তাহারা কেন প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া চলে। আবিষ্কারক এই প্রশ্নটির পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন নাই। তবে "সজীব কণা" পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িলেই যে তাহাদের সজীবতা লোপ পাইয়া যায়, এবং বিযুক্ত হইলেই যে আবার তাহার পুনর্বিকাশ হয়, পরীক্ষায় তিনি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন।

এই সকল দেখিয়া ডুবার্‌ন্ সাহেব বলিতেছেন, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই যেসকল উপাদানে গঠিত তাহা মূলে সজীব। "সজীবকণা" সকল পুঞ্জীভূত হইয়া যখন তাহাদের মূল-গত জীবধর্ম্মকে অপ্রকাশ রাখিয়া দেয়, তখনি সেই সকল "জীবকণার" সমষ্টি আমাদের নিকট নির্জীব পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, এবং পুঞ্জীভূত হওয়ার পরও সে গুলি যখন তাহাদের স্বাভাবিক সজীবতাকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই কণাসমষ্টি আমাদের নিকট সজীব হইয়া পড়ে। তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা যে সজীব ও নির্জীবের ভেদ স্বীকার করিয়া আসিতেছি, তাহা ডুবার্‌ন্ সাহেবের মতে মূলগত ভেদ নয়। জীবনের প্রারম্ভ ও শেষ নাই। সমস্ত পদার্থই ভগবানের ইচ্ছায় সজীব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই আদিম জীবের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ যে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাকে স্বতঃজনন বলিয়াছেন, তাহা প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের ইচ্ছায় নিয়তই আমাদের সম্মুখে চলিতেছে।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ডুবার্‌ন্ সাহেব সজীব কণাগুলির আকার সম্পূর্ণ গোল দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কার্য্যবিধিপরীক্ষা করিয়া সেগুলিকে শূন্যগর্ভ অনুমান করিতেছেন। শূন্যগর্ভ জিনিসের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ও তাহার কতকটা জলে পূর্ণ করিয়া যদি জলে ভাসাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ভিতরকার জল যেমন সবলে ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইতে থাকে তেমনি ভিতরকার জলের চাপ সমগ্র জিনিসটাকে ঠেলিয়া বিপরীত দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমরা প্রতিদিনই নানাপ্রকারে তরল পদার্থের চাপের এই কার্য্যটিকে দেখিতে পাই। ডুবার্‌ন্ সাহেব "সজীবকণার" সঞ্চলন ব্যাপারটাকে চাপের কার্য্য বলিয়া অনুমান করিতেছেন। ইহাঁর মতে, "সজীবকণা"-গুলি শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার জিনিস হইলেও, প্রত্যেকের কোষ-প্রাচীরে অন্ততঃ দুইটি করিয়া ছিদ্র আছে। জল বা অপর কোন তরল পদার্থে ভাসিতে আরম্ভ করিলেই, ইহারা আপনা হইতেই এক ছিদ্র দ্বারা জল উদরস্থ করিয়া অপর ছিদ্রপথে তাহা বাহির করিতে আরম্ভ করে। কাজেই ইহাতে কোষস্থ জলের চাপের একতা নষ্ট হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে

সঙ্গে কণাগুলিও বিচিত্রগতিসম্পন্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

"সজীবকণা"-গুলিকে শূন্যগর্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়া ডুবারন্ সাহেব কতকগুলি রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সমস্যারও সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লৌহ ও গন্ধক এই দুই মূল পদার্থের এক এক পরমাণু একত্রিত হইলে একটি যৌগিক পদার্থের (Iron Sulphide) উৎপত্তি হয়। লৌহ এবং গন্ধক এই দুইয়ের কোন ধর্ম্মই পদার্থটিতে দেখা যায় না। ডুবারন্ সাহেব বলেন, লৌহের "সজীবকণা" সকল যখন গন্ধকের "সজীবকণা" গুলিকে উদরস্থ করিয়া আর এক জাতীয় "সজীব কণার" উৎপত্তি করে, কেবল তখনি লৌহ ও গন্ধকের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটে। তিন চারিটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইলেও ঠিক পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে মৌলিক "সজীবকণা"-গুলি পরস্পরের কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক একটি পৃথক "সজীবকণা"র উৎপত্তি করে। লৌহ ও গন্ধকের রাসয়ানিক মিলনে, লৌহের কণা গন্ধকের কণার ভিতর প্রবেশ করে, কি গন্ধকের সজীব কোষ লৌহকোষের ভিতর আশ্রয়লয়, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। ডুবারন্ সাহেব বলিয়াছেন, যে পর্য্যায়ে "সজীবকণা"-গুলি পরস্পরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে অনেক রাসায়নিক রহস্যেরও প্রকৃতি নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

ডুবারন্ সাহেবের এই আবিষ্কারের বিবরণ আজও বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বাংশে প্রচারিত হয় নাই। পরীক্ষায় দৃষ্ট ব্যাপারগুলি প্রত্যক্ষ হইলেই যে ভ্রমপ্রমাদহীন হইবে, এ কথা বলা যায় না। সুতরাং একক ডুবারন্ সাহেব একটিমাত্র যন্ত্রে "সজীবকণা"র সন্ধান পাইয়া যে প্রকাণ্ড সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহার ভিত্তি খুবই দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যাহাদিগকে তিনি "সজীবকণা" নামে আখ্যাত করিয়াছেন, তাহারা যে প্রকৃতই সজীব তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই ইনি যে সকল কঠিন কঠিন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন বোধ হয় তাহার আলোচনা করিবার আজও সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি কোন দিন সেই শুভ কাল উপস্থিত হয়, তবে ডুবারন্ সাহেব ধন্য হইবেন এবং তাঁহার প্রসাদে আধুনিক বিজ্ঞান অজ্ঞান কুহেলিকা হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আপাততঃ সিদ্ধান্তগুলিকে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

সমস্ত জিনিসই যে সজীব এই কথাটা শুনিলে এখন আর আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। আমাদের অতি প্রাচীন পিতামহগণ এই ভারতবর্ষে বসিয়াই প্রকারান্তরে এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তারপর আমাদের স্বদেশবাসী মহা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে সেই সত্যকে দেখাইয়াছেন। ডুবারন্ সাহেব প্রকারান্তরে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বসু মহাশয়ের প্রত্যেক উক্তিই যেমন শত শত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, ডুবারন্ সাহেবের কোন কথারই মূলে সে প্রকার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্বদেশী বিদেশী দার্শনিকগণও বহুকাল হইতে মূল জড়কণাকে সজীব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত লিব্-

নিজ্‌ (Leibnitz) সাহেব আরও উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তিনি পরমাণুকে সজীব বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, ইহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াও তাঁহার মনে হইয়াছিল। *

অসীমের সহিত সুর বাঁধা

শান্তি, ক্ষমতা, ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা।

প্রস্তাবনা।

মঙ্গলবাদী ঠিক কথা বলেন। অমঙ্গলবাদী ঠিক কথা বলেন। একের সহিত অপরের, আলোক এবং অন্ধকারের মত প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই ঠিক কথা বলেন। ইনি একভাবে দেখেন, উনি আর একভাবে দেখেন ; যিনি যে ভাবে দেখেন তিনি তদনুসারে ঠিক কথা বলেন ; এই দেখিবার ভাবের দ্বারাই প্রত্যেকের জীবন নিরূপিত হয় ; দেখিবার ভাবই জীবনে ক্ষমতা, শান্তি, সফলতা আনয়ন করে ; দেখিবার ভাবেতেই জীবন অক্ষম, কষ্টকর, ও বিফল মনোরথ হইয়া যায়।

মঙ্গলবাদী (optimist) দ্রষ্টব্য বিষয়গুলিকে সমগ্রভাবে দেখিতে, এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ যথার্থরূপে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। অমঙ্গলবাদী (pessimist) একদেশ দর্শী, এবং তাহার দৃষ্টিপথ সঙ্কীর্ণ। একের বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানালোকিত, অপরের বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন। প্রত্যেকে নিজের অন্তর হইতে নিজের জগৎ নির্ম্মাণ করেন, প্রত্যেকের দেখিবার ভাবের দ্বারা নিজ নিজ নির্ম্মাণক্রিয়া নিরূপিত হয়। মঙ্গলবাদী তাঁর উচ্চতর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজের স্বর্গ রচনা করেন, এবং নিজের স্বর্গ-রচনার সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের স্বর্গ—রচনার সহায়তা করিতে থাকেন। অমঙ্গলবাদী, তাঁহার সঙ্কীর্ণতা বশতঃ, নিজের নরক রচনা করেন, এবং নিজের নরক-রচনার সঙ্গে সঙ্গে অপর অনেকের নরক-রচনার সহায়তা করিতে থাকেন।

তোমার আমার, আমাদের সকলেরই স্বভাবেতে, হয় মঙ্গলবাদীর প্রকৃতির, নতুবা অমঙ্গলবাদীর প্রকৃতির প্রাধান্য রহিয়াছে। সেই হেতু আমরা প্রতি ঘণ্টায় হয় নিজেদের স্বর্গ রচনা করিতেছি, নতুবা নিজেদের নরক রচনা করিতেছি। আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে নিজের স্বর্গ বা নরক রচনা করিতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে অপর সকলের স্বর্গ বা নরক রচনার সহায়তা করিতেছেন।

স্বর্গ ঐকতান-সুখরাজ্য। নরক যাতনাময় কারাগার। ঐকতান-সুখরাজ্যে বাস করিতে হইলে সকল লোক, সকল পদার্থের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকিতে হয় ; যথাযথ সম্বন্ধের ব্যাঘাত ঘটিলে ঐকতান বিলুপ্ত হইয়া যায়। সকলের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে না পারিলে পৃথক হইয়া পড়িতে হয়, এই পার্থক্য নরকের যাতনাময় কারাগার নির্ম্মাণ করে।

বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ সত্য।

বিশ্বের কেন্দ্র স্বরূপ মহান সত্য এই যে, সেই এক অসীম প্রাণ ও অসীম ক্ষমতাময় আত্মা সকলের আদি কারণ, তাহা হইতে সকল প্রাণী প্রাণবন্ত হইতেছে, তাহাই সকলের অন্তরে এবং সকলের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে ; জীবনের সেই স্বয়ম্ভু মূলতত্ত্ব হইতে সকলই আসিয়াছে, এবং অবিরাম আসিতেছে। যদি খণ্ড জীবন থাকে, তাহা হইলে জীবনের অখণ্ড অসীম আকর থাকিবেই থাকিবে ; জীবনের সেই অখণ্ড অসীম আকর হইতেই খণ্ড জীবন আসিতেছে। যদি একটি প্রেমগুণ বা শক্তি থাকে, তাহা হইলে প্রেমের অসীম আকর থাকিবেই থাকিবে ; প্রেমের সেই অসীম আকর হইতেই সকল প্রেম আসিতেছে। যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পূর্ণজ্ঞানের আকর থাকিবেই থাকিবে ; পূর্ণজ্ঞান হইতেই আংশিক জ্ঞান আসিতেছে। শান্তির

---

* ডুবারন্ সাহেবের গবেষণার বিশেষ বিবরণ "Indian Research Society"র ত্রৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত পত্রের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় বিবরটির বিশেষ পরিচয় পাইবেন।

সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হইবে, ক্ষমতার সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হইবে, আমরা যাহাকে বলি জড়পদার্থ তৎসমুদয় সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হইবে।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, এক অসীম প্রাণ ও অসীম ক্ষমতাময় আত্মা সকলের আদি কারণ এবং সকলের আকর ভূমি। সেই অসীম ক্ষমতা, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও শক্তি সমূহ দ্বারা, সৃজন করিতেছে, কার্য্য করিতেছে, শাসন করিতেছে; এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও শক্তিসমূহ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়া প্রধাবিত হইতেছে, আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমাদের দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কাজ এই সমস্ত নিয়ম ও শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। পথ পার্শ্বে প্রস্ফুটিত প্রত্যেক বনফুল, কোন এক মহান অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের শাসনে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, প্রস্ফুটিত, বিশুষ্ক হইতেছে। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ক্রীড়াশীল প্রত্যেক তুষার কণিকা, কোন না কোন মহান অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের শাসনে গঠিত, পতিত, দ্রবীভূত হইতেছে।

এমনও বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিপুল বিশ্বে নিয়ম ভিন্ন কিছুই নাই। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে, এমন একজন নিয়ন্তা অবশ্যই থাকিবেন যিনি সমস্ত নিয়মের স্রষ্টা, এবং যাঁহার শক্তি এইসমস্ত নিয়ম অপেক্ষাও প্রবলতর। সেই অসীম প্রাণ ও অসীম ক্ষমতাময় আত্মাকে আমি ঈশ্বর বলি। তুমি তাঁহাকে করুণাময়, জ্যোতির্ম্ময়, বিধাতা, পরমাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান, কিম্বা তোমার সুবিধামত আর যাহা কিছু ইচ্ছা বলিতে পার, তাহাতে আমার কিছু আসে-যায়না। কেন্দ্রস্বরূপ মহান সত্যটী সম্বন্ধে যদি তুমি আমি একমত হই তাহা হইলে, তুমি যে নাম ইচ্ছা বলনা কেন তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

অতএব, দেখা যাইতেছে, যিনি নিজের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহা হইতে সকলই আসিতেছে এবং যাঁহাতে সকলই স্থিতি করিতেছে, যাঁহা হইতে স্বতন্ত্র আর কিছুই নাই, সেই অসীম আত্মাই ঈশ্বর। ফলতঃ এবং সত্য সত্যই তাঁহাতে আমরা জীবন ধারণ করি, তাঁহাতে বিচরণ করি, তিনিই আমাদের জীবন। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের প্রাণস্বরূপ। আমরা তাঁহা হইতে প্রাণ পাইয়াছি এবং অবিরাম পাইতেছি। আমরা ঐশ্বরিক প্রাণের অংশভোগী; তাঁহার সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আমাদের আত্মা খণ্ড আত্মা, তিনি অসীম আত্মা, ঐশ্বরিক জীবন এবং মানুষিক জীবনে উপাদানগত কোন পার্থক্য নাই, বস্তুতঃ একই। পার্থক্য উপাদানে বা গুণে নহে, পার্থক্য পরিমাণে।

এমন অনেক দিব্যজ্ঞানী মহাত্মা ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, আমরা আমাদের জীবন, দৈবপ্রবাহের ন্যায়, ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। আবার, এমন অনেক লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আমাদের জীবন আর ঈশ্বরের জীবন একই, মানুষেতে ঈশ্বরেতে ভেদ নাই। এই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী—কাহার মত ঠিক? উভয়েরই মত ঠিক; যথার্থরূপে বুঝিলে দুই মতই ঠিক।

প্রথম মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই; যদি বল যে, ঈশ্বর সকল জীবনের আদি অসীম আত্মা, আর তাঁহা হইতে সকলই আসিতেছে, তাহা হইলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, আমাদের খণ্ড আত্মা সকল সেই অসীম আকর হইতে, দৈবপ্রবাহের ন্যায়, অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে। দ্বিতীয় মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই; আমাদের জীবনের খণ্ড আত্মা সকল যদি সেই অসীম আত্মা হইতে অব্যবহিতরূপে প্রবাহিত হয়, এবং তাঁহারই অংশ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই অসীম আত্মার যতখানি প্রকাশ দেখা যায়, তাহা সেই মূল আধারের সহিত অভিন্ন তো হইবেই, যেমন সমুদ্র হইতে গৃহীত বারিবিন্দু, প্রকৃতিতে ও গুণেতে, তাহার আকরভূমি সমুদ্রের সহিত অভিন্ন। ইহার

ব্যতিক্রম ঘটিবেই বা কিরূপে? শেষোক্ত মতটিতে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে; যদিও মানবিক জীবন এবং ঐশ্বরিক জীবন স্বরূপতঃ একই, কিন্তু এই সত্যটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবিক জীবন খণ্ড জীবন, ঐশ্বরিক জীবন অসীম জীবন এবং সেই অসীম জীবনেতে খণ্ড খণ্ড জীবন সকল ও আর যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই স্থিতি করিতেছে। এমনও বলা যাইতে পারে, জীবনের স্বরূপের দিক হইতে দেখিলে দুই জীবন একই; জীবনের পরিমাণের দিক হইতে দেখিলে দুই জীবনে বিশাল ভিন্নতা।

এইরূপ ভাবে দেখিলে, ইহা কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে দুই পক্ষের ধারণাই ঠিক, দুই মত একই? এই দুই বিশ্বাসই এক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকটিত হইতে পারে।

এক উপত্যকা দেশে একটি জলাধার আছে, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এক অক্ষয় জলাধার হইতে জল আসিয়া উপত্যকার জলাধারটীকে পূর্ণ করে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বৃহত্তর জলাধারের প্রবাহ হইতেই উপত্যকার জলাধার জল প্রাপ্ত হয়। ইহাও বলিতে হইবে যে, উপত্যকার জলাধারের জল, প্রকৃতিতে গুণেতে ও ব্যবহারেতে, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বৃহত্তর জলধারের জলের সহিত ঠিক সমান। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পর্ব্বত পার্শ্বস্থ জলধারের জলের পরিমাণ এত অধিক যে, তাহার দ্বারা উপত্যকার জলধারের ন্যায় সহস্র জলাধার পরিপূরিত হইয়াও তাহার জলের পরিমাণ অক্ষয় থাকে।

মানুষের জীবনেও তদ্রূপ। আমাদের মধ্যে আর যে কোন বিষয়ে যত কিছু মত ভেদ থাকুক না কেন, কিন্তু এই বিষয়ে, বোধ করি, আমরা সকলেই একমত হইতে পারি যে, এক অসীম জীবন আত্মা সকলের আদি কারণ, সকলের জীবন, অতএব তাহা হইতে সকলই আসিতেছে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে তোমার আমার প্রত্যেকের জীবন, দৈব প্রবাহের ন্যায়, সেই অসীম আধার হইতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, মানুষেতে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে সে জীবন অসীম আত্মার সহিত স্বরূপতঃ অবশ্য একই হইবে। এক প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ স্বরূপেতে নহে, সে প্রভেদ পরিমাণে।

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মানুষ যে পরিমাণে দৈব প্রবাহের পথে, নিজেকে উন্মুক্ত রাখেন সেই পরিমাণে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়েন। অতএব, ইহাও নিশ্চিত যে, যে পরিমাণে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়েন সেই পরিমাণে তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতা জন্মিতে থাকে। ঐশ্বরিক ক্ষমতা যদি অসীম হয়, তাহাহইলে ইহা কি সত্য নহে যে, মানুষ নিজেকে নিজে সীমাবদ্ধ না করিলে মানুষ অনন্ত উন্নতির অধিকারী, মানুষ নিজেকে নিজে না জানার দরুণই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে?

(In tune with the Infinite). Trine

মুরাবাদী শৈলশিখরস্থ গৃহের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে প্রার্থনা।

হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর, আমাদের কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয় তা' তুমিই জান। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি, আমরা কার্য্যের দূর-ফলাফল কিছুই বুঝিতে পারি না; যাহা আমরা ভাল মনে করি, হয়-ত তাহাই আমাদের পক্ষে মন্দ; আর যাহা মন্দ মনে করি, হয়-ত তাহাই আমাদের পক্ষে ভাল। তোমার ইচ্ছার গূঢ় রহস্য আমরা কি বুঝিব? তোমার ইচ্ছায় সমৃদ্ধ নগরও শ্মশানে পরিণত হইতেছে; আবার তোমার ইচ্ছাতেই শুষ্ক মরুভূমির উপর, ধনধান্যপূর্ণ শোভাময়ী ইন্দ্রপুরী নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা এই মাত্র জানি, তুমি মঙ্গলময়; তোমার যা ইচ্ছা তা' মঙ্গল-ইচ্ছা; শিশু জন্মিবার পূর্ব্বেই তুমি মাতার হৃদয়ে স্নেহ নীর সঞ্চারিত কর, তুমি জীবের আহারের জন্য

ধরণীকে শস্যশালিনী করিয়াছ। পানীয়ের জন্য ভূগর্ভে জল সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। এমন যে প্রস্তরময় কঠোর ভূমি, এখানেও তুমি উৎস উৎসারিত করিতেছ, শুষ্ক তরুকে মুঞ্জরিত করিতেছ। তাই, তোমার মঙ্গল ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র গৃহের ভিত্ত স্থাপনে উদ্যত হইয়াছি। আমরা শুধু কার্য্য করি, কার্য্যের ফলাফল তোমার হস্তে। এই ভিত্তির উপর আমরা যে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা যেন সুসিদ্ধ হয়; সেই গৃহ যেন শান্তির আলয়, সুখস্বাস্থ্যের আলয়, মঙ্গলের আলয় হয়, হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পরমপিতা, আমাদের প্রতি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(FROM THE BOOK OF VYAKHYAN)

IV

Beloved brethren, let us all come before God with a guileless heart, and casting away our troublesome cares and distractions, let us pray to Him, saying:—

O Life of our life, O Light of the world, show us Thy benign countenance. Draw our hearts unto Thee and never again shall we depart from Thee, never again shall we isolate Thee from our hearts. Henceforth we abjure all low desires and unclean thoughts and make ourselves wholly and absolutely Thine. Thy will shall be our guide, Thy goodness shall we ever hold up before us as our pattern and our highest ideal; we shall no longer suffer ourselves to be led astray by the allurements of the world. Daily shall we grow and advance toward Thee and live under Thy very eyes, and unto Thy keeping shall we entrust our lives. Do Thou accept our all.—Amen.

V

O Supreme Spirit, Thou hast sent us to this world to live under Thy protection and to love Thee and do Thy work. Trained in this life we shall mount up to higher spheres of existence and ever advance towards Thee. May we never, through our fault, be deprived of the deathless, priceless bliss that Thou hast reserved for us. May we bring our soul and lay it at thy feet after we have ennobled and purified it, and replace in Thy hands the precious gifts that Thou hast conferred upon us. Unless Thou helpest us we can do nothing. We therefore pray for Thy everlasting aid: do Thou lead us along thy blessed path of Righteousness.—Amen.

নানা কথা।

হিমের অতিমাত্রা।—লিডেন নগরের অধ্যাপক কাম্মারলিং অন্‌স্ হেলিয়ম ধাতুকে তরল করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাসায়নিক বিজ্ঞানের আধুনিক ব্যাখ্যা দেখিয়া বোধ হয় যেন আমরা আমাদের শৈত্য-জ্ঞানের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; এ স্থানের ধ্বংসমূর্ত্তি ভয়াবহ, বিপদসঙ্কুল আতঙ্কময়, অথচ ইহার লোকহিত সম্ভাবনাও সামান্য নহে।

বৈজ্ঞানিকেরা তাপ ও হিম মাপিবার এক কাল্পনিক আদি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহাকে বলা হয় "তাপশূন্যতা (absolute zero)", আমাদের পরিচিত ফেরেনহাইট থার্ম্মোমেটরের শূন্যের (zero) অপেক্ষা ইহা আরও ৪৫৯ মাত্রা কম। এক সময়ে, অধ্যাপক ডিউওয়ার বাতাস ও উদ্‌জানকে তরলীকৃত করিয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা এই নির্দ্দিষ্ট চরম শূন্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন তদবধি রাসায়নিকেরা শৈত্যের এই চরমসীমায় যাইতে বার বার বৃথা চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু ডিউওয়ারের অতিমাত্র হিম ও চরম বিন্দু হইতে শত শত মাত্রা দূরে। তারপর দশবৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন খবর আসিয়াছে যে, হলাণ্ডদেশে, বিদ্যুজ্জনক যন্ত্রের (electric battery) জন্মভূমি পুরাতন লিডেন নগরের একজন অধিবাসী, অধ্যাপক কাম্মারলিং অন্‌স্, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্লভ ও উৎপতিষ্ণু (volatile) বায়ুকে তরলীকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি হেলিয়মবাষ্পকে দৃষ্টিগোচর তরলপদার্থে পরিণত করিয়াছেন, এবং তাহার তাপ নিরূপণ করিয়া এই বিস্ময়াতীত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে তরল হেলিয়মের তাপ নির্দ্দিষ্ট চরম শূন্য হইতে ন্যূনাধিক চারি মাত্রা কম।

অধ্যাপক অন্‌সের কৃতকার্য্যতার বিপুল ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, মনে করিয়া দেখা আবশ্যক মৎস মাংসাদি রক্ষার যে সকল হিমাগার আছে তাহাতে কি উপায়ে বাতাসকে তাপমানযন্ত্রে শূন্য মাত্রার শৈত্য রক্ষা করা হয়। সকলেই জানেন, বাষ্পে পরিণতি (evaportion) শৈত্যের কারণ। জলে মুখ ধুইয়া যে শীতলতা অনুভব করা যায় জলের শৈত্যগুণ তাহার কারণ নহে, জলের বাষ্পে পরিণতিই তাহার কারণ।

বাষ্পে পরিণতির বিলম্ব ও দ্রুততা শৈত্যের হ্রাস ও

বৃদ্ধি উৎপাদন করে। তদনুসারে শৈত্য সঞ্চয় কারখানাতে, অতিশয় উৎপতিষ্ণু (volatile) আমোনিয়াকে লবণাম্বুর সন্নিকটে পরিণত করা হয়, আমোনিয়ার শৈত্য প্রাপ্ত লবণাম্বু ধাতব নল যোগে কারখানার সর্ব্বত্রে বিতরিত হয়। এই উপায়ে, ভাণ্ডারের সকল ঘরে প্রয়োজনানুযায়ী শৈত্য সঞ্চিত হয়।

এবারে, এমন একটি শৈত্য কল্পনায় আনিতে চেষ্টা কর, যাহার তুলনায় আমোনিয়া গ্যাসের সাংঘাতিক শৈত্য ও ফুটন্ত তৈলের উত্তাপের মত বোধ হইবে, তরল উদ্‌জানের (hydrogen) শৈত্য এইরূপ। পুনরায়, তরল উদ্‌জানের শৈত্য হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া এমন এক শৈত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা কর, যাহার তুলনায় তরল উদ্‌জানের শৈত্য তপ্ত কটাহে ফুটন্ত তৈল সম এবং শৈত্যসঞ্চয় কারখানার তুষারজমাট অভ্যন্তর দেশও, ধাতু দ্রবীকরণ চুল্লী অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত বলিয়া বোধ হইবে। এই শেষ কল্পিত হিমে উপনীত হইতে পারিলে, তখন তরলীভূত হেলিয়মের হিম যে কিরূপ তাহা কতকটা মনে ধারণা করিতে পারিবে।

বাস্তবিকই, হেলিয়ম দ্রবণ অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, আর ইহার ফলাফল সম্ভাবনাও সুদূরস্পর্শী। ইহাদ্বারা যে কত সুদূর সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে, শৈত্যকরণ (refrigeration) তত্ত্বজ্ঞেরা বহুদিন পূর্ব্বে তাহা জানিতেন, কিন্তু ইহা এপর্য্যন্ত আয়ত্তের বহির্ভূত থাকাতে কোন কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আমোনিয়া হিমীভূত লবণাম্বু যখন, শৈত্য-সঞ্চয় কারখানার একঘর হইতে অন্যসমস্ত ঘরে বিতরিত হইতে পারে, তখন ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহা দূরস্থিত বাসগৃহে বা কর্ম্মালয়েও বিতরিত হইতে পারে। অধ্যাপক অন্‌স্ এমন এক তরল পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহা ধাতব নলে সবলে প্রবিষ্ট করিয়া দূরে পাঠান যাইতে পারে, এবং তাহার শৈত্য এত অধিক যে দূরে প্রেরিত হওয়াতেও শৈত্যের কার্য্যকারিতার বিশেষ কোন ক্ষতি হইবেনা। এই ধাতব নলগুলি এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে, সে গুলিকে একত্রে গাঁথিয়া টেলিফোনের তারের মত ব্যবহার করা যায়।

এইরূপ প্রকারের গার্হস্থ্য আরাম ভিন্ন, এ আবিষ্কার আরও অনেক কাজে লাগে। শৈত্যকরণ প্রণালীর পারদর্শী ডাক্তার গল্‌পিন বলেন, কতক বৎসর পূর্ব্বে, এক শৈত্যসঞ্চয় কারখানাতে তিনি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে জনকতক কারিকরকে কারখানার সমস্ত আমোনিয়া-কবাট পরিদর্শন করিতে পাঠান। আমোনিয়া-কপাট যান্ত্রিক বলে আপনি খোলে ও বন্ধ হয়, কপাটগুলির যথারীতি ক্রিয়াদ্বারা আমোনিয়া গ্যাসের প্রসারণ ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, প্রসারণের হ্রাস বৃদ্ধিতে তাপের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। পরিদর্শনে প্রেরিত কারিকরদের মধ্যে এক ব্যক্তি (কেমন করিয়া করিল তাহা আর কখন কেহ জানিতে পারিবে না) পদাঘাতে একটা আমোনিয়া কপাট খুলিয়াছিল। আমোনিয়া বাষ্পে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল; কেবল তাহাই নহে, মৃত শরীর তৎক্ষণাৎ বরফের মত নিরেট জমাট হইয়া গেল, এবং ভূপতিত হইলে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল!

যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে তরল হেলিয়মের শৈত্যের তুলনায় আমোনিয়া বাষ্পের শৈত্য, যেমন তুষারের তুলনায় আগ্নেয়গিরি উদ্গীরিত দ্রব পদার্থ, তখন সহজেই উপলব্ধি হয় মৃত্যুসাধনে ইহার কি ভীষণ শক্তি! তাহা যুদ্ধের অস্ত্ররূপেই হউক বা নিজের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্যেই হউক ব্যবহৃত হওয়া সহজসাধ্য। কোন যুদ্ধের জাহাজের উপর হঠাৎ এই কল্পনাতীত শৈত্য ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মানুষগুলি তুষার-জমাট হইয়া যাইবে, জাহাজ এবং জাহাজের সমস্ত কলকারখানা ও কামানাদি তৎক্ষণাৎ জমাট বাঁধিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িবে। রাজনৈতিকেরা যখন রাষ্ট্রভোজে পরস্পরের নিকটে বন্ধুতা জানাইতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে, দিন দ্বিপ্রহরেতেই, শৈত্যের গুপ্ত তার সংযোগ দ্বারা সমস্ত রাজধানীকে খোলাকুচিতে পরিণত, এবং স্ব স্ব কার্য্যে নিরত প্রত্যেক নগরবাসীকে বরফের টুকরা করিয়া ফেলা যাইতে পারে। এ চিত্রের হিতকর পৃষ্ঠাও আছে! ইহা দ্বারা পচন গলন ক্রিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে। তরল হেলিয়ম পূর্ণ একটি তারের মত সরু নল, (এমন সরু হওয়া চাই যাহাতে জল জমিয়া বরফ না হয়) সহরের সমস্ত নালা নর্দ্দমার জলের কলের ভিতর চালাইয়া দিলে তাহাদ্বারা সমস্ত সহরের দুর্গন্ধ একেবারে দূরীভূত হইবে, সমস্ত রোগের বীজ মরিয়া যাইবে। এখন মলবাহী চোঙ্গা সকল যমরাজার রাজপথ, সে পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা যাইতে পারে।

ফেরেণহাইট্ তাপমান যন্ত্রের শূন্যমাত্রার চারিশত মাত্রা নিম্নের তরল পদার্থের শৈত্য সমস্ত সহরে এককালীন বিতরিত হইলে তাহাদ্বারা উত্তাপের সুস্পষ্ট প্রভেদ ঘটিবেই ঘটিবে; অয়নান্ত বৃত্তের গ্রীষ্মকালের প্রখর তাপ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে।

Science Siftings.

শ্রীসত্যব্রতা দেবী।

বিবাহ—বিগত ১০ই ফাল্গুন সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার নাগ মহাশয়ের পুত্র এবং শ্রীযুক্ত পি, কে, রায় মহাশয়ের ভাগিনেয় কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশীলকুমার নাগের শুভ বিবাহ কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ধরণীধর মিত্র মহাশয়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী আভারাণীর সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দেন।